জীবনের সকল সালাত সম্পর্কিত
তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ অনবদ্য সংকলন

আমার সালাত

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাই না কেন?

জীবনের সকল সালাত সম্পর্কিত
তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ অনবদ্য সংকলন

আমার সালাত

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাই না কেন?

মুফতি মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন

ইমাম ও খতিব: বাইতুল আমান জামে মসজিদ
পরিচালক: গাজীপুরা দারুল উলূম মাদরাসা
গাজীপুরা, গোপালদী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

নিবাস: সাতাউক মধ্যগ্রাম, কালাউক, হবিগঞ্জ

সম্পাদনা

মাওলানা মুফতি আঃ সালাম নুমানী হাফিযাহুল্লাহ

মুফতি ও মুহাদ্দিস: ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, গুলশান, ঢাকা-১২৩০

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র ▸ ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। ৯৮৮১৫৩২, ০১৯২৪০৭৬৩৬৫
বাংলাবাজার শাখা ▸ ১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ০১৭১৫ ০২৩১১৮
যাত্রাবাড়ি শাখা ▸ ৩৪,৩৫,৩৬ কিতাব মার্কেট, জামেয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ০১৯৭৫ ০২৩১১৮

আমার সালাত
মুফতি মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন
সম্পাদনা : মাওলানা মুফতি আঃ সালাম নুমানী হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশক
লাবিব আবদুল্লাহ
সাতাউক মধ্যগ্রাম ভূইয়াবাড়ি, কালাউক, হবিগঞ্জ
মুঠোফোন: ০১৯১২ ৪২৫৯৫৭ (ম্যানেজার)

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
জুমাদিউল আউয়াল, ১৪৪০ হিজরি
মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান

সাহিত্য বিলাস ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা	**ঝিনুক প্রকাশনী** ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
বিজয় প্রকাশ ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা	**বাংলানামা** ১২০/৫ পূর্ববাজার, তেজগাও, ঢাকা

বিনিময়: ৫২০ টাকা মাত্র।

বই সংগ্রহ এবং পরামর্শ প্রদানের জন্য:
মুঠোফোন- ০১৭১২ ৯৬১৪৭০ (সংকলক/লেখক)
fb: Mohammad Nsiruddin (**মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন**)

উপহার

শ্রদ্ধেয়/স্নেহের . . . .
. . . . কে
তাঁর এবং পরিবারের সকলের সুস্থ, সুন্দর, আলোকিত জীবন এবং পরকালীন মুক্তি কামনায় জীবনের সকল সালাত সম্পর্কিত তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ অনবদ্য সংকলন-

‘আমার সালাত’

বইটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সালাত আদায় করতে এবং অন্যকে সঠিক সালাতের দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং আন্তরিক দু‘আ পাবার আশা রেখে উপহার দিলাম।

শুভেচ্ছান্তে

আপনার . . . .

সাক্ষর:

তারিখ:

যে ঈমান তোমাকে
ঘর থেকে বের করে
মসজিদে নিতে পারে না,
সে ঈমান কি করে
তোমাকে কবর থেকে
জান্নাতে নিবে?

كَفَىٰ بِالْمَوْتِ وَاعِظًا

উপদেশের জন্য
মৃত্যুর স্মরণ যথেষ্ট

Death Is Enough
As A Reminder

অভিমত ও দু'আ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, হবিগঞ্জ উমেদনগর মাদরাসার পরিচালক ও স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস

আল্লামা তাফাজ্জুল হক হাফিযাহুল্লাহ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ، اما بعد !

কুরআন-হাদীসের উপর ভিত্তি করে সহজ সরল ভাষায় 'আমার সালাত' বইটি লেখা হয়েছে। বইটিতে একজন মুমিনের জীবনের সকল সালাত সম্পর্কিত তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। সালাতের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকেও আলোচনা করা হয়েছে। যেমন সালাতের সময়, রাকাত, গুরুত্ব ও ফযিলত ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়কে দলিলসহকারে লেখা হয়েছে। বইটির উপস্থাপন অনেক সুন্দর ও সহজ। সকল আলোচনা নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণভিত্তিক। আমি বইটির অনেক জায়গা পড়েছি। আমার অনেক ভালো লেগেছে। অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আশা করি বইটি সাধারণ পাঠক এবং আলেম-ওলামাসহ সকলের জন্য উপকারী হবে। বাংলাভাষী পাঠকসমাজে এ বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি। 'আমার সালাত' বইটির লেখক আমার স্নেহের ছাত্র মাওলানা নাসিরুদ্দীন। তরুণ আলেম ও লেখক।

মহান আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন বইটির লেখক-পাঠক সংশ্লিষ্ট সকলকে কবূল করেন। পরকালীন নাজাতের জন্য বইটিকে ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন।

পাঠকের সদয় দৃষ্টি

কুরআনুল কারীমের সূরা মুমিনুনের প্রথম আয়াতে সালাত মুমিনের সফলতার নিশ্চয়তার ঘোষনার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য আয়াত এবং হাদীসেও সালাতের আরো গুরুত্ব এবং ফযিলত বলা হয়েছে। ঈমানের পর আমলের ক্ষেত্রে সালাতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত গুরুত্ব সহকারে সালাত শিখে আমল করা। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম যে আমল যেভাবে করেছেন সেই আমল সেভাবে করাই উচিত এবং সবচেয়ে উত্তম এবং বরকতময়। কারণ আমি আমার জ্ঞানের উপর বা অন্য কারো জ্ঞানের উপর এতোবেশি আস্থাশীল হতে পারি না যত বেশি আস্থাশীল হতে পারি নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর। এজন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ এবং অনুকরণকেই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ মনে করি। একে পরকালীন নাজাতের পথ বলে বিশ্বাস করি। যারা এ মতের বিশ্বাসী এবং অনুসারী তাদের জন্য আমাদের এই সংক্ষিপ্ত সংকলন।

আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। পূর্বের উম্মতের তুলনায় আমাদের হায়াত অনেক কম। তাদের মতো দীর্ঘ সময় ইবাদত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই সংক্ষিপ্ত সময়ের ইবাদত যেন হয় সুন্নাহর আলোকে। অসতর্ক বা অজ্ঞতার কারণে যদি এ সামান্য ইবাদত বাতিল হয়ে যায় কিংবা সওয়াব কমে যায় তাহলে তো সেটা হবে সীমাহীন দুর্ভাগ্য। এ জন্য যারা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে আগ্রহী তাদের জন্য আমাদের এই আয়োজন।

আমরা বিভিন্ন সময়ে সালাত পড়তে ইচ্ছা করি। কিন্তু সালাতের নিয়ম-নীতি না জানার কারণে কিংবা ঐ সালাতটি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত কিনা সে সন্দেহ থাকার কারণে সালাত আদায় করি না। এ জন্য এই বইটিতে কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে মানব জীবনের সকল সালাত সম্পর্কিত তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ অনবদ্য সংকলন 'আমার সালাত' শিরোনামে সকল সালাতের আলোচনাকে সুবিন্যস্ত আকারে লেখা হয়েছে।

যে বিষয়ে হাদীসে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছি। আর যে সব হাদীস হাদীসের

একাধিক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ একটি বা দু'টি কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

আমাদের এই বইটিতে হাদীসের নাম্বার এবং পৃষ্ঠা নাম্বারের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেই উদ্ধৃতির সাথে উপমহাদেশ (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া) থেকে প্রকাশিত কিতাবসমূহের হাদীস নাম্বার এবং পৃষ্ঠা নাম্বারের সাথে মিল না হওয়া স্বাভাবিক। তখন পেরেশান হবার কোনো কারণ নেই। কেননা আমাদের এই বইটিতে হাদীস এবং হাদীসের নাম্বারের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা' (www.almeshkat.net)-এর অন্তর্ভুক্ত কিতাবসমূহ সামনে রাখা হয়েছে। উল্লেখিত 'ওয়েবসাইট'-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল কিতাব সউদী আরব, বৈরুত (লেবানন), কুয়েত ও মিশর থেকে প্রকাশিত। এ জন্য উপমহাদেশ থেকে প্রকাশিত কিতাবসমূহের হাদীস নাম্বার আরবদেশ থেকে প্রকাশিত কিতাবসমূহের হাদীস নাম্বারের সাথে মিল হবে না।

এখানে আমাদেরকে খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে, 'ইসলামের আদর্শের সত্যতা ও কল্যাণ প্রমাণের জন্য কোনো ডাক্তার, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক এবং অমুসলিম পণ্ডিতের মতামতের প্রয়োজন নেই।' তবে বর্তমানে কিছু মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক। পণ্ডিত ও দার্শনিকের কথা শুনলে তারা সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য ইসলামকে জানতে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি ডাক্তার, বিজ্ঞানী এবং অমুসলিম পণ্ডিত, দার্শনিকের মতামত জানতে পারলে সেটা একটু ভালো হয়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'আমার সালাত' বইটিকে কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণের পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান এবং বিশ্বের বড় বড় ডাক্তারগণের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! এই বইটি লিখতে প্রথম প্রেরণা দিয়েছেন আমার পরম বন্ধু আলহাজ্ব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (চীপ ইঞ্জিনিয়ার, স্যামসাং আর এন্ড ডি ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ)।

মহান আল্লাহ দয়া করে তাঁকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। তাঁকে সুস্থ রেখে সঠিকভাবে ইসলামের খেদমত করার তাওফিক দান করুন। ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জিকরুল আহসান (শাওন) ভাই সকল প্রকার সালাতের বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এ থেকেও লেখার প্রয়াস পাই। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই আগ্রহ ও খেদমতকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

এই বইটি লিখতে আমাকে সহযোগিতা করেছেন কুমিল্লা দয়াপুর মাদরাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতি মুহাম্মদ ইসমাঈল (সরাইলী)। বিশেষ করে উপমহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস হবিগঞ্জের গৌরব শাইখুল হাদীস আল্লামা তাফাজ্জুল হক সাহেবের অবদানের কথা এখানে বলে শেষ করা যাবে না। হযরতের জন্য দু'আ করি এবং পাঠকের কাছেও দু'আ চাই মহান আল্লাহ যেন তাঁকে সুস্থতা এবং নেক হায়াত দান করেন। ঢাকা খিলক্ষেত নিবাসী আলহাজ্ব জালাল উদ্দীন এবং আলহাজ্ব আবদুর রউফ বিন ইয়াকিন আলী সরকারের সুস্থতা এবং কল্যাণ কামনা করছি। আরো যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন তাদের সকলের ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল কামনা করছি। মহান আল্লাহ বইটিকে তাদের সকলের ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন।

বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে এই ছোট বইটি লিখতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছি ও অধিকার নষ্ট করেছি আমার পরিবারের সকল সদস্যদের। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন। আমার এবং আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন, শশুর-শাশুরী এবং মকতব থেকে নিয়ে স্কুল ও মাদরাসার সকল শিক্ষক এবং পাঠকবর্গের পরকালীন নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। তিনি দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন।

সামান্য সময় নিয়ে লেখা বইটিকে নির্ভুল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জাল, মওজু ও বাতিল এবং এ জাতীয় অগ্রহণযোগ্য হাদীস পরিহার করা হয়েছে। সকল ভুলভ্রান্তির জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তারপরও যদি কোনো সুহৃদ পাঠক/পাঠিকার দৃষ্টিতে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে আমাদের নির্ধারিত ঠিকানায় আপনার মতামত জানিয়ে কৃতজ্ঞতায় বাধিত করার আশা করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে। ইনশাআল্লাহ।

দু'আর মুহতাজ

মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন

সূচিপত্র

পবিত্রতা অর্জন করা

পেশাব-পায়খানার সময় সাতটি কাজ করা সুন্নত
মিসওয়াক, ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম
মিসওয়াক করার ফযিলত:
ওযূর প্রকারভেদ:
ফরয ওযূর বিবরণ:
ওয়াজিব ওযূর বিবরণ:
মুস্তাহাব ওযূর বিবরণ:
ওযূ করার ফযিলত:
নবীজি এবং সাহাবিগণ যেভাবে ওযূ করতেন:
ওযূ শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ:
ওযূর ফরয চারটি:
ওযূর সুন্নতসমূহ:
ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ:
গোসলের প্রকারভেদ:
ফরয গোসলের বিবরণ:
সুন্নাত গোসলের বিবরণ:
মুস্তাহাব গোসলের বিবরণ:
গোসলের ফরয তিনটি:
গোসলের সুন্নত পাঁচটি:
তায়াম্মুমের ফরয তিনটি:
তায়াম্মুমের সুন্নত পদ্ধতি:
তায়াম্মুম সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর:
পবিত্রতা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

আযান-ইকামাত ও মসজিদে গমন

আযানের পরিচয়:
আযানের সূচনা:
আযানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:
একনজরে আযান ও আযানের বাক্যসমূহ আদায় করার নিয়ম:
আযান ও ইকামতের জবাব:
ইকামতের বাক্যসমূহ এবং এর উত্তর:
আযান ও ইকামতের ফযিলত:
আযান ও ইকামতের কিছু বিধান:

সালাতের ফরয এবং শর্তসমূহের বিবরণ

সালাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী
সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের বিবরণ
পুরুষের সতরের পরিমাণ:
নারীদের সতরের পরিমাণ:
সালাতের নিয়ত
সালাতের ফরযসমূহের বিবরণ

সালাতের ওয়াজিব এবং সুন্নতসমূহের বিবরণ

সালাতের ওয়াজিব সমূহের বিবরণ
সালাতের সুন্নাত সমূহের বিবরণ
দাঁড়ানো অবস্থায় সুন্নাত ১১টি:
কিরাআতের সুন্নাত ৭টি:
রুকুর সুন্নাত ৮টি:
সাজদার সুন্নাত ১২টি:
বসার সুন্নাত ১৩টি:
পুরুষ ও মহিলাদের সালাতের পার্থক্য:

সালাত নষ্ট হওয়া এবং সাজদায়ে সাহুর বিবরণ

যে সব কাজের দ্বারা সালাত নষ্ট হয়ে যায়
যে সব কাজের দ্বারা সালাত নষ্ট হয় না
সাজদায়ে সাহু কি ও কেন এবং এর বিধান
সাজদায়ে সাহু সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়
সাজদায়ে সাহু আদায়ের পদ্ধতি

সালাতের পর মাসনুন আমল এবং পঠিত দুআ

প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর মাসনুন আমল
সালাতের মধ্যে পঠিত কতিপয় দুআ ও দুরূদ
তাকবীরে তাহরীমার পরের দুআ (সানা):-১
তাশাহহুদ:
দুরূদ শরীফ:
দুরূদে ইবরাহীম ও কিছু কথা:
দুআয়ে মাছূরা:
সালাতুল বিতিরের দুআ:
দুআয়ে কুনূত

সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাই না কেন?

রহস্য-১ : ঈমানের বিশুদ্ধতার অভাবে:
রহস্য-২ : সুন্নাতের অনুসরণের অভাবে:
রহস্য-৩ : মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে না হওয়ার কারণে:
রহস্য-৪ : অন্যান্য বিধানকে সঠিকভাবে পালন না করার কারণে:
রহস্য-৫ : সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সালাত পালন না করার কারণে:

সালাতে খুশু-খুযূ (মনোযোগ) অর্জনের পদ্ধতি

পদ্ধতি-১ : শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষার দুআ:
পদ্ধতি-২ : সালাতকে জীবনের শেষ সালাত মনে করা:
পদ্ধতি-৩ : আল্লাহকে দেখছি অথবা তিনি আমাকে দেখছেন:

পদ্ধতি-৪ : অর্থ ও মর্ম বোঝার জন্য ব্রেইনকে ব্যস্ত রাখুন:
পদ্ধতি-৫ : সালাতের শব্দগুলো নিজের কানে লাগিয়ে পড়ুন:
পদ্ধতি-৬ : সালাতকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার উপযুক্ত করুন:
পদ্ধতি-৭ : মানবিক প্রয়োজন সমাধান করুন:
পদ্ধতি-৮ : আমি তো মহান আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি:
পদ্ধতি-৯ : আযানের পর দুআ পাঠ করা:
পদ্ধতি-১০ : ওযূর পূর্বের দুআ পাঠ করা:
পদ্ধতি-১১ : মাসআলা এবং ফযিলতের প্রতি লক্ষ্য রাখা:
পদ্ধতি-১২ : ওযূর শেষের দুআ পাঠ করা:
পদ্ধতি-১৩ : সুন্দর এবং আরামদায়ক পোশাক পরিধান করা:
পদ্ধতি-১৪ : দৃষ্টিকে সালাতের সাজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা:
পদ্ধতি-১৫ : জামাতে কাতার সোজা করে দাড়াঁনো:
পদ্ধতি-১৬ : সালাতের পূর্বেই মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করা:
পদ্ধতি-১৭ : সালাতের মধ্যে হাই এলে সাধ্যমতো ঠেকানো:
পদ্ধতি-১৮ : যে সব সালাতের পূর্বে সুন্নত আছে তা আদায় করা:
পদ্ধতি-১৯ : সালাতের প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে আদায় করা:
পদ্ধতি-২০ : খাবার প্রস্তুত থাকলে তা খেয়ে সালাতে দাড়াঁনো:
পদ্ধতি-২১ : প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়া:
পদ্ধতি-২২ : সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করা:
পদ্ধতি-২৩ : আযানের জবাব দেওয়া:
পদ্ধতি-২৪ : সুগন্ধি ব্যবহার করা:
পদ্ধতি-২৫ : সুর দিয়ে পড়া:

সালাত আদায়ের পদ্ধতি, রহস্য ও গুরুত্ব

সালাত আদায়ের পদ্ধতি
সালাতের রহস্য:
সালাতের গুরুত্ব

সালাতের সাধারণ ফযিলত

১. সালাত কায়েমকারীগণ প্রকৃত মুত্তাকীন:
২. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার সর্বোত্তম পদ্ধতি সালাত:
৩. সালাত পালনকারীদের ভয় থাকবে না:
৪. সালাত কায়েমকারীদেরকে মহা প্রতিদান দেওয়া হবে:
৫. সালাত কায়েমকারীদের সঙ্গে মহান আল্লাহ আছেন:
৬. সালাত আদায়কারীগণ মহান আল্লাহর পরম বন্ধু:
৭. সালাত আদায়কারীগণ প্রকৃত মুমিন:
৮. সালাত আদায়কারীদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যদা:
৯. সালাত আদায়কারীদের জন্য রয়েছে ক্ষমা:
১০. সালাত আদায়কারীদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক রিযিক:
১১. সালাত আদায়কারীরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত:
১২. সালাত আদায়কারীর উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন:
১৩. সালাত পাপকে মিটিয়ে দেয়:
১৪. সালাত জিবিকার নিশ্চয়তা প্রদান করে:
১৫. খুশু-খুযূসহ সালাত আদায় করলে সফলতা নিশ্চিত:
১৬. সালাত রহমত পাবার নিশ্চয়তা দেয়:
১৭. সালাত অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে:
১৮. নিয়মিত সালাত কৃপণতার শিকল থেকে মুক্তি দেয়:
১৯. সালাত মধ্যবর্তী সময়ে সংঘঠিত গুনাহকে মুছে দেয়:
২০. পাচঁ ওয়াক্ত সালাত জান্নাতের গ্যারান্টি:

বিজ্ঞানের আলোকে সালাতের বহুবিধ উপকারীতা

সালাতের মধ্যে স্বাস্থ্যগত বহুবিধ উপকারীতার বিবরণ:
সালাত মুমিনের শরীর নরম এবং সতেজ রাখে:
দুশ্চিন্তামুক্ত, মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে:
ক্যালরী কমাতে এবং সহনশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে:
হাড়ের ক্ষয় রোধ করে এবং কলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে:
শরীরে এবং মস্তিস্কে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে:
সালাত স্মরনশক্তি এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করে:

হৃৎপিন্ডকে সুস্থ রাখে:
রুকুর স্বাস্থ্যগত উপকারীতা:
সাজদার স্বাস্থ্যগত উপকারীতা:

সালাত থেকে আমাদের শিক্ষা

১. আদর্শবান নেতা নির্বাচন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়:
২. আদর্শবান নেতার আনুগত্য শিক্ষা দেয়:
৩. নীতির ভিত্তিতে নেতার ভুল ধরতেও শিক্ষা দেয়:
৩. শৃঙ্খলিতভাবে জীবন-যাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়:
৪. সময়ের সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেয়:
৫. সালাত আমাদেরকে বিনয় অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়:
৬. সামাজিক বৈষম্য দূর করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে:
৭. সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিপরীতে শান্তি কামনা শিক্ষা দেয়:
৮. সর্বদা গোনাহ থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ:

সালাত আদায় না করার পরিণাম

বড় দু ঃখ আছে যারা সালাত আদায়ে গাফলতি করে:
সালাত না পড়লে অপমান ও অপদস্তের শাস্তি হবে:
সালাত না পড়লে শয়তান কানে পেশাব করে দেয়:
সালাত ত্যাগ করা কুফুর ও শিরকের দিকে ধাবিত করে:
স্বেচ্ছায় সালাত ত্যাগ করলে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়:
সালাত না পড়লে নাজাতের ওসীলা হবে না:
আযান শুনেও সালাতে উপস্থিত না হওয়া অবশ্যই জুলুম:

জামাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

জামাতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব:
জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ফযিলত:
১. ফিরিশতাগণ ক্ষমা এবং রহমতের দুআ করেন:
২. প্রতি কদমে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়:

৩. জামাতে পড়লে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব হয়:
৪. জামাতের সাথে ইশা ও ফজর আদায়ের বিষেশ ফযিলত:
৫. ইহরাম বেঁধে হজ্বে গমন করার সমান সওয়াব:
৬. একনাগাড়ে চল্লিশ দিন জামাতে সালাত স্পেশাল ফযিলত:

জামাতে সালাত আদায় না করার পরিণাম

১. রাসূলুল্লাহ সা. তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিতে চান:
২. অকারণে জামাতে না গেলে সালাত কবূল হয় না:
৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অভিমত:

মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাত করার বিধান

দ্বিতীয় জামাত জায়েয না হওয়ার দলিল:
দ্বিতীয় জামাত জায়েয হওয়ার দলিল:
একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও সমকালীন ফাতওয়া:
দ্বিতীয় জামাত জায়েয হওয়ার কয়েকটি শর্ত ও পদ্ধতি:

সালাতের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ সময়ের বিবরণ

সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময়:
যে সব সময়ে নফল সালাত আদায় করা মাকরূহ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিবরণ

ফজরের সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়:
রমযান মাসে সালাতুল ফজরের সময়:
ফজরের সালাতের রাকাত সংখ্যা:
ফজরের সালাতের সুন্নত কিরাত:
ফজরের সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:

ফজরের সুন্নত সালাতের ফযিলত:
ফজরের ফরয সালাতের গুরুত্ব:
ফজরের ফরয সালাতের ফযিলত:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

যোহরের সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
যোহরের সালাতের সুন্নত কিরাত:
চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:
চার রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:
যোহরের ফরয সালাতের গুরুত্ব:
যোহরের ফরয সালাতের ফযিলত:
যোহরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:
যোহরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:
যোহরের দুই রাকাত নফল সালাতের গুরুত্ব:
যোহরের দুই রাকাত নফল সালাতের ফযিলত:
আপনার জিজ্ঞসার জবাব:

আসরের সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
আসরের সালাতের সুন্নত কিরাত:
চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:
চার রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:
চার রাকাত ফরয সালাতের গুরুত্ব:
চার রাকাত ফরয সালাতের ফযিলত:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

মাগরিবের সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়:
মাগরিবের সালাতকে কিছুটা দ্রুত পড়া উত্তম:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
ফজরের সালাতের সুন্নত কিরাত:
ফরয সালাতের গুরুত্ব:
ফরয সালাতের ফযিলত:
সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:
সুন্নত সালাতের ফযিলত:
নফল সালাতের গুরুত্ব:
নফল সালাতের ফযিলত:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

ইশার সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
ইশার সালাতের সুন্নত কিরাত:
সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:
সুন্নত সালাতের ফযিলত:
ফরয সালাতের গুরুত্ব:
ফরয সালাতের ফযিলত:
সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:
সুন্নত সালাতের ফযিলত:
সালাতুল বিতর-এর পূর্ববর্তী নফল সালাতের গুরুত্ব:
সালাতুল বিতর-এর পূর্ববর্তী নফল সালাতের ফযিলত:
সালাতুল বিতর:
সালাতুল বিতর-এর পরবর্তী নফল সালাতের গুরুত্ব:
সালাতুল বিতর-এর পরবর্তী নফল সালাতের ফযিলত:

সালাতুল বিতরের আলোচনা

১. সালাতুল বিতর এর সময়:
২. ইসলামে সালাতুল বিতর এর বিধান/হুকুম:
৩. সালাতুল বিতর এর গুরুত্ব:
৪. ইসলামে সালাতুল বিতর এর ফযিলত:
৫. ইসলামে সালাতুল বিতর এর রাকাত সংখ্যা:
৬. সহীহ হাদীসের আলোকে কুনূত পড়ার সময়:
৭. সালাতুল বিতিরের দুআয়ে কুনূত ও কিছু কথা:
৮. দুআয়ে কুনূত এর আগে-পরে হাত উঠানোর বিধান:
৯. আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:
১০. আপনাদের কাছে আমাদের প্রস্তাব:

সালাতুল জুমার আলোচনা

সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
সালাতুল জুমার ফযিলত:
সালাতুল জুমআ না পড়ার পরিণাম:
সালাতুল জুমআ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ:
জুমার সালাতের সুন্নত কিরাত:
চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:
চার রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:
দুই রাকাত ফরয সালাতের গুরুত্ব:
দুই রাকাত ফরয সালাতের ফযিলত:
দুই রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:
দুই রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:
চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:
চার রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুল জানাযা

সালাতুল জানাযা ও কিছু জরুরী কথা:
সালাতুল জানাযার ফযিলত:
মৃতকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি:
মৃতকে কাফন দেওয়ার পদ্ধতি:
কাফনের প্রকারভেদ:
পুরুষকে কাফন দেওয়ার নিয়ম:
মহিলাকে কাফন পরিধান করানোর নিয়ম:
সালাতুল জানাযার নিয়ম:
সালাতুল জানাযার বিধান:
সালাতুল জানাযার ফরয দুটি:
সালাতুল জানাযার সুন্নত:
সালাতুল জানাযাতে মৃত ছেলে শিশুর জন্য দুআ:
লাশ বহন করার নিয়ম:
গায়েবানা জানাযার সালাত:
সালাতুল জানাযা ও কাফন-দাফন সম্পর্কিত দুআ:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা:
ঈদের ইতিহাস:
ঈদের উদ্দেশ্য:
সালাতুল ঈদের সময়:
সালাতুল ঈদের পদ্ধতি:
দুই ঈদের খুতবা:
ঈদুল ফিতরের দিনে সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমল:
ঈদের খুতবার সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুত তারাবীর আলোচনা

১. সালাতুত তারাবী ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা:
২. সালাতুত তারাবীর সময়:
৩. ইসলামে সালাতুত তারাবীরর হুকুম/বিধান:
৪. ইসলামে সালাতুত তারাবীর গুরুত্ব:
৫. ইসলামে সালাতুত তারাবীর ফযিলত:
৬. ইসলামে সালাতুত তারাবীর রাকাত সংখ্যা:
৭. সালাতুত তারাবীর শিক্ষা:
৮. আপনাদের কাছে আমাদের প্রস্তাব:
৯. অপ্রাসঙ্গিক এবং ভিত্তিহীন বর্ণনার পর্যালোচনা:
৯. আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুল কাযা

সালাতুল কাযা ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:
সালাতুল কাযার গুরুত্ব:
সালাত আদায় না করার পরিণাম
সালাতুল কাযা আদায়ের নীতিমালা:
কাযা নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান:

সালাতুল মারিয বা অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

সালাতুল মারিয ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:
সালাতুল মারিযের বিধান বা হুকুম:
সালাতুল মারিযের সময়:
সালাতুল মারিযের রাকাত সংখ্যা:
সালাতুল মারিয আদায়ের নিয়ম:
সালাতুল মারিযের নিয়ত:
সালাতুল মারিযের গুরুত্ব:
সালাতুল মারিযের ফযিলত:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুল মুসাফির

মুসাফিরের সালাত ও কিছু কথা:
ফরয সালাতে কসর করার বিধান:
ওয়াজিব এবং অন্যান্য সুন্নত ও নফল সালাতে কসর করার বিধান:
মুসাফিরের সালাতের নিয়্যত:
মুসাফিরের সালাত আদায়ের নিয়ম:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুত তাহাজ্জুদ

সালাতুত তাহাজ্জুদ ও কিছু কথা:
সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের নিয়ম:
তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব:
তাহাজ্জুদ সালাতের ফযিলত:

১. সম্মানের সর্বোচ্চ স্থানে পৌছার সোপান:
২. আদায়কারীরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা:
৩. মনের কুপ্রবৃত্তি দলনের সর্বোত্তম পদ্ধতি:
৪. সকল বৈধ কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূরণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম:
৫. মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয়:
৬. জান্নাতের লোভনীয় অট্টালিকা বরাদ্ধ:
৭. সালাতুত তাহাজ্জুদ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়:
৮. সালাতুত তাহাজ্জুদ মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী:
৯. সালাতুত তাহাজ্জুদ গুনাহ মোচনকারী:
১০. সালাতুত তাহাজ্জুদ শরীর থেকে রোগ দূরীভূতকারী:
১১ সালাতুত তাহাজ্জুদ সকল নফল সালাতের মধ্যে সর্বোত্তম:
১২. মহান আল্লাহ ভালোবাসেন:
১৩. মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন:
১৪. সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়কারী শ্রেষ্ঠ উম্মত:

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুদ দোহা (চাশত ও ইশরাক)

কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:
সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
সালাতের গুরুত্ব:
সালাতুদ দোহার ফযিলত:

সালাতুল আওয়াবীনের আলোচনা

সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
সালাতের গুরুত্ব:
সালাতের ফযিলত:

১. সালাতুল আওয়াবীন পড়লে চোখ জোড়ানো সামগ্রী বরাদ্ধ:
২. বার বছর নফল ইবাদত করার সমান সওয়াব অর্জন:
৩. সালাতুল আওয়াবীনকে ইল্লিয়্যিনে উঠানো হয়:
৪. সালাতুল আওয়াবীন পড়লে জান্নাতে বাড়ী বরাদ্ধ:

তাহিয়্যাতুল ওযূ

তাহিয়্যাতুল ওযূর পরিচয় ও বিধান:
তাহিয়্যাতুল ওযূর সময়:
তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়্যত:
তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়ম:
তাহিয়্যাতুল ওযূর ফযিলত:

১. তাহিয়্যাতুল ওযূর দ্বারা সকল ছগীরা গুনাহ ক্ষমা করা হয়:
২. জান্নাতে হযরত বিলালের জুতার আওয়াজ শুনতে পাওয়া:
৩. তাহিয়্যাতুল ওযূ জান্নাতের ব্যবস্থা:
৪. তাহিয়্যাতুল ওযূ মানুষকে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় বানিয়ে দেয়:

তাহিয়্যাতুল মসজিদ

তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর পরিচয় ও সময়:
সালাতের নিয়্যত:
সালাতের নিয়ম:
তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর রাকাত সংখ্যা:
সালাতের গুরুত্ব:
তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর ফযিলত:
তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর বিধান বা হুকুম:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুয যাওয়াল

সালাতের পরিচয় ও কিছু কথা:
সালাতের সময়:
সালাতুয যাওয়ালের রাকাত সংখ্যা:
সালাতুয যাওয়ালের নিয়ত:
সালাতুয যাওয়াল আদায়ের নিয়ম:
সালাতুয যাওয়ালের গুরুত্ব:
সারাতুয যাওয়ালের ফযিলত:
১। আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়।
২। সালাতুয যাওয়াল শেষ রাতের সালাতের সমতুল্য:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুস শোকর বা কৃতজ্ঞতার সালাত

সালাতুস শোকর ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:
সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
সালাতুস শোকর এর নিয়ত:
সালাতের নিয়ম:
সালাতুস শোকরের ফযিলত:
সালাতের গুরুত্ব:

সালাতুল ইস্তিখারা

সালাতুল ইস্তিখারার পরিচয় ও প্রেক্ষাপট:
সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
সালাতের গুরুত্ব:
সালাতের নিয়ম ও দুআ:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহর পরিচয় ও প্রেক্ষাপট:
সালাতের সময়:
সালাতুত তাসবীহর বিধান বা হুকুম:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
সালাতের নিয়্যত:
সালাতের গুরুত্ব:
সালাতের ফযিলত:
সালাতের নিয়ম:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুত তাওবা

সালাতুত তাওবা ও কিছু কথা:
সালাতের সময়:
সালাতের নিয়্যত:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
সালাতের নিয়ম:
সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত:
১. সালাতুত তাওবার দ্বারা গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়:
২. সালাতুত তাওবার বিনিময় জান্নাত:
সালাতুত তাওবা কবুলের শর্ত:

সালাতুল হাজাহ

সালাতুল হাজাহ-এর পরিচয়:
সালাতুল হাজাহ-এর প্রেক্ষাপট:
সালাতুল হাজাহ-এর সময়:
সালাতের নিয়্যত:
সালাতের নিয়ম:
সালাতুল হাজাহ-এর রাকাত সংখ্যা:
সালাতুল হাজাহ-এর ফযিলত:
সালাতুল হাজাহ-এর শেষে যে দুআ করা উত্তম:

সালাতুল খাউফ

সালাতুল খাউফ এর পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক কথা:
সালাতুল খাউফ-এর রাকাত সংখ্যা:
সালাতুল খাউফ এর প্রেক্ষাপট:
সালাতুল খাউফ আদায়ের নিয়ম বা পদ্ধতি:
সালাতুল খাউফ এর নিয়ত:
সালাতুল খাউফ আদায়ের সময়:

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সালাত

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের কারণ:
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন:
সালাতের সময়:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
সালাতের নিয়ম:
চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় আমাদের করণীয়:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

সালাতুল ইস্তিস্‌কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত

সালাতুল ইস্তিস্‌কা:
সালাতুল ইস্তিস্‌কার কারণ:

ইস্তিস্‌কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার দুটি পদ্ধতি:
ইস্তিস্‌কার প্রথম পদ্ধতির বিবরণ:
সালাতের রাকাত সংখ্যা:
সালাত আদায়ের সময় ও স্থান:
সালাত আদায়ের পদ্ধতি:
ইস্তিস্‌কার দ্বিতীয় পদ্ধতির বিবরণ:

জমা বাইনাস সালাতাইন

(দুটি সালাতকে একত্রে পড়া)

জমা বাইনাস সালাতাইন ও কিছু কথা:
হাদীসের আলোকে জমা বাইনাস সালাতাইন:
জমা বাইনাস সালাতাইন-এর দুটি পদ্ধতি:
জমা বাইনাস সালাতাইন-এর বিধান:
আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

লাইলাতুল কদরের সালাত

লাইলাতুল কদরের পরিচয় ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:
লাইলাতুল কদরের ইতিহাস:
লাইলাতুল কদর কখন?
লাইলাতুল কদর অনির্দিষ্ট রাখার রহস্য:
লাইলাতুল কদরের নিদর্শন:
লাইলাতুল কদরের আমল:
লাইলাতুল কদরের সালাতের রাকাত সংখ্যা ও পড়ার নিয়ম:
লাইলাতুল কদরের ফযিলত:

শবে বরাতের সালাত

শবে বরাতের পরিচয়:
শবে বরাত ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:
মধ্য শাবানের রাত ও এ রাতের সালাতের গুরুত্ব:

শবে বরাত ও সালাতের ফযিলতঃ

১. শিরক এবং বিদ্বেষে জড়িত ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করা হয়ঃ

২. আত্মহত্যাকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করা হয়ঃ

৩. হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় লিপ্ত ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করা হয়ঃ

৪. অসংখ্য-অগণিত মানুষ ক্ষমা লাভ করে মধ্য শাবানের রাতেঃ

৫. ব্যাভিচার এবং শিরক থেকে মুক্ত সকল অপরাধীকে ক্ষমা করা হয়,

৬. প্রার্থনাকারীকে দান করা হয়ঃ

৭. পাঁচ রাতের দুআ বিফলে ফেরত দেওয়া হয় নাঃ

শবে বরাতের আমলঃ

১. গোরস্থানে যিয়ারত ও মৃতদের জন্য দুআঃ (এই হাদীসটি দুর্বল)

২. রাতে নফল ইবাদত এবং দিনের বেলায় সিয়াম পালন করাঃ

৩. রাতে দীর্ঘ সাজদার মাধ্যমে সালাত এবং সাজাদাতে দুআঃ

৪. মধ্য শাবানের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা

মধ্য শাবানের রজনীতেও যারা মুক্তি পাবে নাঃ

বিদআত থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য কর্তব্য

আতশবাজীঃ

আলোকসজ্জাঃ

হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি বিতরণঃ

সন্ধার পর গোসল অত্যাবশ্যক মনে করাঃ

শবে বরাত সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর এবং হাদীসের নামে বানোয়াট কথা

মধ্য শাবানের রাতের সালাতের নিয়ম, সময় এবং রাকাত সংখ্যাঃ

শবে বরাতের সালাতের নিয়্যতঃ

মধ্য শাবানের রাতে কাঙ্খিত ফলাফল লাভের পূর্বশর্ত

(১) বিশুদ্ধ ঈমানঃ

(২) ইবাদত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়াঃ

(৩) সুন্নাতের অনুসরণঃ

(৪) হালাল ভক্ষণ করা হারাম বর্জন করাঃ

(৫) অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখাঃ

প্রতিটি মুমিনের প্রতি আমাদের শেষ কথা

পবিত্রতা, সালাত এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

পবিত্রতা অর্জন করা

পবিত্রতা সালাত আদায়ের চাবি। মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উত্তম পদ্ধতি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীকে পছন্দ করেন।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্রতার প্রতি বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনকারীদের প্রশংসা করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন-

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

সেখানে (মসজিদে কুবার আশপাশে) এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্র থাকতে ভালবাসেন। আর আল্লাহ তায়ালা পবিত্রদেরকে ভালবাসেন।[২]

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী, হযরত জাবের ও হযরত আনাস রাদি. প্রমুখ বলেন কুবায় বসবাসকারী আনসার সাহাবিদের সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আনসারগণ! আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতার ব্যপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন, এখন তোমাদের পবিত্রতার বর্ণনা দাও। তারা বললেন, আমরা সালাতের জন্য ওযূ করি। গোসল ফরয হলে গোসল করি। ঢিলা ব্যবহার করার পর পানিও ব্যবহার করি। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-২২২
[২] সূরা তাওবা, আয়াত-১০৮

" فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ "

হ্যাঁ, এই সেই পবিত্রতা, তোমরা একে আকঁড়ে ধর।[৩]

অন্য হাদীসে এসেছে-

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ

পবিত্রতা ঈমানের অংশ।[৪]

পেশাব-পায়খানার সময় সাতটি কাজ করা সুন্নত

১. বাম পা দিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করা।
২. জুতা/স্যান্ডেল পায়ে রাখা।
৩. মাথা ঢেকে রাখা।
৪. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা।
৫. পানি খরচ করা।
৬. ডান পা দিয়ে বের হওয়া।
৭. বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এবং বের হয়ে দুআ পড়া।

বাথরুমে প্রবেশের দুআ:

হাদীসে এসেছে-

بِسْمِ اللهِ/ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

বিছমিল্লাহি/আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবাইছ।

আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অপবিত্র জ্বিন নর ও নারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৫]

---

[৩] সুনানু ইবনে মাজাহ
[৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৫৬
[৫] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৩২২

বাথরুম হতে বের হবার দুআ: -১

غُفْرَانَكَ (গুফরানাকা)

আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৬]

বাথরুম হতে বের হবার দুআ: -২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِيْ

আলহামদু লিল্লা হিল্লাযী, আযহাবা আন্নীল আযা, ওয়া আফানী।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে শান্তি দান করেছেন।[৭]

নোট:

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! আপনাদের অবগতির জন্য আমরা এখানে একটি সংশয়ের নিরসন করছি। আর তা হলো, আপনারা হয়তো কোনো কোনো কিতাবে পেশাব-পায়খানার সুন্নত আরও কম-বেশি দেখেছেন বা দেখবেন। তখন স্বাভাবিক একটা সংশয় দেখা দিতে পারে যে, কোথাও পেশাব-পায়খানার সুন্নত কম উল্লেখিত হয়েছে। আবার কোথাও বেশি উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ কী? যারা বেশি উল্লেখ করেছেন, তারা কি হাদীসের নামে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে বেশি সুন্নাতের কথা উল্লেখ করেছেন? নাকি যারা সুন্নতগুলোকে কম উল্লেখ করেছেন, তারা হাদীস সম্পর্কে কম জানেন?

আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন তাহলে এই সংশয়ের নিরসন খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। এই সংশয়ের নিরসন হলো-

(ক) যারা কম সুন্নতের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা সুন্নতের কথাগুলোকে এমনভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কম কথার মধ্যেই বেশি সুন্নতের কথা আলোচিত হয়েছে। (খ) যারা বেশি সুন্নতের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা পাঠকের প্রতি লক্ষ্য করে আলোচনাকে একটু বিস্তারীত করতে গিয়ে

[৬] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-৯৯০৭

[৭] সুনানু ইবনে মাযাহ, হাদীস- ৩০১

সুন্নতের কথাগুলোকে ভাগভাগ করে আলোচনা করেছেন। ফলে তাদের হিসেবে সুন্নতের সংখ্যা বেশি হয়েছে।

(গ) কম-বেশি হওয়ার এটিও একটি কারণ যে, মুজতাহিদ ইমাম (হাদীসের উচ্চ:স্তরের গবেষক) যারা ছিলেন তাদের নিজস্ব মূলনীতিতে কিছুটা তারতম্য থাকার কারণে এসব ক্ষেত্রে কিছুটা কম-বেশি হয়েছে।

(ঘ) এসব ক্ষেত্রে কোনো লিখক বা গবেষক কোনো মুস্তাহাব বা নফল আমলকে সুন্নত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনটা করা দুষনীয়ও নয়।

মিসওয়াক, ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম

মিসওয়াক করার ফযিলত:

১. কঠোরতার আশঙ্কা না হলে প্রত্যেক সালাতের জন্যে মিসওয়াক ওয়াজিব করা হতো:

হাদীসে এসেছে-

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি উম্মতের জন্য কঠিন হওয়ার আশঙ্কা না হতো, তবে আমি তাদের উপর প্রত্যেক সালাতের জন্যে মিসওয়াক ওয়াজিব করে দিতাম।[৮]

২. মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম কারণ:

হাদীসে এসেছে-

مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন মিসওয়াক করা মুখের পবিত্রতার উপায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ।[৯]

[৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৯৩৩

[৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৯৩৩

৩. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সব সময় মিসওয়াক করার কথা বলেছেন:

আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখনই আমার কাছে এসেছেন, তখনই মিসওয়াক করার কথা বলেছেন। বারবার তাকীদ করার কারণে এমন আশঙ্কা হয় যে, আমি আমার মুখের অগ্রভাগ মিসওয়াক করতে করতে ক্ষয় না করে ফেলি।[১০]

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠে ওযূ করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন:

হাদীসে এসেছে-

كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল দিনে অথবা রাত্রে যখনই তিনি ঘুম থেকে উঠতেন তখন ওযূ করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন। ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বশেষ কাজ ছিল মিসওয়াক করা।[১১]

৫. মিসওয়াক করে সালাত আদায় করলে সত্তর গুণ সওয়াব:

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে সালাতের জন্য মিসওয়াক করা হয়, তা মিসওয়াকবিহীন সালাতের অপেক্ষা সত্তরগুণ উত্তম।[১২]

---

[১০] মুসনাদু আহমদ, হাদীস-২২২৬৯

[১১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫৭

[১২] মুসনাদু আহমদ, হাদীস-২৬৩৪০

৬. ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বশেষ কাজ ছিল মিসওয়াক করা।

ওযূর প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযূও অংগগুলোতে ভালোভাবে পানি ব্যবহার করতেন। তবে তিনি ওযূতে পানি অপচয় করতেন না। তিনি উম্মতকেও পানি অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন:

'আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক ওযূর মধ্যে পানি অপচয় করবে। (অথচ এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রসূত কাজ)। তিনি আরও বলেছেন: ওযূ করার সময় ওলহান নামের শয়তান এসে (অধিক পানি ব্যয় করার জন্য) ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। তোমরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না।'

হাদীসে এসেছে-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

হযরত সা'দ রাদি. একবার ওযূ করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন: সা'দ! পানির অপচয় করো না। সা'দ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পানিতেও কী অপচয় আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তুমি যদি কোনো প্রবাহমান নদীর কূলে বসেও ওযূ করো, সেখানেও অপচয় আছে। তুমি সর্বাবস্থায় অপচয় থেকে আত্মরক্ষা করো।'[১৩]

ওযূর প্রকারভেদ:

ওযূ তিন প্রকার: ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. মুস্তাহাব।

ফরয ওযূর বিবরণ:

চার কারণে ওযূবিহীন ব্যক্তির উপর ওযূ করা ফরয।

---

[১৩] মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ৭০৬৫

১. যে কোনো সালাতের জন্য ওযূ করা ফরয। চাই ফরয সালাত হোক বা নফল।

২. সালাতুল জানাযার জন্য ওযূ করা ফরয।

৩. তিলাওয়াতে সাজদা আদায় করার জন্য ওযূ করা ফরয।

৪. আল-কুরআনুল কারীম ধরা বা ছোয়ার জন্যও ওযূ করা ফরয। যদি দেয়ালে বা কাগজে অথবা অন্য কোথাও কুরআনের আয়াত লিখা থাকে সেটা ধরা বা ছোয়ার জন্যও ওযূ করা ফরয।

ওয়াজিব ওযূর বিবরণ:

শুধু একটি বিষয়ের জন্য ওযূ করা ওয়াজিব। আর তা হলো, বাইতুল্লাহর (কাবার) তওয়াফ করার জন্য।

মুস্তাহাব ওযূর বিবরণ:

কয়েকটি কারণে ওযূ করা মুস্তাহাব।

১. পবিত্র অবস্থায় ঘুমানোর জন্য।

২. ঘুম থেকে জাগ্রত হলে।

৩. সব সময় ওযূ অবস্থায় থাকার জন্য।

৪. ওযূ থাকা অবস্থায় আবারও ওযূ করা সওয়াব লাভের নিয়তে। তবে এর শর্ত হল, যদি প্রথম ওযূ দ্বারা কোনো ইবাদত করা হয়ে থাকে। আর যদি প্রথম ওযূ দ্বারা কোনো ইবাদত বা আমল না করা হয়, তাহলে ওযূ থাকা অবস্থায় আবারও ওযূ করা অপচয়ের অন্তর্ভূক্ত।

৫. পরনিন্দা, মিথ্যা ও যে কোনো গুনাহর পর ওযূ করা মুস্তাহাব।

৬. সালাতের বাইরে অট্র হাসি দেওয়ার পর।

৭. মৃতকে গোসল দেয়ার জন্য।

৮. মৃতকে বহন করার জন্য।

৯. প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করা, (ওযূ থাকার পরও)।

১০. ফরয গোসল করার পূর্বে ওযূ করা মুস্তাহাব।

১১. গোসল ফরয অবস্থায় পানাহারের পূর্বে ওযূ করা মুস্তাহাব।

১২. রাগ বা ক্রোধ এলে ওযূ করা মুস্তাহাব।

১৩. মৌখিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার সময়।

১৪. হাদীস পড়া ও বর্ণনা করার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

১৫. ইসলামের জ্ঞান অর্জন করার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

১৬. আযান দেয়ার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

১৭. সালাতের ইক্বামত বলার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

১৮. খুতবা দেয়ার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

১৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা জিয়ারত করার জন্য।

২০. আরাফাতে অবস্থানের জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

২১. সাফা এবং মারওয়াতে দৌড়ানোর জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

ওযূ করার ফযিলত:

১. ওযূর দ্বারা হাত-পা এবং মুখমণ্ডল উজ্জল হবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا
مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

হযরত আবু নুয়াঈম (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আবু হুরায়রা রাদি. এর সাথে মসজিদের ছাদে উঠলাম। তিনি ওযূ করলেন। তারপর বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় আহবান করা হবে যে, ওযূর কারণে তাদের হাত-পা এবং মুখমণ্ডল উজ্জল থাকবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উজ্জলতা বৃদ্ধি করতে চায় সে যেন তা বৃদ্ধি করে নেয়।[১৪]

---

[১৪] সহীহ বুখারী

২. ওযূর দ্বারা মুখ, হাত এবং পায়ের গুনাহ মুছে যায়:

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ঈমানদার ওযূ করবে, সে যখন মুখ ধৌত করবে তখন পানির ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে বা শেষ ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে চোখের দ্বারা যত (ছগীরা) গুনাহ হয়েছে সব ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারপর যখন দুই হাত কনুইসহ ধৌত করবে, তখন পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে হাতের দ্বারা যতো (ছগীরা) গুনাহ হয়েছে সব ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারপর যখন পা ধৌত করবে তখন পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে পা দ্বারা যতো (ছগীরা) গুনাহ হয়েছে সব ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাবে।[১৫]

৩. বাড়ি থেকে ওযূ করে ফরয সালাতের জন্য মসজিদে গমন করলে ইহরাম বেঁধে হজ্জে গমন করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ

হযরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি ঘর থেকে উত্তমভাবে ওযূ করে বের

[১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬০০

হয়ে ফরয সালাতের জন্য মসজিদে গমন করে তার বিনিময় হলো ইহরাম বেঁধে হজ্জে গমন করার সমান সওয়াব। আর যে ব্যক্তি সালাতুদ দোহা আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয় তার বিনিময় হল ওমরা আদায় করার সমান সওয়াব।[১৬]

৪. ওযূ সালাতের চাবি:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاَةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوءُ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জান্নাতের চাবি হচ্ছে সালাত। সালাতের চাবি হলো ওযূ।[১৭]

৫. ওযূ মানুষকে নিষ্পাপ বানিয়ে দেয়:

হাদীসে এসেছে-

عَن عَمْرِو بْنَ عَبَسَةَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْوُضُوءُ قَالَ أَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ فَأَنْقَيْتَهُمَا خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِكَ وَأَنَامِلِكَ فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ فَإِنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ

হযরত আমর ইবনে আবাসা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওযূর মধ্যে উপকার কী? তিনি বললেন: যখন তুমি ওযূ করবে ও দুই হাতের কব্জি পরিষ্কার করে ধৌত করবে, তখন তোমার গুনাহ সমূহ আঙ্গুলের অগ্রভাগ ও নখ দিয়ে বের হয়ে যাবে।

[১৬] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫৫৮

[১৭] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪০০

এরপর যখন তুমি কুলি করবে, দুনাকের ছিদ্রে পানি দিয়ে পরিষ্কার করবে, মুখ ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, মাথা মাসাহ করবে এবং উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে, তখন তুমি যেন তোমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলে। এরপর যখন তুমি তোমার চেহারাকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জমিনে রাখবে (সালাত আদায় করবে) তখন তুমি এমনভাবে নিষ্পাপ হয়ে যাবে, যেন আজ তোমার আম্মু তোমাকে জন্ম দিয়েছে।[১৮]

৬. ওযূ হলো উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ له رجل يا رسول الله : كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الأُمَمِ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ.

হযরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আপনার উম্মত পর্যন্ত অসংখ্য উম্মতের মাঝে আপনি কিভাবে আপনার উম্মতের পরিচয় পাবেন? তিনি বললেন, ওযূর কারণে তারা আলোকিত হবে। তারা ব্যতীত আর কারো এমন হবে না। আমি তাদেরকে এজন্য পরিচয় করতে পারব যে, তাদের আমলের হিসাব ডান হাতে দেয়া হবে। তাদেরকে পরিচয়ে এটিও একটি পদ্ধতি যে, তাদের সামনে তাদের সন্তানরা দৌড়াতে থাকবে।[১৯]

নবীজি এবং সাহাবিগণ যেভাবে ওযূ করতেন:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ

[১৮] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-১৪৭

[১৯] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-২১৭৮৫

وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদি.-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি ওসমান রাদি.-কে কারো মাধ্যমে ওযূর জন্য পানি সংগ্রহ করতে বললেন। এরপর তিনি সে পাত্র থেকে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর তাঁর ডান হাত পানিতে প্রবেশ করালেন। কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করলেন। এরপর সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করলেন। এরপর প্রত্যেক পা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর বললেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, আমি এখন যেভাবে ওযূ করেছি তিনি সেভাবে ওযূ করেছেন এবং তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করে একাগ্রতার সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, মহান আল্লাহ তাঁর অতীতের সকল (ছোট-খাট) গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[২০]

ওযূ শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ:

তিনটি শর্ত পাওয়া না গেলে ওযূ শুদ্ধ হয় না। অনুরূপভাবে এই শর্তসমূহ পূরণ না হলে ওযূর অভীষ্ট উপকারও অর্জিত হয় না।

১. যে সব অঙ্গ ধোয়া আবশ্যক, সে সব অঙ্গে পানি পৌঁছা।

২. ত্বকে এমন কিছু না থাকা, যা পানি পৌঁছতে প্রতিবন্ধক হয়। যেমন- মোম, আঠা, গাম ইত্যাদি।

৩. এমন কোন কিছু না থাকতে হবে যা ওযূকে নষ্ট করে দেয়। যদি ওযূ করা অবস্থায় ওযূ নষ্টকারী কোনো বিষয় পাওয়া যায়, তাহলে ওযূ শুদ্ধ হবে না।

[২০] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৬৪

ওযূর ফরয চারটি:

১. সমস্ত মুখ ধৌত করা।[২১]

২. উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।[২২]

৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করা।[২৩]

৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।[২৪]

উপরোক্ত চারটি কাজের কোনো একটি কাজ না করলে বা এর মধ্যে একচুল পরিমাণও শুকনা থাকলে ওযূ বিশুদ্ধ হবে না।[২৫]

ওযূর সুন্নতসমূহ:

ওযূর সুন্নাত ১৮টি। ওযূতে এই সুন্নতগুলো যত্নের সঙ্গে আদায় করলে ওযূ পরিপূর্ণ হয়। অন্যথায় ওযূ অসম্পূর্ণ থাকে।

১. ওযূ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা, সালাত বৈধ হওয়া এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়ত করা।

২. ওযূর শুরুতে এবং মাঝে দুআ পড়া।

ওযূ ও গোসলের পূর্বের দুআ:

بِسْمِ اللهِ / بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিছমিল্লাহ/বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

আল্লাহর নামে/পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।[২৬]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

[২১] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬

[২২] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬

[২৩] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬

[২৪] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬

[২৫] ফাতওয়ায়ে শামী

[২৬] আবু দাউদ, হাদীস-১০১

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ঐ ব্যক্তির সালাত বিশুদ্ধ হবে না যার ওযূ বিশুদ্ধ হবে না। আর যে ব্যক্তি ওযূর শুরুতে বিছমিল্লাহ / বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম না বলবে, তার ওযূ বিশুদ্ধ হবে না, (সুন্নতসহ আদায় হবে না)।[২৭]

নোট: ওযূর আগে এই দুআ ছাড়া অন্য কোনো দুআ নেই। অথচ আমাদের দেশে অনেকে নাওয়াইতু আন.... ইত্যাদি দুআ পড়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হাদীসে এমন কিছুই নেই।[২৮]

ওযূর মাঝে পড়ার দুআ:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী যামবী, ওয়া ওয়াছ ছিয়্লী ফী দা-রী, ওয়া বা-রিকলী ফী রিয্ক্বী।

হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আমার ঘর প্রশস্ত করে দাও এবং আমার রিযিকে বরকত দান করো।[২৯]

৩. উভয় হাত পৃথক পৃথক ভাবে কব্জিসহ তিনবার করে ধৌত করা।

৪. মিসওয়াক করা: মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা।

৫. গড়গড়া করে তিনবার কুলি করা: তবে সিয়াম পালনরত অবস্থায় গড়গড়া না করা।

৬. তিনবার নাকের ভেতর পানি দেয়া। বাম হাতের কনি আঙ্গুল দ্বারা নাকের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করা। আর যদি সিয়াম পালনরত না হয় তাহলে পানি টেনে নাকের নরম স্থান পর্যন্ত নেয়া এবং ঝেড়ে ফেলা উত্তম।

৭. ওযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা:

হাদীসে এসেছে-

[২৭] আবু দাউদ, হাদীস-১০১

[২৮] বিস্তারীত: যাদুল মায়াদ

[২৯] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-৯৯০৮

وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: إن رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: هَذَا وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ

হযরত ওসমান রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার করে ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করেছেন। তারপর বলেছেন, এটা হলো আমার এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ওযূ।[৩০]

৮. দাঁড়ি খিলাল করা: মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় এক হাতে পানি নিয়ে থুতনিতে লাগিয়ে ঘষা। তারপর হাতের তালু বাইরের দিকে রেখে গলার দিক থেকে দাঁড়ি খেলাল করা।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَنَسٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ওযূ করতেন তখন তিনি এক কোষ পানি হাতে নিয়ে থুতনির নীচে দিয়ে তা দ্বারা দাঁড়ি খিলাল করতেন এবং তিনি বলতেন আমার প্রতিপালক আমাকে এমন করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৩১]

নোট: দাঁড়ি খিলাল করা সুন্নত। দাঁড়ি যদি বেশি পাতলা হয়, অর্থাৎ দাঁড়ির মধ্য দিয়ে চামরা দেখা যায় তবে দাঁড়ির নীচে পানি পৌছানো ওয়াজিব। আর দাঁড়ি যদি অধিক ঘন হয়, অর্থাৎ দাঁড়ির মধ্য দিয়ে চামরা দেখা না যায় তাহলে দাঁড়ির নীচে পানি পৌছানো ওয়াজিব নয়, বরং খিলাল করা মুস্তাহাব।

৯. কনুইসহ হাত এবং টাখনুসহ পা ধোয়ার সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা:

হাদীসে এসেছে-

[৩০] মিশকাত, হাদীস-৪২৪

[৩১] আবু দাউদ, হাদীস-১৪৫

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তুমি ওযূ করবে তখন দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে।[৩২]

উল্লেখ্য যে, আঙ্গুল খিলাল করার নিয়ম হলো, এক হাতের আঙ্গুলের পেট অপর হাতের আঙ্গুল সমূহের ফাঁকে রেখে খিলাল করা। আর ডান পায়ের কনি থেকে বাম পায়ের কনি আঙ্গুল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাম হাতের কনি আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করা।

১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা:

হাদীসে এসেছে-

ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا

(তিনি হযরত আলী রাদি. পাত্র হতে পানি নিয়ে একবার মাথা মাসাহ করলেন। তারপর প্রথমে ডান পা তিনবার এবং বাম পা তিনবার করে ধৌত করলেন।[৩৩]

১১. উভয় কানের ভেতর এবং বাইরে মাসাহ করা:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم . . . ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম . . . . . অত:পর স্বীয় মাথা এবং উভয় কান মাসাহ করেছেন। কানের ভেতরের অংশ উভয় শাহাদাত

[৩২] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৩৯

[৩৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১১১

(তর্জনী) আঙ্গুল দ্বারা এবং কানের উপরিভাগে বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা মাসাহ করেছেন।[৩৪]

১২. ওযূর অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে এবং ঘষে-মেজে ধৌত করা।

১৩. প্রত্যেক অঙ্গ পর পর ধোয়া। (এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই অন্য অঙ্গ ধোয়া।

১৪. ওযূর অঙ্গসমূহ ধারাবাহিকভাবে ধোয়া।

১৫. ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গসমূহ ধোয়া আরম্ভ করা।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তোমরা পোষাক পরিধান করবে এবং ওযূ করবে তখন ডান দিন থেকে আরম্ভ করবে।[৩৫]

১৬. মাথা মাসাহ করার সময় কপাল থেকে শুরু করা। আর হাত-পা ধোয়ার সময় আঙ্গুলের দিক থেকে শুরু করা।

১৭. গর্দানের পেছনের অংশ হাতের আঙ্গুলের পীঠ দ্বারা মাসাহ করা। (গর্দানের ডান-বাম এবং গলা মাসাহ করা নিষেধ।)

১৮. ওযূর শেষে এই দুআ পড়া।

ওযূর শেষের দুআ: -১

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহ। ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।[৩৬]

[৩৪] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-১০২

[৩৫] আবু দাউদ, হাদীস-৪১৪৩

ওযূর শেষের দুআ: -২

اللّٰهمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، واجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ،

আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবীন। ওয়াজ আলনী মিনাল মুত্বা ত্বাহ্‌হিরীন।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করো।[৩৭]

ফযিলত: যে এই দুআ পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।[৩৮]

ওযূর শেষের দুআ: -৩

سُبْحانَكَ اللّٰهمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوْبُ إِلَيْكَ

ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আংতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি।[৩৯]

ফযিলত: আবু সাঈদ রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; কেউ ওযূ করার পরে এ দুআ পড়লে মহান আল্লাহ তা একটি পত্রে লিখে মোহরাঙ্কিত করে আরশের নিচে রেখে দেন। কিয়ামতের আগে সে মোহর ভাঙ্গা হবে না।[৪০]

নোট: প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! আপনাদের অবগতির জন্য আমরা এখানে একটি সংশয়ের নিরসন করছি। আর তা হলো, আপনারা হয়তো কোনো

[৩৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৭

[৩৭] তিরমিযি, হাদীস-৫৫

[৩৮] তিরমিযি, হাদীস-৫৫

[৩৯] আস-সুনানুল কতবুও়া, হাদীস-৯৯১১; হিসনুল মুসলিম

[৪০] আস-সুনানুল কতবুও়া, হাদীস-৯৯১১

কোনো কিতাবে ওযূর সুন্নত আরও কম-বেশি দেখেছেন বা দেখে থাকবেন। তখন স্বাভাবিক একটা সংশয় দেখা দিতে পারে যে, কোথাও ওযূর সুন্নত কম উল্লেখিত হয়েছে। আবার কোথাও বেশি উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ কী? যারা বেশি উল্লেখ করেছেন, তারা কি হাদীসের নামে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে বেশি সুন্নাতের কথা উল্লেখ করেছেন? নাকি যারা সুন্নতগুলোকে কম উল্লেখ করেছেন, তারা হাদীস সম্পর্কে কম জানেন?

আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন তাহলে এই সংশয়ের নিরসন খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। এই সংশয়ের নিরসন হলো, (ক) যারা কম সুন্নতের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা সুন্নতের কথাগুলোকে এমনভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কম কথার মধ্যেই বেশি সুন্নতের কথা আলোচিত হয়েছে। (খ) যারা বেশি সুন্নতের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা পাঠকের প্রতি লক্ষ্য করে আলোচনাকে একটু বিস্তারীত করতে গিয়ে সুন্নতের কথাগুলোকে ভাগভাগ করে আলোচনা করেছেন। ফলে তাদের হিসেবে সুন্নতের সংখ্যা বেশি হয়েছে। (গ) কম-বেশি হওয়ার এটিও একটি কারণ যে, মুজতাহিদ ইমাম (হাদীসের উচ্চ:স্তরের গবেষক) যারা ছিলেন তাদের নিজস্ব মূলনীতিতে কিছুটা তারতম্য থাকার কারণে এসব ক্ষেত্রে কিছুটা কম-বেশি হয়েছে। (ঘ) এসব ক্ষেত্রে কোনো লিখক বা গবেষক কোনো মুস্তাহাব বা নফল আমলকে সুন্নত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনটা করা দুষনীয়ও নয়।

ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ:

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া।

২. মুখ ভরে বমি হওয়া।

৩. শরীরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত, পুজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।

৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

৫. চিৎ, কাৎ বা হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া।

৭. সালাতে উচ্চ আওয়াজে হাসা।

উল্লেখ্য, ওযূর পরিবর্তে যদি তায়াম্মুম করে থাকে, তবে উল্লেখিত বিষয়সমূহ দ্বারা তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যাবে। এছাড়া তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি পানি ব্যবহারে সক্ষম হলেও তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে।

গোসলের প্রকারভেদ:

গোসল তিন প্রকার। ১. ফরয, ২. সুন্নাত, ৩. মুস্তাহাব

ফরয গোসলের বিবরণ:

যে সব কারণে গোসল ফরয হয়।

১. জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় নারী বা পুরুষের সবেগে ও কামোদ্দীপনার সাথে বীর্যস্খলন হওয়া।

২. বীর্যস্খলন ব্যতীত দুই যৌনাঙ্গের মিলন।

৩. ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তি কাপড়ে বীর্য দেখলে। যদিও স্বপ্নদোষ না হয়। আর স্বপ্নদোষ হলে তো অবশ্যই গোসল ফরয হবে।

৪. মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাবের পর।

৫. সন্তান প্রসবের পর।

সুন্নাত গোসলের বিবরণ:

যে সব কারণে গোসল করা সুন্নাত।

১. জুমার সালাতের জন্য গোসল করা সুন্নাত।

২. দুই ঈদের সালাতের জন্য গোসল করা সুন্নাত।

৩. ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল করা সুন্নাত।

৪. আরাফার ময়দানে সূর্য হেলে যাওয়ার পর হাজ্বী সাহেবদের জন্য গোসল করা সুন্নাত।

মুস্তাহাব গোসলের বিবরণ:

যে সব কারণে গোসল করা মুস্তাহাব।

১. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাতের জন্য করা মুস্তাহাব।

২. সালাতুল ইস্তিসকা অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের জন্য করা মুস্তাহাব।

৩. কখনো কোনো ভয় পেলে গোসল করা মুস্তাহাব।

৪. প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলে গোসল করা মুস্তাহাব।

৫. গুনাহ থেকে তাওবা করলে গোসল করা মুস্তাহাব।

৬. সফর থেকে ফিরে এলে গোসল করা মুস্তাহাব।

৭. মক্কাতে প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

৮. মদীনাতে প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

৯. কুরবানীর দিন সকালে মুজদালিফায় অবস্থানকালে গোসল করা মুস্তাহাব।

১০. তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

১১. মৃতকে গোসল দিলে।

১২. শিঙ্গা লাগানোর পর গোসল করা মুস্তাহাব।

১৩. অজ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞান ফিরে এলে গোসল করা মুস্তাহাব।

১৪. কোনো অমুসলিম পবিত্র অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলেও তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

১৫. গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

গোসলের ফরয তিনটি:

১. ভালো করে কুলি করা।[৪১]

২. নাকের নরম স্থানে পানি পৌছানো।[৪২]

৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।[৪৩]

---

[৪১] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬

[৪২] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬

[৪৩] সূরা মায়িদা, আয়াত-৬

গোসলের সুন্নত পাঁচটি:

১. অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করা।

২. উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

৩. অপবিত্র বের হওয়ার স্থান থেকে অপবিত্রতা দূর করা। শরীরের কোথাও অপবিত্রতা লেগে থাকলে তা ধৌত করা।

৪. সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতিতে ওযূ করা।

৫. সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালা।

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি:

১. পবিত্র হওয়া বা ইবাদত সহীহ হওয়ার নিয়ত করা।

২. পবিত্র মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসাহ করা।

৩. পবিত্র মাটিতে হাত মেরে কনুইসহ উভয় হাত মাসাহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নত পদ্ধতি:

১. তায়াম্মুমের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া।

২. হাতের আঙ্গুল ফাঁক করে দুই হাতের তালু পবিত্র মাটি অথবা মাটি জাতীয় জিনিসের উপর মারবে। যদি হাতে ধূলা বেশি লাগে, তবে দুই হাতের পিঠ পরস্পরে টোকা দিয়ে ধূলা-বালি ঝেড়ে ফেলবে।

৩. দুই হাতের আঙ্গুলের মাথা একত্র করে হাতের তালু এবং আঙ্গুলের পেট দ্বারা কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নীচ পর্যন্ত, উভয় পাশে কান পর্যন্ত একবার মুখমণ্ডল মাসাহ করা।

৪. আবার দুই হাতের তালু মাটি অথবা মাটি জাতীয় জিনিসের উপর মারবে। ধূলা বেশি লাগলে পূর্বের মতো ঝেড়ে ফেলবে।

৫. তারপর ডান হাতের আঙ্গুলের মাথার পিঠ বাম হাতের আঙ্গুলের পেটে রাখবে।

৬. তারপর বাম হাতকে টেনে ডান হাতের কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এরপর বাম হাতের তালু ও বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট ডান হাতের কনুইয়ের উপরের দিক

থেকে এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবে, যাতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পিঠের উপর দিয়ে যায়। অনুরূপভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসাহ করবে।

৭. এক হাতের আঙ্গুলের পেট দ্বারা অন্য হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক দিয়ে খিলাল করবে।

৮. তায়াম্মুম ওযূ এবং গোসলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। একজন অন্যজনকে তায়াম্মুম করিয়ে দিতে পারে। তবে যার তায়াম্মুম সে নিয়ত করতে হবে।

তায়াম্মুম সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্নঃ দূর পাল্লার যানবাহনে চলমান অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেছে কিন্তু অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও চালক বাস থামাচ্ছে না। ওযূও নেই, তবে রাস্তার দুধারে পানি দেখা যাচ্ছে। এ দিক দিয়ে নামাযের ওয়াক্তও শেষ হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় করণীয় কী?

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তি শেষ ওয়াক্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে এবং পরবর্তীতে ওযূ করে নামায পুনরায় পড়ে নিবে।[৪৪]

আযান-ইকামাত ও মসজিদে গমন

আযানের পরিচয়ঃ

আযান আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থঃ ঘোষনা করা, সংবাদ দেওয়া, জানানো ইত্যাদি। এর পারিভাষিক অর্থঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য এবং জুমার সালাতের জন্য ইসলামের নির্ধারীত শব্দসমূহ দ্বারা সালাতের জন্য আহ্বান করা।

[৪৪] রদ্দুল মুহতার, ১/২৩৫; সূত্রঃ সমকালীন জরুরী মাসায়েল পৃ.- ১৩

আযানের সূচনাঃ

আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী রাহি. বলেন আযানের সূচনা সম্পর্কে শরহে নিকায় গ্রন্থে দুটি মত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম মতঃ প্রথম হিজরিতে আযানের সূচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় মতঃ দ্বিতীয় হিজরিতে আযানের সূচনা হয়েছে। তাদের দলিল হলো-

عَنْ اِبْنِ الْمُسَيَّبِ،...... قَبْلَ أَنْ يُّؤْمَرَ بِالْأَذَانِ يُنَادِيْ مُنَادِيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَيَجْتَمِعُ النَّاسُ، فَلَمَّا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلى الْكَعْبَةِ أُمِرَ بِالْأَذَانِ

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাদি. থেকে বর্ণিত, ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আযানের বিধান আসার পূর্বে এরূপ নিয়ম ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، বলে ঘোষনা দিতেন। এ আহ্বান শোনে লোকেরা একত্রিত হতো। কিন্তু যখন কিবলা পরিবর্তন হলো তখন আযান দেওয়ার বিধান দেওয়া হলো।

প্রখ্যাত ফকীহ মাওলানা আবদুল হাই রাহ. আস্সিআয়াহ (السعايه) নামক গ্রন্থে ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, আযানের বিধান পবিত্র মক্কায় হিজরতের পূর্বে দেওয়া হয়েছে। যেমন-

তাবরানীতে উল্লেখ আছে-

اِنَّه لَمَّا اُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ اَوْحَى اللهُ اِلَيْهِ الْاَذَانَ فَنَزَلَ بِهِ فَعَلَّمَه بِلَالًا

মিরাজের রাত্রে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আযান সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ করলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযানের শব্দসমূহ হযরত বিলাল রাদি. কে শিক্ষা দিলেন।

দারা কুতনী নামক গ্রন্থে হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে-

اِنَّ جِبْرِيْلَ اَمَرَ النَّبِىَّ بِالْاَذَانِ حِيْنَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ

যখন সালাত ফরয হলো, তখন হযরত জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আযানের হুকুম দিলেন।

তাবরানী এবং দারা কুতনীর বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল যে, হিজরতের পূর্বে পবিত্র মক্কায় আযানের বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহি. তাবরানী এবং দারা কুতনীতে উল্লেখিত হাদীস দুটিকে সহীহ না হওয়ার দাবি করেছেন।

মাওলানা আবদুশ শাকূর লাখনূবী রাহি. ইলমুল ফিকহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, আযান চালু হওয়ার পূর্বে আযানবিহীন সালাত পড়া হতো। তখন মুসলমানের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। এ জন্য ঘোষনা ছাড়াই জামাতের জন্য একত্রিত হওয়াটা তেমন কঠিন ছিল না। যখন মুসলমানদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং বিভিন্ন শ্রেণির লোক দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল, তখন প্রয়োজন দেখা দিল সালাতের সময় জামাতে সালাত আদায় করার ব্যপারে অবগতি প্রদান করা। যেন নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী বাড়ি হতে জামাতের জন্য মসজিদে একত্রিত হতে পারে। সুতরাং এতে বুঝা গেল যে আযান দ্বিতীয় হিজরিতে আযানের সূচনা হয়েছে।[৪৫]

আযানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

যখন সাহাবিদের সালাত এবং জামাতের সময় জানানোর প্রয়োজন হলো, তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন যে, ইহুদীদের ন্যায় ঘন্টা বাজানো হোক। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন যে, আগুন জ্বালানো হোক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পছন্দ করলেন না। হযরত ওমর রাদি. প্রস্তাব দিলেন যে, সালাতের সময় হলে اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ বলা হোক। এর পরদিন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদি.

৪৫ সূত্র: আশরাফুল হিদায়া

এবং হযরত ওমর রাদি. স্বপ্নে দেখলেন যে, এক সবুজ পোষাক পরিহিত আসমান থেকে একজন ফিরিশতা এসে আযানের নিয়ম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। ঐ নিয়মে সালাতের সময় এবং জামাতের অবগতি প্রদান করা হবে। মোটকথা সকালে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদি. এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থাপন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এ ঘটনা সত্য। হযরত বিলাল রাদি. কে ঐভাবে আযান দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। অত:পর হযরত ওমর রাদি. এসে স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনা করলেন।[৪৬]

একনজরে আযান ও আযানের বাক্যসমূহ আদায় করার নিয়ম:

আযান ও ইকামতের বাক্যসমূহ	আযান ও ইকামতের শব্দ আদায়ের নিয়ম:
اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	اللهُ ও أَكْبَرُ শব্দের শুরুতে যে হামযাহ রয়েছে, তা শক্তভাবে আদায় করতে হবে। আল্লাহ শব্দের লাম খুব মোটা করে পড়তে হবে। লামের উপর যে আলিফ তাতে মাদ্দে তাবায়ী হবে। এতে শুধুমাত্র এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে। হা-এর পেশ খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে হবে। বাংলা হ্রস্বউ-কারের (ু) ন্যায়। আকবার-এর রা সাকিন অথচ মোটা করে পড়তে হবে।
أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	আশহাদু-এর শীন উচ্চারণকালে আওয়ায মুখের ভেতর ছড়িয়ে পড়বে। لَا এর মধ্যে তিন থেকে চার আলিফ পর্যন্ত টানা যাবে। إِلٰهَ শব্দের প্রথম আলিফের মধ্যে কোনো

৪৬ সূত্র: আশরাফুল হিদায়া

	প্রকার লম্বা করা যাবে না। **إِلَّا اللهُ** -এর মধ্যে আল্লাহ শব্দের লামের যে মাদ রয়েছে, তা চার আলিফ পর্যন্ত লম্বা করা জায়েয আছে। এর অতিরিক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	**أَنَّ** শব্দের নূন এবং **مُحَمَّدًا** শব্দের তাশদীদযুক্ত মীমের মধ্যে এক আলিফের অতিরিক্ত গুন্নাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। **رَسُوْلُ** শব্দের শীনের মধ্যে মাদ্দে তাবায়ী। কাজেই এক আলিফের অতিরিক্ত টানা যাবে না। শব্দের রা মোটা হবে। আল্লাহ শব্দের লামে চার আলিফ পর্যন্ত লম্বা করা জায়েয আছে। এর অতিরিক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	**حَيَّ**শব্দের তাশদীদ আদায় করার সময় দুই হরফ পরিমাণ সময় বিলম্ব করতে হবে। অবশ্য ইয়া-ও যবর তাড়াতাড়ি আদায় করতে হবে, এর উপর যেন আওয়ায আটকে না যায়। **الصَّلَاةِ** -এর **ص** খুব মোটা করে পড়তে হবে। **صلوة** এর মধ্যে **مَدِّ عَارِضِيْ** -এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ চার আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যাবে।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	**حَيَّ** শব্দের পড়ার নিয়ম উপরে বর্ণিত হয়েছে। **فَلَاح** এর লাম খুব মোটা করে পড়তে হবে। **الفلاح** এর মধ্যে **مَدِّ عَارِضِيْ** -এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ চার আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যাবে।
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা। (সকল ইকামতের মধ্যে বলতে হবে। কোনো আযানের মধ্যে বলা যাবে না।)	**قَامَتِ** শব্দের ক্বাফ-এর পরে যে আলিফ আছে এতে মাদ্দে তাবয়ী হবে, অর্থাৎ এক আলিফ পরিমাণ লম্বা হবে। **الصَّلَاةُ** শব্দের লামে মাদ্দে আরযী হবে। একে তিন আলিফ লম্বা করার নিয়ম রয়েছে। তবে ইকামতে দ্রুত করা উদ্দেশ্য, তাই অল্প টানতে হবে।
اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা। (শুধু ফজরের আযানে)	**الصَّلَاةُ** -এর লামের পরে যে আলিফ আছে, এতে মাদ্দে তাবয়ী হবে, অর্থাৎ এক আলিফ পরিমাণ লম্বা হবে। এর অতিরিক্ত লম্বা করা বিরত থাকতে হবে। **النَّوْم** এর মধ্যে মাদ্দে লীন। তবে কসর, অর্থাৎ কম লম্বা করা উত্তম। তিন আলিফ লম্বা করাও জায়েয আছে।
اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ শেষ অক্ষর সাকিন করা।	এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আযান ও ইকামতের জবাব:

ইকামতকেও হাদীসে আযান বলা হয়েছে। এ জন্য ইকামত শুনলেও আযানের মতো জবাব দেওয়া উচিত। মুয়াযযিন যা বলবেন শ্রোতারাও তাই বলবেন । তবে হাইয়্যা আলাস সালাহ এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ এর সময় লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলতে হয়। একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মুয়াযযিনের ইকামতের সময় ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ শুনে বলেছিলেন আক্বামাহাল্লাহা ওয়া আদামাহা। বাকী অংশ আযানের নিয়মেই জবাব প্রদান করতে হয়।[৪৭]

আমরা বিষয়টিকে সহজে বুঝার জন্য এবং মনে রাখার সুবিধার্থে ছকের মধ্যে সুন্দর করে উল্লেখ করছি।

ইকামতের বাক্যসমূহ এবং এর উত্তর:

ইকামাত বাক্যসমূহ	আযান ও ইকামাতের উত্তর
اَللهُ أَكْبَرُ ــ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ ــ اَللهُ أَكْبَرُ এই চারটি বাক্য এক শ্বাসে উচ্চারণ করা। প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	اَللهُ أَكْبَرُ ــ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ ــ اَللهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এই দুটি বাক্য এক শ্বাসে উচ্চারণ করা। প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

[৪৭] আবু দাউদ, হাদীস-৫২৭-৫২৮

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ এই দুটি বাক্য এক শ্বাসে উচ্চারণ করা। প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এই দুটি বাক্য এক শ্বাসে উচ্চারণ করা এবং ডান দিকে চেহারা ঘুরানো। প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এই দুটি বাক্য এক শ্বাসে উচ্চারণ করা এবং বাম দিকে চেহারা ঘুরানো। প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ এই দুটি বাক্য এক শ্বাসে উচ্চারণ করা। প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা। (কোনো আযানের মধ্যে বলা যাবে না। বলতে হবে সকল ইকামতের মধ্যে)	اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا
اَللهُ أَكْبَرُ ــ اَللهُ أَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এখানের সবগুলো (প্রথম দুটি বাক্য ও কালিমা) এক শ্বাসে উচ্চারণ করা। প্রত্যেকটির শেষ অক্ষর সাকিন করা।	اَللهُ أَكْبَرُ ــ اَللهُ أَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

আযান ও ইকামতের ফযিলত:

১. আযান সর্বোত্তম কথা:

মহান আল্লাহ বলেন-

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজ করে। আর বলে, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। সুরা ফুসসিলাত/হা-মীম সাজদাহ, আয়াত- ৩৩

আল্লামা বগবী রাহ. বলেছেন, হযরত আয়েশা রাদি. বলেন, এ আয়াত মুয়াজ্জিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইকরামা রাহি. একই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

২. আযান শুনলে শয়তান বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পালায়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে এত দূরে পলায়ন করে যে, সেখান থেকে আযান শুনতে পারে না। যখন আযান শেষ হয় তখন আবার ফিরে আসে। এরপর যখন ইকামত দেওয়া হয়, তখনও সে দূরে চলে যায়। ইকামত শেষ হলে মানুষের মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য আবারও ফিরে আসে। অত:পর (যে সব কথা মানুষ ভুলে গিয়েছিল, সেগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে) এটা স্মরণ করো . . . ওটা স্মরণ করো . . . । এক পর্যায়ে সে সালাতে কত রাকাত পড়েছে তা স্মরণ থাকে না।[৪৮]

[৪৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬০৮

৩. জীব-জন্তু, মানুষ-জ্বীনসহ সবাই মুয়াযযিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ খুদরী রাদি. তাকে বললেন: আমি দেখছি তুমি ছাগল চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালবাস। সুতরাং তুমি যখন ছাগল নিয়ে বনে-জঙ্গলে থাকবে এবং আযান দিবে তখন উচ্চ আওয়াজে আযান দিবে। কেননা জ্বীন, মানুষ এবং সবাই তার (মুয়াযযিনের) জন্য হাশরের মাঠে সাক্ষ্য দিবে। আবু সাঈদ রাদি. বলেন, আমি এক কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি।[৪৯]

৪. মানুষ আযানের ফযিলত জানলে লটারী ব্যতীত আযান হতো না:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি লোকেরা আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারের সালাত আদায় করার সওয়াব সম্পর্কে অবগত হতো, তাহলে তারা এ সওয়াব অর্জন করার জন্য এমনভাবে প্রতিযোগিতা করতো, লটারী ব্যতীত এর কোনো সমাধানই পাওয়া যেতো না। আর যদি তারা জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা কত সওয়াব তাহলে তারা অবশ্যই প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করতো। আর যদি ইশা এবং ফজরের

[৪৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬০৯

সালাত জামাতের সাথে আদায় করার ফযিলত জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে অংশগ্রহণ করত।[৫০]

৫. কিয়ামত দিবসে মুয়াযযিন উচু মর্যাদার অধিকারী হবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

হযরত তালহা ইবনে ইয়াহইয়া রাদি. তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদি.-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় একজন মুয়াযযিন এসে তাকে সালাতের জন্য আহবান করলেন। তখন মুয়াবিয়া রাদি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, মুয়াযযিনগণ কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ আল্লাহর নাম উচ্চ করার দরুন তাদের মর্যাদা উচ্চ হবে।[৫১]

৬. আযান শুনলে শয়তান ৩৬ মাইল দূরে পালিয়ে যায়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ. فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ مِيلاً

হযরত জাবির রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি শয়তান যখন আযান শুনে তখন সে রাওহা নামক স্থানে পালিয়ে যায়। হযরত সুলাইমান বলেন, আমি হযরত জাবির রাদি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাওহা কত দূরে? তিনি বললেন, সেটি মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে।[৫২]

---

[৫০] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬১৫

[৫১] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৭৮

[৫২] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৮০

৭. আযান দিয়ে সালাত আদায় করলে ২৫ গুণ বেশি সওয়াব হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا

আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মুয়াযিনের গুনাহ ঐ পর্যন্ত ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে পর্যন্ত তার আযানের আওয়াজ পৌছে। আর প্রত্যেক প্রাণি এবং নিষ্প্রাণ যারাই আযান শুনবে, তারা সবাই তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। মুয়াযযিনের আযান শুনে যারা সালাত পড়তে আসে তাদের সওয়াব ২৫ গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। এক সালাত থেকে বিগত সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘঠিত সকল ছোট-খাট গুনাহ ক্ষমা করা হয়।[৫৩]

৮. মুয়াযযিনের জন্য ক্ষমা লাভ ও জান্নাতের সুসংবাদ:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

হযরত উকবা ইবনে আমের রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমার প্রভু ঐ ছাগলের রাখালের প্রতি অত্যন্ত খুশী হন, যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় একাকী আযান দিয়ে সালাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ ফিরিশতাদের ডেকে বলেন: তোমরা আমার এই বান্দার দিকে লক্ষ্য করো। সে আযান দিয়ে সালাত আদায় করেছে। সে আমার ভয়ে এমন করেছে। আমি অবশ্যই

---

[৫৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫১৫

আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।[৫৪]

৯. আযান ও ইকামত দিয়ে সালাত পড়লে ফিরিশতা অংশগ্রহণ করেন:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ مَا لَا يَرَى طَرْفَاهُ

হযরত সালামান ফারসী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যদি কোন ব্যক্তি মাঠে থাকে, আর সালাতের সময় হয় তাহলে সে ওযূ করবে। পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করবে। এরপর যখন সে ইকামাত দিয়ে সালাত আদায় করে তার সাথে দুইজন ফিরিশতা সালাত আদায় করেন। আর যদি সে আযান ও ইকামত দিয়ে সালাত আদায় করে তাহলে তার পিছনে আল্লাহর এত বিশাল বাহিনী (ফিরিশতারা) সালাত আদায় করেন, যাদের দুই প্রান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না।[৫৫]

১০. ইখলাসের সাথে সাত বছর আযান দিলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি:

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দিবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেওয়া হবে।[৫৬]

---

[৫৪] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১২০৫

[৫৫] মুসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাক, হাদীস-১৯৫৫

[৫৬] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-২০৬

১১. ইখলাসের সাথে ১২ বছর আযান দিলে ঠিকানা হবে জান্নাত:

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً

হযরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় একাধারে ১২ বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। তার প্রত্যেক আযানের জন্য ৬০ টি বিনিময় এবং ইকামতের জন্যও রয়েছে আরো ৩০ টি বিনিময়।[৫৭]

১. প্রতিদিন পাঁচবার আযান দিলে মেশকের পাহাড়ে স্থান পাবে:

হাদীসে এসেছে-

ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষ মেশকের পাহাড়ের উপর থাকবে। ১. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মনিবের হক আদায় করেছে। ২. যে ব্যক্তি এমনভাবে ইমামতি করেছে যে, তার উপর মুসল্লীরা সন্তুষ্ট। ৩. যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার আযান দিয়েছে।[৫৮]

১৩. আযানের শেষে দুআ কবুল হয়:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি. বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মুয়াযযিনগণ সওয়াব ও বিনিময় হিসেবে আমাদের অগ্রগামী হয়ে আছে। (এমন কোনো আমল আছে নাকি যা দিয়ে আমরাও মুয়াযযিনের ন্যায় ফযিলত অর্জন করতে পারি?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এই

---

[৫৭] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-৭২৮

[৫৮] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস- ১৯৮৬

বাক্যগুলো বলো, যা মুয়াযযিন বলে। অত:পর আযান শেষ হলে দুআ করো, তোমাদের দুআ কবুল করা হবে।[৫৯]

১৪. আযানের পর দুআ পাঠকারীর জন্য রাসূলুল্লাহর সুপারিশঃ

আযানের উত্তর প্রদানের পর যে কোনো দুআ পাঠ করো। হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে দুআ পড়বে তার পক্ষে হাশরের মাঠে সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব।[৬০]

হযরত মোল্লা আলী কারী (রাহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে উক্ত ব্যক্তির ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু লাভের সুসংবাদ রয়েছে।

আযান শুনার পর দুআঃ -১

اللّٰهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দায়ওয়া তিত তা-ম্মাহ, ওয়াছ ছালাতিল ক্বায়িমাহ, আতি মুহাম্মাদা নিল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাযিলাহ, ওয়াব আছহু মাক্বামাম মাহমুদা। আল্লাযী ওয়াত তাহ।

হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসীলা (নৈকট্য) এবং মহা মর্যাদা। তাঁকে উন্নীত করুন সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাঁকে ওয়াদা করেছেন।[৬১]

নোটঃ আযানের দুআর মধ্যে ওয়াদ দারাজাতার রাফিয়া এবং ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ এ দুটি বাক্য সহীহ হাদীসে নেই। বিশেষ করে প্রথম বাক্যটি একেবারেই ভিত্তিহীন। আর দ্বিতীয় বাক্যটি কোনো কোনো দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৬২]

[৫৯] আবু দাউদ

[৬০] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬১৪

[৬১] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬১৪

[৬২] তুহফাতুল আহওয়াযী, খ.-২ পৃ.-২৮৩;

আযান শুনার পর দুআঃ -২

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহ। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্। রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাউ ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসূলাহ ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনা।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভূ হিসেবে, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়েছি।[৬৩]

ফযিলতঃ মুসলিম শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর এই দুআ পড়বে মহান আল্লাহ তায়ালা তার সকল ছগীরা গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন।

আযান ও ইকামতের কিছু বিধানঃ

১. সকল ফরয সালাতের জন্য একবার আযান দেয়া পুরুষের উপর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। সে মুসাফির হোক অথবা মুকিম হোক। জামাতে সালাত আদায় করা হোক বা একাকী আদায় করা হোক। জুমার সালাতের জন্য দ্বিতীয়বার আযান দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

২. যদি এমন কোনো কারণে সালাত কাযা হয়ে যায়, যার মধ্যে সাধারণ লোক শরীক থাকে, তবে সেই কাযা সালাতের জন্য আযান উচ্চস্বরে দিবে। আর যদি বিশেষ কোনো কারণে বা এককভাবে কারো সালাত কাযা হয়ে যায়, তাহলে আযান গোপনে আস্তে দিবে।

৩. যদি কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে যায় এবং সেগুলো সব একত্রে আদায় করতে হয়, তাহলে শুধু প্রথম সালাতের জন্য আযান দেয়া সুন্নাত। অবশিষ্ট সালাতের জন্য পৃথক পৃথক আযান দেয়া মুস্তাহাব।

[৬৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৭৭

৪. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে একাকী অথবা জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করে তার জন্য আযান এবং ইকামত দেয়া উভয়টি মুস্তাহাব; যদি মহল্লা বা গ্রামে মসজিদে আযান ও ইকামত হয়ে থাকে। কারণ মহল্লার আযান বা ইকামত সমস্ত মহল্লাবাসীর জন্য যথেষ্ট।

৫. ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাতের জন্য আযান ও ইকামত বলা সুন্নাত নয়। চাই তা ফরযে কিফায়া সালাত হোক না কেন। যেমন- সালাতুল জানাযা। অথবা ওয়াজিব সালাত হোক, যেমন-বিতর ও দুই ঈদের সালাত। অথবা তা নফল সালাত হোক।

৬. সালাতুল জুমুআর প্রথম আযান শুনামাত্র সমস্ত কাজ-কর্ম ত্যাগ করে সালাতুল জুমুআর প্রস্তুতি নেয়া এবং মসজিদে গমন করা ওয়াজিব। ক্রয়-বিক্রয় অথবা অন্য কোনো কাজ-কর্মে লিপ্ত হওয়া হারাম।[৬৪]

৭. মুয়াযযিন পুরুষ হওয়া। মহিলাদের আযান দেয়া মাকরূহে তাহরীমি। কোনো মহিলা আযান দিলে তা পুনরায় আবার আযান দেয়া মুস্তাহাব।

সালাতে (নামাযে) যাওয়ার সময় এই দুআ পড়াঃ

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا اللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا

আল্লাহুম্মাজ য়াল ফী ক্বালবী নূরা, ওয়াফী লিছানী নূরা, ওয়াজ আল ফী ছাময়ী নূরা, ওয়াজ আল ফী বাছারী নূরা, ওয়াজ আল মিন খালফী নূরা, ওয়া মিন আমামী নূরা, ওয়াজ আল মিন ফাওক্বী নূরা, ওয়া মিন তাহতী নূরা, আল্লাহুম্মা আ'অত্বিনী নূরা।

হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে, আমার জিহবাতে, আমার কানে, আমার চোখে, আমার সামনে-পিছনে, আমার উপরে-নীচে নূর প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর প্রদান করুন।[৬৫]

[৬৪] রদ্দুল মুহতার

[৬৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮৩৫

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠলেন। মিসওয়াক করলেন এবং ওযূ শেষ করে সূরা আলে ইমরানের ১৯৪ নং আয়াত থেকে সূরার শেষ অর্থাৎ ২০০ নং আয়াত পর্যন্ত পড়লেন। তারপর তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এতে কিয়াম-কিরাত, রুকু, সাজদাহ দীর্ঘ করলেন। সালাত শেষ করে তিনি শুইলেন। নাক ডাকালেন। পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবারে মোট ছয় রাকাত সালাত আদায় করলেন। প্রত্যেক সালাতের শুরুতে তিনি মিসওয়াক করতেন এবং ওযূ করতেন। আর সূরা আলে ইমরানের ঐ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন। যখন মুয়াযযিন আযান দিলেন তখন তিনি সালাতের জন্য বের হয়ে উল্লেখিত দুআটি পড়লেন।[৬৬]

সালাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

যার মাঝে একসাথে তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে, তার উপর সালাত ফরয হবে। যার মাঝে একসাথে তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে না, তার উপর সালাত ফরয হবে না। শর্ত তিনটি হচ্ছে এই-

১. মুসলিম হওয়া। অতএব অমুসলিমের উপর সালাত ফরয নয়।

২. সাবালক হওয়া। অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২/১৩ বৎসর হওয়া, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০/১১ বৎসর হওয়া। সুতরাং বালেগ হওয়ার আগে সালাত ফরয নয়। তবে ছোটদেরকে সাত বছরের সময় থেকেই তাদেরকে সালাতের আদেশ করতে হবে। যখন তারা ১০ বছরে উপনীত হবে তখন অবশ্যই সালাত পড়তে বাধ্য করতে হবে। সালাত না পড়লে শাসন করতে হবে। যেন সালাত ফরয হওয়ার পূর্ব থেকেই তারা সময় মতো সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব রাদি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

[৬৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮৩৫

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের আদেশ কর তারা সাত বছর বয়সে উপনীত হলে। তাদেরকে শাসন কর তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হলে। তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।[৬৭]

৩. আকল বা জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। অতএব অজ্ঞান, পাগলের উপর সালাত ফরয নয়।

সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের বিবরণ

এখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা মূল সালাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা আবশ্যক। যদি ঐ বিষয় সমূহের কোন একটি ছুটে যায় তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে না। ঐ সব বিষয়কে সালাতের শর্ত বলে অভিহিত করা হয়। আর তা হচ্ছে সাতটি।

১. শরীর পবিত্র হওয়া:

সালাত আদায়কারী ব্যক্তির শরীর পবিত্র হওয়া।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে পুরো দেহ পবিত্র করো।[৬৮]

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

তোমাদের কেউ ওযূ নষ্ট করলে পুনরায় ওযূ করার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের সালাত হবে না।[৬৯]

---

[৬৭] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস- ৪৯৫

[৬৮] সূরা মায়িদা, আয়াত- ৬

[৬৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৫৫৯

২. কাপড় পবিত্র হওয়া:

সালাত আদায়কারী ব্যক্তির কাপড় পবিত্র হওয়া।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)

আপনার কাপড় পবিত্র করুন।[৭০]

৩. সালাতের স্থান পবিত্র হওয়া:

অর্থাৎ যে স্থানে সালাত পড়া হবে সে স্থানটি পবিত্র হওয়া। আর স্থান পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে দুই পা, দুই হাত ও দুই হাটু এবং কপাল রাখার স্থান পবিত্র হওয়া অত্যাবশ্যক।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥)

আমি ইবরাহীম এবং ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।[৭১]

৪. সতর ঢাকা:

অতএব, সতর ঢাকা সম্ভব হলে যদি সতর না ঢাকে তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে না। সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সতর ঢাকা আবশ্যক। সালাতের মাঝখানে এক রুকন আদায় করার সময় পর্যন্ত শরীরের কোনো অঙ্গের এক চতুর্থাংশ খুলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় এমন পোশাক পরিধান করো যাতে তোমাদের সতর ঢেকে থাকে।[৭২]

---

[৭০] সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত- ৪

[৭১] সূরা বাকারা, আয়াত- ১২৫

পুরুষের সতরের পরিমাণঃ

পুরুষের সতরের পরিমাণ হচ্ছে, নাভীর নীচ থেকে হাটুর নীচ পর্যন্ত। সুতরাং হাটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। তবে নাভী সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়।

হাদীসে এসেছে-

فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

পুরুষের নাভীর নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতরের অন্তর্ভূক্ত।[৭৩]

নারীদের সতরের পরিমাণঃ

নারীদের সতরের পরিমাণ হচ্ছে, মুখমন্ডল, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পা ব্যতীত সমস্ত শরীর সতরের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং ঢেকে রাখা ফরয।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।[৭৪]

হাদীসে এসেছে-

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

মহিলাদের পুরো দেহ সতরের অন্তর্ভূক্ত।[৭৫]

নোটঃ তিরমিযির হাদীসে মহিলাদের পুরো দেহ সতরের অন্তর্ভূক্ত বলা হয়েছে। তবে উপরের আয়াতটিতে সাধারণত যা প্রকাশমান এর ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য হাদীস থেকে মহিলাদের মুখমন্ডল, উভয় পা এবং হাতের তালুকে সতর থেকে বাইরে রাখা হয়েছে।

৫. কিবলামুখী হওয়াঃ

অতএব কিবলামুখী হওয়া সম্ভব হওয়ার পরও যদি কিবলামুখী হওয়া ছাড়া সালাত আদায় করা হয় তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে না। যে ব্যক্তি মক্কা

[৭২] সূরা আরাফ, আয়াত- ৩১

[৭৩] মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ৬৭৫৬

[৭৪] সূরা নূর, আয়াত- ৩১

[৭৫] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-১১৭৩

অবস্থান করেন এবং বাইতুল্লাহ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম, তার জন্য মূল বাইতুল্লাহ-ই হলো কিবলা। আর যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নন, তার জন্য বাইতুল্লাহর দিকই কিবলা।

যে ব্যক্তি রোগ বা শত্রুর আশংকায় কিবলামুখী না হতে পারবে সে ব্যক্তির জন্য যেদিকে সুযোগ হয়, সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা জায়েয আছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

আর তোমরা যেখান থেকেই (সফরের জন্য) বের হও, (সালাতের সময়) নিজেদের মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও।[৭৬]

৬. সালাতের সময় হওয়াঃ

অতএব সালাতের সময় আসার পূর্বে সালাত আদায় করা শুদ্ধ নয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।[৭৭]

৭. নিয়ত করাঃ

অতএব নিয়ত করা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হবে না।

হাদীসে এসেছে-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

মানুষের সমস্ত ভালো কাজের ফলাফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষ তাই পাবে যা সি নিয়ত করে।[৭৮]

[৭৬] সূরা বাকারা, আয়াত- ১৪৯

[৭৭] সূরা নিসা, আয়াত- ১০৩

[৭৮] সহীহ বুখারী, হাদীস- ১

সালাত যদি ফরয হয় তাহলে নিয়তের ক্ষেত্রে সেটা কোন সালাত তা নির্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক। যেমন যোহরের সময় যোহরের সালাতের নিয়ত করা। আসরের সময় আসরের সালাতের নিয়ত করা।

আর সালাত যদি ওয়াজিব হয়, তাহলেও নিয়তের ক্ষেত্রে সেটা কোন সালাত তা নির্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক। যেমন, বিতরের সালাত আদায় করার সময় বিতরের ওয়াজিব সালাতের নিয়ত করা। ঈদের সালাত আদায় করার সময় ঈদের ওয়াজিব সালাতের নিয়ত করা।

তবে যদি সালাত নফল হয়, তাহলে তা কোন সালাত আদায় করা হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক নয়। বরং শুধু সালাতের নিয়ত করলেই চলবে।

আর যদি কেউ ইমামের পিছনে মুক্তাদি হয়ে সালাত আদায় করে তাহলে ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা আবশ্যক।

নিয়ত করতে হবে তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে। তাকবীরে তাহরীমার পরে নিয়ত করলে চলবে না।

সালাতের নিয়ত

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! কোনো সালাতের জন্য আরবিতে, বাংলাতে কিংবা অন্য কোনো ভাষাতে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত জরুরী নয়। কারণ, নিয়ত হলো মনের ইচ্ছা, সংকল্প, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। সুতরাং কোনো সালাতের জন্য নিয়ত করার অর্থ হলো সেই সালাতের নাম এবং রাকাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

আমাদের বাংলাদেশে ছোট-ছোট কিছু অগ্রহণযোগ বই পুস্তকে সালাতের আরবি নিয়তের কথা পাওয়া যায়। সে সব কথা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কারণ, হাদীসে এভাবে নিয়ত করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এছাড়া যারা আরবি না জানেন তারা আরবিতে নিয়ত করতে গিয়ে অনেক সময় ভুল বলেন। রাকাতের ক্ষেত্রে দুয়ের পরিবর্তে চার বলে ফেলেন। আবার কখনও ফরযের ক্ষেত্রে সুন্নত বা নফল বলে ফেলেন।

কিছু মানুষ এমনও আছে যারা আরবি নিয়ত না জানার ভয়ে মসজিদে যায় না। সুতরাং এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে সহজে সালাতের নাম এবং রাকাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সালাত শুরু করবেন।

আমরা যে সব সালাতের আলোচনা করব, সে সব সালাতের কোথাও নিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করব না।

সালাতের ফরযসমূহের বিবরণ

এখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা মূল সালাতের অন্তর্ভুক্ত। সালাত আদায় হওয়ার জন্য তা আবশ্যক। যদি ঐ বিষয় সমূহের কোন একটি ছুটে যায় তাহলে সালাত আদায় হবে না। ঐ সব বিষয়কে সালাতের ফরয বলে অভিহিত করা হয়। আর তা হচ্ছে ছয়টি।

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা:

যেমন, আল্লাহু আকবার শব্দ দিয়ে সালাত শুরু করা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ()

আপনি আপনার রবের মাহাত্ম্য ঘোষনা করুন।[৭৯]

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ()

আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন। সালাত আদায করুন।[৮০]

নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার মাঝখানে এমন কাজ করবে না, যা সালাতের পরিপন্থী। যেমন খাওয়া, পান করা বা অন্য কোনো কথা বলা ইত্যাদি। তাকবীরে তাহরীমা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো এমন আওয়াজে বলতে হবে যেন তা নিজে শুনতে পারে।

তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কিছুই পড়তেন না। এমনকি মুখে নিয়্যতও উচ্চারণ করতেন না।[৮১]

---

[৭৯] সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত- ৩

[৮০] সূরা আলা, আয়াত- ১৫

২. দাঁড়িয়ে সালাত পড়াঃ

অকারণে বসে সালাত আদায় করলে তা আদায় হবে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

(وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)

মহান আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।[৮২]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অশ্বরোগ ছিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাত (আদায় করার পদ্ধতি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে সালাত পড়বে। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে বসে সালাত আদায় পড়ো। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে হেলান দিয়ে সালাত পড়ো।[৮৩]

৩. কিরাআত পড়াঃ

সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা। কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ ততটুকু পড়ো।[৮৪]

হাদীসে এসেছে-

[৮১] যাদুল মায়াদ

[৮২] সূরা বাকারা, আয়াত- ২৩৮

[৮৩] সহীহ বুখারী, হাদীস- ১১১৭

[৮৪] সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত- ২০

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

কিরাআত (কুরআন থেকে পড়া) ছাড়া সালাত হবে না।[৮৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাআত ছিল টানা টানা। তিনি প্রতিটি আয়াত পাঠ করে থামতেন। আয়াত শেষ করার সময় একটু টানা আওয়াজে শেষ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় প্রথম রাকাতের কিরাত দীর্ঘ করতেন। ফজরের সালাতসহ প্রত্যেক সালাতেই এমনটা করতেন। কখনো কখনো প্রথম রাকাতকে এতো দীর্ঘ করতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকদের মসজিদে আসার আওয়াজ শোনা যেত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিরাত দীর্ঘ করে পড়তেন।[৮৬]

৪. রুকু করাঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)

তোমরা রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর।[৮৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকুতে গিয়ে এতো দীর্ঘ সময় থাকতেন যে প্রায় দশবার তাসবীহ পড়া যেতো। সাজদাতেও তিনি এই পরিমান সময়ই তাসবীহ পড়তেন।

৫. দুই সাজদাহ করাঃ

প্রত্যেক রাকআতে দুই সাজদা করা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু কর এবং সাজদাহ কর।[৮৮]

[৮৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৯০৮

[৮৬] যাদুল মায়াদ

[৮৭] সূরা বাকারা, আয়াত- ৪৩

[৮৮] সূরা হজ্জ, আয়াত- ৭৭

৬. শেষ বৈঠক করা:

সালাতে তাশাহহুদ পড়ার পরিমাণ সময় দেরী করা।

হাদীসে এসেছে-

إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاتَكَ

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. এর হাত ধরে তাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিলেন। তারপর বললেন, যখন তুমি এটি (তাশাহুদ) পড়বে অথবা এমন করবে তাহলে তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে।[৮৯]

শৈষ বৈঠক করার দ্বারা সালাত শেষ হওয়ার বিষয়টি অন্যান্য হাদীসেও উল্লেখ হয়েছে। তবে সেই হাদীসের মধ্যে সামান্য শব্দগত ব্যবধান রয়েছে। বিস্তারীত জানার জন্য।[৯০]

সালাতের ওয়াজিব সমূহের বিবরণ

১. সূরা ফাতিহা পড়া:

ফরজের প্রথম দুই রাকআতে এবং বিতর ও নফল সালাতের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করা।

হাদীসে এসেছে-

مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ছাড়াই সালাত আদায় করল তা ক্রুটিপূর্ণ। তা ক্রুটিপূর্ণ। তা ক্রুটিপূর্ণ। অপূর্ণাঙ্গ।[৯১]

---

[৮৯] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস- ৯৭২

[৯০] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস- ৪০৮; মুসান্নাফে আবী শাইবা, হাদীস- ৮৭১২; সুনানুল কতবুওা, হাদীস- ২৯৩৮

[৯১] সহীহ মুসলিম, ৯০৪; সুনানু আবু দাউদ, হাদীস- ৮২১

নোট: প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত হাদীসে একটু লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় যে, সালাতের মধ্যে যদি সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হতো তাহলে উল্লেখিত হাদীসে তা ক্রুটিপূর্ণ এবং অপূর্ণাঙ্গ বলা হতো না। বরং বলা হতো তা বাতিল। অতএব বিভিন্ন হাদীসের আলোকে স্পষ্ট হল যে সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয় বরং তা ওয়াজিব।

২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য কোনো সূরা মিলানো:

ফরজের প্রথম দুই রাকআতে এবং বিতর ও নফল সালাতের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা বা বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত করা।

হাদীসে এসেছে-

أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

(হযরত আবু সাঈদ রাদি. বলেন:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সূরা ফাতিহার সাথে যতটুকু সম্ভব পড়ার জন্য আদেশ করেছেন।[৯২]

৩. তাদিলে আরকান বা প্রতিটি রুকনকে প্রশান্তভাবে আদায় করা:

সালাতের মধ্যে কিয়াম, কিরাআত, রুকু এবং সাজদাসহ প্রতিটি আহকাম প্রশান্তভাবে আদায় করা।

দীর্ঘ হাদীসে বলা হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .... ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন একজন সাহাবি এসে সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি আবার সালাত আদায়

---

[৯২] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস- ৮১৮

করো। তুমি তো সালাত আদায় কর নি। তিনি ফিরে গিয়ে আগের মতো আবার সালাত আদায় করলেন। তারপর এসে সালাম করলেন। তিনি আবারও তাকে বললেন, তুমি সালাত আদায় কর। তুমি তো সালাত আদায় কর নি। তাকে এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকুতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু আদায় করবে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ করবে। তারপর সাজদাহ থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই পূর্ণ সালাত শেষ করবে।[৯৩]

৪. সালাতের রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখাঃ

সালাতের মধ্যে কিয়াম, কিরাআত, রুকু এবং সাজদাসহ প্রতিটি আহকাম ধারাবাহিকভাবে আদায় করা।[৯৪]

৫. প্রথম বৈঠক করাঃ

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ

তিনি বলতেনঃ প্রত্যেক দুই রাকাতের পর বৈঠক রয়েছে।[৯৫]

৬. উভয় বৈঠকে তাশাহুদ (আত্তাহিয়াতু) পড়াঃ

হযরত ওমর রাদি. বলেনঃ

لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ

কোনো সালাত আদায় হবে না তাশাহুদ পাঠ করা ব্যতীত।[৯৬]

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আতা রাহি. বলেনঃ

[৯৩] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৭৫৭
[৯৪] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৭৫৭
[৯৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১১৩৮
[৯৬] আস-সুনানুল কতবুওা, হাদীস- ২৯৩৮

لَا صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَلَا تَطَوُّعٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ

ফরয এবং নফল কোনো সালাত হবে না তাশাহুদ ছাড়া।[৯৭]

৭. জোরে এবং আস্তে পড়াঃ

ইমামের জন্য যোহর, আছর এবং দিনের বেলার সুন্নাত ও নফল সালাতে আস্তে কিরাআত পড়া। আর মাগরিব ও ইশার সালাতের প্রথম দুই রাকআতে, ফজর, জুমুআ, দুই ঈদ, তারাবী ও রমযান মাসে বিতর সালাতে জোরে কিরাআত পড়া। একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে জোরেও পড়তে পারে আবার ইচ্ছা করলে আস্তেও পড়তে পারে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

আবু মায়মার রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা হযরত খাব্বাবকে রাদি. জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর এবং আসরের সালাতে কিরাত পড়তেন নাকি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কীভাবে জানলেন? তিনি বললেনঃ তাঁর দাঁড়ি নড়াচড়ার মাধ্যমে।[৯৮]

৮. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করাঃ

দুই দিকে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে সালাত শেষ করা।

হযরত আলী রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা। তাহরিমা হলো তাকবীর বা আল্লাহু আকবার বলা। সালাত শেষ হবে সালামের দ্বারা।[৯৯]

[৯৭] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস- ৩০৭৯
[৯৮] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৭৪৬; ৭৬০; ৭৬১ এবং ৭৭৭
[৯৯] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস- ৬১ এবং ৬১৮

৯. দুআয়ে কুনূত পড়াঃ

বিতরের সালাতের তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়ার পর দুআয়ে কুনূত পড়া।

হযরত উবাই ইবনে কাব রাদি. বলেন-

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতর পড়তেন। তিনি রুকুর আগে কুনূত পড়তেন।[১০০]

সাহাবি হযরত আল-কামা রাদি. বলেন-

اَنَّ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِيْ الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিগণ বিতর সালাতে রুকুর আগে দুআয়ে কুনূত পড়তেন।[১০১]

বিস্তারীতঃ সালাতুল বিতরের আলোচনায় দ্র.

১০. সূরা ফাতিহাকে অন্য সূরার পূর্বে পড়া।

১১. দ্বিতীয় সাজদাকে প্রথম সাজদার পর বিলম্ব না করে আদায় করা।

১২. রুকু, সাজদাতে কমপক্ষে এক তাসবীহ্ পরিমাণ দেরি করা।

১৩. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

১৪. দুই সাজদাহর মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

১৫. প্রথম বৈঠকের তাশাহহুদ পড়ে বিলম্ব না করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া।

১৬. দুই ঈদের সালাতে প্রত্যেক রাকআতে তিনটি করে মোট ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর বলা।

১৭. দুই ঈদের সালাতে দ্বিতীয় রাকআতে রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা।[১০২]

[১০০] ইবনে মাযাহ, হাদীস-১১৮২

[১০১] মুসান্নাফু ইবনে আবী শাইবা, হাদীস-৬৯১১

১৮. প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।

১৯. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।

নোটঃ প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! আপনাদের অবগতির জন্য আমরা এখানে একটি সংশয়ের নিরসন করছি। আর তা হলো, আপনারা হয়তো কোনো কোনো কিতাবে সালাতের ওয়াজিব আরও কম-বেশি দেখেছেন বা দেখে থাকবেন। তখন স্বাভাবিক একটা সংশয় দেখা দিতে পারে যে, কোথাও সালাতের ওয়াজিব কম উল্লেখিত হয়েছে। আবার কোথাও বেশি উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ কী? যারা বেশি উল্লেখ করেছেন, তারা কি হাদীসের নামে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে বেশি ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করেছেন? নাকি যারা ওয়াজিবগুলোকে কম উল্লেখ করেছেন, তারা হাদীস সম্পর্কে কম জানেন?

আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন তাহলে এই সংশয়ের নিরসন খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। এই সংশয়ের নিরসন হলো, (ক) যারা কম ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা ওয়াজিবের কথাগুলোকে এমনভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কম কথার মধ্যেই বেশি ওয়াজিবের কথা আলোচিত হয়েছে। (খ) যারা বেশি ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা পাঠকের প্রতি লক্ষ্য করে আলোচনাকে একটু বিস্তারীত করতে গিয়ে ওয়াজিবের কথাগুলোকে ভাগভাগ করে আলোচনা করেছেন। ফলে তাদের হিসেবে ওয়াজিবের সংখ্যা বেশি হয়েছে। (গ) কম-বেশি হওয়ার এটিও একটি কারণ যে, মুজতাহিদ ইমাম (হাদীসের উচ্চঃস্তরের গবেষক) যারা ছিলেন তাদের নিজস্ব মূলনীতিতে কিছুটা তারতম্য থাকার কারণে এসব ক্ষেত্রে কিছুটা কম-বেশি হয়েছে।

সালাতের সুন্নাত সমূহের বিবরণ

সালাতের মধ্যে সুন্নতের সংখ্যা নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাব 'আদ-দুররুল মুখতার' এর ৪৭৩ নং পৃষ্ঠার মধ্যে সালাতের ২৩ টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ পাঠকের

[১০২] আল-ফিকহুল মুয়াসসার

সুবির্ধাতে সালাতের সুন্নত এবং মুস্তাহাবকে এখানে একসাথে আলোচনা করা হয়েছে। এতে সুন্নত এবং মুস্তাহাবের সংখ্যা বেড়ে যায়। সহজে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে সালাতের সুন্নত শিরোনামে মুস্তাহাবকেও অন্তর্ভুক্ত করে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির পরবর্তী সংস্করণে এগুলোকে আলাদা করে এবং দলিল সহকারে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। মহান আল্লাহ তাওফিক দান করুন।

সালাতের মধ্যে ৫১টি সুন্নাত রয়েছে। যেমন-

দাঁড়ানোর মধ্যে	১১ টি
কিরাআতের মধ্যে	৭ টি
রুকুর মধ্যে	৮ টি
সাজদার মধ্যে	১২ টি
বৈঠকের মধ্যে	১৩টি
মোট:	৫১ টি

দাঁড়ানো অবস্থার সুন্নাত ১১টি:

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো। অর্থাৎ মাথা না ঝুঁকানো।

২. পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলার দিকে রাখা। দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা মুস্তাহাব।

৩. তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে পুরুষদের উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। মহিলাদের উভয় হাত কাঁধ

৪. মুক্তাদির তাকবীরে তাহরীমা ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পরক্ষণেই হওয়া।

৫. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতের তালু কিবলার দিকে রাখা।

৬. হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখা।

৭. ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখা।

৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনি আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কব্জি পেঁচিয়ে ধরা।

৯. মধ্যের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর বিছিয়ে রাখা।

১০. নাভির নিচে হাত বাধাঁ।

১১. ছানা পড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার পর সালাতের শুরুতে এই দুআ (ছানা) পড়তেন-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রা কাছমুকা, ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুক।

হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষনা করছি, আপনারই প্রশংসা। অনেক বরকতময় আপনার নাম। সুউচ্চ আপনার মর্যাদা। কোনো মাবুদ নেই আপনি ছাড়া।[১০৩]

কিরাআতের সুন্নাত ৭টি:

১. তাআওউয, অর্থাৎ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া। তবে মুক্তাদী পড়বে না।

২. তাসমিয়া অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ পড়া। তবে মুক্তাদী পড়বে না।

৩. সূরা ফাতিহা পড়ার পর আস্তে আমীন বলা।

৪. ফজর ও যোহরে তিওয়ালে মুফাসসাল পড়া, অর্থাৎ সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত সূরা সমূহ থেকে পড়া । আসর ও ইশার সালাতে আওসাতে মুফাসসাল পড়া, অর্থাৎ সূরা তারিক থেকে সূরা বায়্যিনাহ পর্যন্ত সূরা সমূহ থেকে পড়া। মাগরীবের সালাতে কিসারে মুফাসসাল পড়া, অর্থাৎ সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরা সমূহ থেকে পড়া। তবে যোহরের সালাতে আওসাতে মুফাসসাল পড়ারও অনুমতি আছে।

৫. ফজরের প্রথম রাকাতকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা লম্বা করা।

৬. কিরাআত অতি ধীরে বা অতি দ্রুত গতিতে না পড়া।

৭. ফরয সালাতের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া।

---

[১০৩] আবু দাউদ, হাদীস-৭৭৬

রুকুর সুন্নাত ৮টি:

১. রুকুতে যাওয়ার সময়   বলা।

২. রুকুতে উভয় হাত দ্বারা হাঁটুকে শক্ত করে ধরা।

৩. হাঁটু ধরতে হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর ফাঁক রেখে ধরা।

৪. পায়ের গোছা সোজা রাখা।

৫. উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাকা না করা।

৬. রুকু অবস্থায় মাথা, পিঠ ও কোমর বিছিয়ে এক বরাবর করে রাখা।

৭. রুকুর মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া।

৮. রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (ছামিয়াল্লা হুলিমান হামিদাহ) বলবে। মুক্তাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল হামদ্) বলবে এবং একা সালাত আদায়কারী উভয়টি বলবে। رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ বলা মুস্তাহাব।[১০৪]

সাজদার সুন্নাত ১২টি:

১. তাকবীর বলতে বলতে সাজদাতে যাওয়া।

২. সাজদাতে যাওয়ার সময় জমিনের উপর প্রথমে দুই হাঁটু রাখা।

৩. অত:পর উভয় হাত রাখা।

৪. অত:পর নাক বৃদ্ধাঙ্গুল বরাবর রাখা।

৫. অত:পর কপাল রাখা।

৬. দুই হাতের মাঝখানে সাজদা করা।

৭. সাজদা অবস্থায় রান থেকে পেট পৃথক রাখা।

৮. বাজুকে বগল থেকে পৃথক রাখা।

৯. উভয় হাত কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত জমিনের উপর বিছিয়ে রাখা।

[১০৪] সহীহ বুখারী, হাদীস-৭৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৮৫

১০. সাজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পড়া।

১১. সাজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলা।

১২. সাজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত, তারপর হাঁটু উঠানো এবং দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা।

বসার সুন্নাত ১৩টি:

১. বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা, ডান পা খাড়া রাখা এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে রাখা।

২. উভয় হাত রানের উপর রাখা। আঙ্গুলের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।

৩. আত্তাহিয়্যাতু-এর মধ্যে আশহাদু আল্লা-বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকৃতি বানিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করা এবং ইল্লাল্লাহু বলার সময় আঙ্গুল ঝুকিয়ে দেয়া, ইশারা শেষ করে গোলাকৃতি সালাতের শেষ পর্যন্ত বাকি রাখা।

৪. শেষ বৈঠকে দুরূদ পড়া।

৫. দুরূদের পর দুআয়ে মাছুরা পড়া।

৬. দুই দিকে সালাম ফিরানো।

৭. প্রথমে ডান দিকে সালাম ফিরানো।

৮. সালামের সময় ইমামের জন্য মুক্তাদী, ফিরিশতা এবং নেক জ্বীন্নাতের নিয়্যত করা।

৯. সালামের সময় মুক্তাদীদের জন্য ইমাম, ফিরিশতা ও নেক জ্বীন্নাত এবং ডান ও বামের মুক্তাদীদের নিয়্যত করা।

১০. একা সালাত আদায়কারীদের জন্য কেবল ফিরিশতাদের নিয়্যত করা।

১১. মুক্তাদীগণও ইমামের সাথেই সালাম ফিরানো।

১২. প্রথম সালামের আওয়াজ দ্বিতীয় সালামের আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ করা।

১৩. মাসবূক ব্যক্তির অবশিষ্ট সালাত আদায় করার জন্য ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানোর শেষ করার অপেক্ষা করা।

নোটঃ প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! আপনাদের অবগতির জন্য আমরা এখানে একটি সংশয়ের নিরসন করছি। আর তা হলো, আপনারা হয়তো কোনো কোনো কিতাবে সালাতের সুন্নত আরও কম-বেশি দেখেছেন বা দেখে থাকবেন। তখন স্বাভাবিক একটা সংশয় দেখা দিতে পারে যে, কোথাও সালাতের সুন্নত কম উল্লেখিত হয়েছে। আবার কোথাও বেশি উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ কী? যারা বেশি উল্লেখ করেছেন, তারা কি হাদীসের নামে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে বেশি সুন্নাতের কথা উল্লেখ করেছেন? নাকি যারা সুন্নতগুলোকে কম উল্লেখ করেছেন, তারা হাদীস সম্পর্কে কম জানেন?

আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন তাহলে এই সংশয়ের নিরসন খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। এই সংশয়ের নিরসন হলো, (ক) যারা কম সুন্নতের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা সুন্নতের কথাগুলোকে এমনভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কম কথার মধ্যেই বেশি সুন্নতের কথা আলোচিত হয়েছে। যে কম কথাকে একটু ব্যাখ্যা করলে আরও কিছু সুন্নতের কথা পাওয়া যাবে। (খ) যারা বেশি সুন্নতের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা পাঠকের প্রতি লক্ষ্য করে আলোচনাকে একটু বিস্তারীত করতে গিয়ে সুন্নতের কথাগুলোকে ভাগভাগ করে আলোচনা করেছেন। ফলে তাদের হিসেবে সুন্নতের সংখ্যা বেশি হয়েছে। (গ) কম-বেশি হওয়ার এটিও একটি কারণ যে, মুজতাহিদ ইমাম (হাদীসের উচ্চঃস্তরের গবেষক) যারা ছিলেন তাদের নিজস্ব মূলনীতিতে কিছুটা তারতম্য থাকার কারণে এসব ক্ষেত্রে কিছুটা কম-বেশি হয়েছে। (ঘ) এসব ক্ষেত্রে কোনো লিখক বা গবেষক কোনো মুস্তাহাব বা নফল আমলকে সুন্নত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনটা করা দুষনীয়ও নয়।

পুরুষ ও মহিলাদের সালাতের পার্থক্য

পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের মধ্যে মৌলিক তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে পাঁচটি স্থানে পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্যের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে পুরুষ এবং মহিলাদের

সালাতের মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য হওয়ার দাবী রাখে। আমরা প্রথমে পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করব। তারপর সেই পার্থক্যকে কেন্দ্র করে সালাতের অন্যান্য আলোচনা করব।

১. হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পার্থক্যঃ

হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, পুরুষের মতো কান পর্যন্ত উঠাবে না। মহিলারা তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। (কান পর্যন্ত উঠাবে না।)

হযরত আতা রাহি. বলেনঃ

لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ

‘মহিলারা পুরুষের মতো হাত উঠাবে না।’[১০৫]

মহিলারা পুরুষের মতো হাত উঠাবে না। তাহলে কীভাবে হাত উঠাবে? এই জবাব রয়েছে অন্য হাদীসের মধ্যে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَائِلَ بْنِ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا

‘ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ হে হুজর! যখন তুমি সালাত পড়বে তখন তোমার হাতকে কান বরাবর উঠাবে। আর মহিলা তার হাতকে কাঁধ বরাবর উঠাবে।’[১০৬]

প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যুহরী রাহি. বলেনঃ

تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا

‘মহিলা তার হাতকে কাঁধ বরাবর উঠাবে।’[১০৭]

---

[১০৫] মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ২৪৮৯

[১০৬] আল-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস- ২৮

[১০৭] মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস- ২৪৭২

২. সাজদার ক্ষেত্রে পার্থক্য:

সাজদার সময় মহিলারা হাতকে জমিনের সাথে এবং পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা সাজদার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো নয়।

সাজদার ক্ষেত্রে মহিলারা হাতকে জমিনে সাথে মিলিয়ে রাখবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ

হযরত ইয়াযিদ ইবনে হাবিব রাদি. বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেন: যখন তোমরা সাজদা করবে তখন হাতকে জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা সাজদার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো নয়। (হাদীসটি মুরসাল। আমলযোগ্য। হাদীসটিকে অগ্রহণযোগ্য বলার কোনো সুযোগ নেই)।[১০৮]

সাজদার মধ্যে মহিলারা পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . . . وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: يَا مَلاَئِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: . . . যখন মহিলারা সাজদা করবে তখন পেটকে উরুর সাথে একেবারে মিলিয়ে রাখবে। এটা তার সতরের জন্য বেশি উপযুক্ত। মহান আল্লাহ তাকে দেখেন এবং ফিরিশতাদেরকে বলেন: হে আমার ফিরিশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।'[১০৯]

[১০৮] আস-সুনানুল কতবুওা, হাদীস-৩৩২৫

[১০৯] আস-সুনানুল কতবুওা, হাদীস-৩৩২৪

৩. বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য:

বৈঠকের মধ্যে মহিলারা ডান উরুকে বাম উরুর উপর রাখবে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الأُخْرَى: . . . . . . كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: يَا مَلاَئِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: মহিলারা যখন সালাতের মধ্যে বসবে তখন তার (ডান) উরুকে অপর উরুর উপর রাখবে। . . . . . এটা তার সতরের জন্য বেশি উপযুক্ত। মহান আল্লাহ তাকে দেখেন এবং ফিরিশতাদেরকে বলেন: হে আমার ফিরিশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।'[১১০]

৪. জড়োসড়ো হয়ে থাকার ক্ষেত্রে:

উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলাদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি এক ধরণের নয়। এ কথাও বুঝা গেছে যে, মহিলারা সালাতের মধ্যে সাধারণত সতরকে যথাসম্ভব বেশি করে রক্ষা করতে হবে। এজন্য মহিলাদের উচিত হচ্ছে জড়সড় হয়ে এবং একটি অঙ্গকে আরেকটি অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখা। হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর উক্তি থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ

'হযরত ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুকে মহিলাদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন; মহিলারা জড়সড় হয়ে এবং অঙ্গগুলোকে একটির সাথে আরেকটিকে মিলিয়ে রাখবে।'[১১১]

[১১০] আস-সুনানুল কতবুওা, হাদীস-৩৩২৪

[১১১] মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস- ২৭৯৪

৫. সতরের ক্ষেত্রে পার্থক্য:

চেহারা ও হাত-পা ব্যতীত পুরো শরীর ঢেকে রাখবে। সালাত শুরু করার পূর্বে মহিলারা চেহারা ও হাত-পা ব্যতীত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালো করে ঢেকে নিতে হবে। কারণ নারীদের সতরের পরিমাণ হচ্ছে, মুখমন্ডল, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পা ব্যতীত সমস্ত শরীর সতরের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং ঢেকে রাখা ফরয।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।[১১২]

হাদীসে এসেছে-

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

মহিলাদের পুরো দেহ সতরের অন্তর্ভূক্ত।[১১৩]

নোট: তিরমিযির হাদীসে মহিলাদের পুরো দেহ সতরের অন্তর্ভূক্ত বলা হয়েছে। তবে উপরের আয়াতটিতে সাধারণত যা প্রকাশমান এর ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য হাদীস থেকে মহিলাদের মুখমন্ডল, উভয় পা এবং হাতের তালুকে সতর থেকে বাইরে রাখা হয়েছে।

আমরা এতোক্ষণে পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের উল্লেখযোগ্য এবং মৌলিক পাঁচটি পার্থক্যের কথা হাদীস ভিত্তিক আলোচনা করেছি। সেই পাঁচটি পার্থক্য হচ্ছে-

১. হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পার্থক্য:

২. সাজদার ক্ষেত্রে পার্থক্য:

৩. বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য:

৪. জড়োসড়ো হয়ে থাকার ক্ষেত্রে:

৫. সতরের ক্ষেত্রে পার্থক্য:

[১১২] সূরা নূর, আয়াত- ৩১

[১১৩] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-১১৭৩

উল্লেখিত পাঁচটি পার্থক্যের ভিত্তিতে আরও যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়ার দাবী রাখে তা হচ্ছে-

৬. বুকের উপর হাত বাধঁবে, নাভির নীচে হাত বাঁধবে না:

৭. হাত চাদর বা ওড়না ইত্যাদির ভেতর থেকে বের করবে না।

৮. মহিলারা শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে। পুরুষের ন্যায় কব্জি ধরবে না এবং গোলাকৃতিও বানাবে না।

৯. রুকুর মধ্যে সামান্য ঝুকবে।

১০. রুকুর মধ্যে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে হাটুর উপর রাখবে।

১১. রুকু অবস্থায় কনুই পাঁজরের সঙ্গে চাপিয়ে রাখবে।

১২. রুকুর মধ্যে উভয় পা একেবারে সোজা করে রাখবে না বরং হাঁটুকে সামনের দিকে কিছুটা বাকা করে দাঁড়াবে।

১৩. সাজদার মধ্যে হাত-পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে রাখবে, কিন্তু পা খাড়া করবে না। বরং ডান দিকে বের করে দেবে।

১৪. বসার সময় বাম দিকে নিতম্বের উপর ভর করে বসবে।

১৫. উভয় পা ডান দিকে বের করে রাখবে।

১৬. আত্তাহিয়্যাতু এবং দুই সাজদার মাঝের বৈঠকের সময় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য:

শুধু মহিলাদের জামাত করা মাকরুহ। তাদের একাকী সালাত পড়াই উত্তম। তবে যদি মাহরাম (যাদের দেখা করা জায়েয) ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ঘরের মধ্যেই জামাত পড়তে থাকে তবে তাদের সঙ্গে জামাতে অংশ গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেই। তবে এই অবস্থায়ও পুরুষের কাতারে না দাঁড়িয়ে পিছনে দাঁড়াতে হবে।

সালাত নষ্ট হওয়া এবং সাজদায়ে সাহুর বিবরণ

যে সব কাজের দ্বারা সালাত নষ্ট হয়ে যায়

সালাতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কোনো একটি পাওয়া গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

১. সালাতের শর্তসমূহের কোন একটি ছুটে গেলে।

২. সালাতের ফরযসমূহের কোন একটি ছেড়ে গেলে।

৩. ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক, সালাতে কথা বললে।

৪. মানুষের কথার ন্যায় কোনো দুআ করলে। যেমন- হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে অমুককে বিয়ে করিয়ে দাও, বা আমাকে আপেল খাওয়াও, ইত্যাদি বলে দুআ করলে।

৫. কাউকে সালাম দিলে অথবা মুখ বা মুসাফাহা দ্বারা সালামের উত্তর দিলে। ইচ্ছা করে হোক বা ভুলে।

৬. অধিক বা বড় কাজ করলে। অধিক বা বড় কাজ বলতে ঐ কাজকে বুঝানো হয়, যা দেখে দর্শকের মনে হয় যে লোকটি সালাতের মধ্যে নেই।

৭. বুক কিবলার দিক থেকে পরিবর্তন করলে। তবে সালাতে ওযূ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ ওযূ করার জন্য বের হয় আর তার বুক কিবলার দিক থেকে পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তার সালাত নষ্ট হবে না।

৮. সালাতের মধ্যে কোনো কিছু খেলে বা পান করলে। যদি তা সামান্য হয়। তবে যদি তা ছোলা থেকে ছোট হয়, তাহলে সালাত নষ্ট হবে না।

৯. দাঁতে লেগে থাকা ছোলা পরিমাণ বা তার থেকে বড় বস্তু খেলে।

১০. কোনো প্রয়োজন ছাড়া গলা ঝাড়লে বা কাশাকাশি করলে। তবে প্রয়োজন বশত বা কণ্ঠ স্পষ্ট হওয়ার জন্য কিংবা ইমামকে সতর্ক করার জন্য গলা ঝাড়লে সালাত নষ্ট হবে না।

১১. যদি উহ বা উফ অথবা সালাতে কান্না করে তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। তবে আল্লাহর ভয়ে এমন হলে সালাত নষ্ট হবে না। যদি অসুস্থতার কারণে অনিচ্ছায় হয় তাহলেও সালাত নষ্ট হবে না। জান্নাত ও জাহান্নামের

স্মরণে যদি কান্না আসে তাহলেও সালাত নষ্ট হবে না। বিপদের কারণে কান্না করে তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

১২. সালাতের মধ্যে সতর খুলে গিয়ে তা এক রুকন বা তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় বিলম্ব হলে।

১৩. সালাতের মধ্যে পাগলামী চলে এলে।

১৪. সালাতের মধ্যে অজ্ঞান হলে।

১৫. ফজরের সালাত আদায়রত অবস্থায় সূর্য উদয় হলে।

১৬. ঈদের সালাতে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়লে।

১৭. জুমুআর সালাত আদায় করতে গিয়ে তা আসরের সালাতের সময়ে প্রবেশ করলে।

১৮. তায়াম্মুম করে সালাত শুরু করার পর পানি পাওয়া গেলে এবং তা ব্যবহারে সক্ষম হলে।

১৯. কোনো কারণে ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে।

২০. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় আল্লাহু আকবার শব্দের শুরুতে আ্যা বা হামজাকে লম্বা করে পড়লে। কারণ তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ কি বড়?। যা প্রশ্নবোধক শব্দ। এমন শব্দ দিয়ে সালাত শুরু করলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

২১. সালাতের মধ্যে কুরআন দেখে দেখে পড়লে।

২২. ইমাম সাহেবের ওযূ নষ্ট হওয়ার পর তিনি যদি এমন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানায়, যে ব্যক্তি ইমামতির একবারে অযোগ্য।

২৩. সালাতের মধ্যে উচ্চ আওয়াজে হাসলে।

২৪. জামাতে সালাত আদায় করার সময় মুক্তাদী যদি কোনো রুকনকে ইমামের আগে আদায় করে নেয় এবং তা আদায়ে ইমামের সাথে অংশীদার না হয়। যেমন, মুক্তাদী ইমামের পূর্বে রুকুতে গেল এবং ইমাম রুকুতে না যাওয়ার আগে সে রুকু থেকে উঠে গেল এবং পুনরায় ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হয় নি। এমন হলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

যে সব কাজের দ্বারা সালাত নষ্ট হয় না

সালাতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কোনো একটি পাওয়া গেলেও সালাত নষ্ট হবে না।

১. সালাত শেষ করার জন্য ভুলে সালাম ফেরালে।

২. কেউ সালাত আদায়কারীর সাজদার স্থান দিয়ে হেটে গেলে।

৩. দাঁতে লেগে থাকা ছোলার চেয়ে ছোট বস্তু খেয়ে ফেললে।

৪. কোন লেখার দিকে তাকালে এবং তা বুঝে ফেললে।

৫. সালাতের মধ্যে মুচকি হাসি এলে। তবে এর কারণে সালাতের সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে।

সাজদায়ে সাহু কি ও কেন এবং এর বিধান

যে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে কোনো রুকন বা ফরয ছেড়ে দিবে, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় সেই সালাত পড়ে নেয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে যে ব্যক্তির সালাতের মধ্যে কোনো রুকন বা ফরয ভুলে ছুটে যায়, তার সালাতও বাতিল হয়ে যাবে। এই সালাতও পুনরায় পড়ে নেয়া ওয়াজিব। সালাতের মধ্যে কোন রুকন বা ফরয নষ্ট হলে, চাই ইচ্ছা করে হোক বা ভুলে হোক, তা সাজদায়ে সাহু দ্বারা পূরণ হবে না।

আর যে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে কোন ওয়াজিব আমলকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিবে, সে গুনাহগার হবে। তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। সালাতের যে ক্ষতি হয়েছে তা সাজদায়ে সাহু দ্বারা পূরণ হবে না। সুতরাং এই সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

আর যে ব্যক্তি সালাতের কোন ওয়াজিব আমলকে ভুলবশত: ছেড়ে দিবে, তার জন্য সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব। ভুলবশত ওয়াজিব ছুটে যাবার কারণে সালাতের যে ক্ষতি হয়েছে, তা সাজদায়ে সাহু দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো, কোন কোন আমলকে ভুলে ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দিতে হবে? আমরা সে সব আমলের কথা আলোচনা করব, যে সব আমলকে ভুলে ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু করতে হয় এবং সাজদায়ে সাহু দ্বারা সে ভুলের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

১। ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকাতের কোন এক রাকআতে বা উভয় রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ভুলে ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

২। নফল ও বিতর সালাতের যে কোন রাকআতে সূরা ফাতিহা ভুলে ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৩। ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়া ভুলে গিয়ে শেষের দুই রাকআতে পড়লেও সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৪। ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকাতের কোন এক রাকআতে অথবা উভয় রাকআতে সূরায়ে ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়া ভুলে গেলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৫। নফল ও বিতর সালাতের যে কোন রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়া ভুলে ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৬। একই রাকআতে সূরা ফাতিহা দুইবার পড়লে সাহু সাজদা দেয়া ওয়াজিব। কারণ সে যথা সময়ে অন্য সূরা বা ফরয আমলকে দেরী করে সম্পন্ন করেছে।

৭। তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয, ওয়াজিব এবং নফল সালাতের প্রথম বৈঠক ভুলবশত: ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব।

৮। ভুলবশত: তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু. . .) ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৯। বিতর সালাতের মধ্যে কুনূতের তাকবীর ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

১০। রুকুতে যাবার পূর্বে বিতর সালাতে ভুলবশত: কুনূত না পড়লে।

১১। যে সব সালাতে নীচু আওয়াজে তিলাওয়াত করা হয়, সে সব সালাতে উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করলেও সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

১২। যে সব সালাতে উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করা হয়, সে সব সালাতে নীচু আওয়াজে তিলাওয়াত করলেও সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

১৩। প্রথম বৈঠকে ভুলবশত: তাশাহহুদ পাঠ করার পর এমন কিছু পাঠ করল বা এই পরিমাণ দেরী করল, যা এক রুকন আদায় করার সমপরিমাণ সময়। তাহলেও সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

সাজদায়ে সাহু সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়

১। ইমামের ভুলের কারণে ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের উপর সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

২। ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়রত অবস্থায় মুক্তাদীর ভুল হলে, মুক্তাদীর উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। তবে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদী তার অবশিষ্ট সালাত আদায় করার সময় ভুল হলে সাজদায়ে সাহু করা মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব।

৩। ইমামের উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণে তিনি যখন সাজদায়ে সাহু আদায় করবেন তখন মুক্তাদীও সাজদায়ে সাহু আদায় করতে হবে।

৪। যার উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে, সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দেয় (অর্থাৎ সাজদায়ে সাহু না করে) তাহলে তার গুনাহ হবে। ঐ সালাত পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

৫। যে ব্যক্তি ভুলে একাধিক ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে, তার জন্যও একই নিয়ম। অর্থাৎ অন্যান্য ভুলের জন্য যেভাবে সাজদায়ে সাহু করা হয়, সে ব্যক্তি সেভাবেই সাহু সাজদা করবে। অধিক বার করতে হবে না।

৬। যে ব্যক্তি ভুলে ফরয সালাতের প্রথম বৈঠক না করে উঠে যাবে, সে সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত (ভুলের কথা মনে পড়লে) সাথে সাথে বসে যাবে। আর যদি সে দাঁড়ানোর অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সাজদায়ে সাহু দিয়ে সালাত শেষ করবে। তবে যদি সে বসার নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তাহলে সে বসে পড়বে এবং এর জন্য সাজদায়ে সাহু দিতে হবে না।

৭। যদি কেউ নফল সালাতের প্রথম বৈঠক ভুলে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলেও সে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে পড়বে। এর জন্য সে সাজদায়ে সাহু করবে।

৮। যে ব্যক্তি ফরয সালাতের মধ্যে ভুলে শেষ বৈঠক ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় সে পঞ্চম রাকাতের সাজদা করার পূর্ব পর্যন্ত (ভুলের কথা মনে পড়লে) বসে যাবে এবং সাজদায়ে সাহু করবে।

৯। যে ব্যক্তি ফরয সালাতের মধ্যে ভুলে শেষ বৈঠক ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং সে পঞ্চম রাকাতের সাজদা করে ফেলে তখন তার জন্য উচিত হলো সে আরও এক রাকাত মিলিয়ে মোট ছয় রাকাত পড়বে। এই ছয় রাকাত তার জন্য নফল হয়ে যাবে। এই ভুলের জন্য সাজদায়ে সাহু দিতে হবে। যেহেতু এই সালাত নফল হয়ে যাবে, তাই আবার ফরয সালাত পড়তে হবে।

১০। যে ব্যক্তি সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর সালাম না ফিরিয়ে ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, তার জন্য বিধান হলো সে দাঁড়ানো থেকে বসবে এবং আবার তাশাহহুদ পড়া ব্যতীত সালাম ফিরাবে। সাজদায়ে সাহু করতে হবে না।

১১। যে ব্যক্তির উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে, সে যদি ভুলবশত: সাজদায়ে সাহু না করে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করে ফেলে,তাহলে সে যতক্ষণ পর্যন্ত কিবলার দিক থেকে না ফিরবে কিংবা কোন কথা না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সাজদায়ে সাহুর কথা মনে পড়লে সাজদায়ে সাহু আদায় করবে।

১২। যে ব্যক্তি চার রাকাত সালাত আদায় করার সময়ে দুই রাকাত আদায় করার পর তার কাছে মনে হলো চার রাকাত হয়েছে। এরপর সে সালাত সম্পূর্ণ হয়েছে মনে করে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছে। সালাম ফিরানোর পর মনে হয়েছে যে, আসলে সালাত সম্পূর্ণ হয় নি। সালাত চার রাকাতের ক্ষেত্রে দুই রাকাত হয়েছে। তখন সে আগের দুই রাকাতের সাথে আরও দুই রাকাত যুক্ত করবে এবং সালাত শেষে সাজদায়ে সাহু আদায় করবে।[১১৪]

সাজদায়ে সাহু আদায়ের পদ্ধতি

যার উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে, সে শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ শেষ করার পর ডান দিকে একটি সালাম ফিরাবে। এরপর আল্লাহু আকবার বলে সালাতের সাজদার ন্যায় দুটি সাজদা করবে। অত:পর বসে আবার

[১১৪] আল-ফিকহুল মুয়াসসার

তাশাহহুদ পড়বে। দরূদে ইবরাহীম পড়বে। এরপর কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত যে কোন দুআ করা যায়। হযরত আবু বকর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি দুআ শিক্ষা দিন যা আমি সালাতের মধ্যে পড়তে পারি। তখন তিনি বললেন, তুমি সালাতের মধ্যে এই দুআটি পড়বে।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফছী যুলমাং কাছিরা, ওয়ালা ইয়াগ ফিরুয যুনূবা ইল্লা আংতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইংদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আংতাল গাফূরুর রাহীম।[১১৫]

এরপর সালাম ফিরাবে।[১১৬]

সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ সময়

সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময়:

সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ কিছু সময় রয়েছে। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয সালাত হোক বা ওয়াজিব, কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়। নিষিদ্ধ সময় হচ্ছে তিনটি।

১. সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। এর আনুমানিক সময় হলো **১২/১৩** মিনিট।

২. সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত।

---

[১১৫] সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৩৪

[১১৬] আল-ফিকহুল মুয়াসসার

৩. সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

হাদীসে এসেছে-

أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য একটু উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো সালাত নেই, অর্থাৎ অন্য কোনো সালাত আদায় করা যাবে না।[১১৭]

নোট: এই হাদীস থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় যে কোন ধরণের সালাত নিষিদ্ধ। তবে ঐ দিনের আসরের সালাত এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ঐ দিনের আসরের সালাত সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়ার পরও পড়া যায়। সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে সালাত আদায় করা মাকরূহ। মাকরূহ হলেও পড়ে নেওয়া উচিত। কেননা, ফরয তো আদায় হবে।

ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় সালাত আদায় নিষেধ সম্পর্কিত হাদীস-

عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

---

[১১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৮৬

হযরত আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যেসব বিষয় আমি জানি না এবং মহান আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন, এমন বিষয় থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। আমাকে সালাত সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি সালাতুল ফজর আদায় করবে। এরপর সূর্য পূর্বাকাশে উচু হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝখানে উদিত হয়, এবং ঐ সময় সূর্যপুজারীরা সূর্যকে সাজদা করে।

অত:পর সূর্য যখন উচু হয় তখন সালাত আদায় করবে। কেননা সালাত মহান আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হয়। এরপর যখন বর্শার ছায়া সংক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ সূর্য মধ্যগগণে চলে যায়) তখনও সালাত পড়বে না। কেননা এ সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয়। এরপর ছায়া যখন দীর্ঘ হতে থাকে তখন সালাত পড়বে। স্মরণ রাখবে, সকল সালাত মহান আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হয়। আর আসরের সালাত আদায় করার পর সূর্যাস্থ পর্যন্ত অন্য কোনো সালাত পড়বে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝখানে অস্ত যায় এবং ঐ সময় সূর্যপুজারীরা সূর্যকে সাজদা করে।[১১৮]

আমর ইবনে আবাসা রাদি. বর্ণিত হাদীস থেকে পরিষ্কার জানতে পেরেছি যে, সালাত আদায়ের কিছু কিছু নিষিদ্ধ সময় রয়েছে। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয সালাত হোক বা ওয়াজিব, কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়।

১. সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। এর আনুমানিক সময় হলো ১২/১৩ মিনিট।

২. সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩. সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। তবে ঐ দিনের আসরের সালাত এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ঐ দিনের আসরের সালাত সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়ার পরও পড়া যায়।

উল্লেখিত সময়গুলোতে যদি জানাযা উপস্থিত হয় তাহলে জানাযার সালাত পড়া জায়েয আছে, তবে মাকরূহ হবে। কেউ যদি আয়াতে সাজদাহ

[১১৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯৬৭

তিলাওয়াত করে তাহলে তিলাওয়াতে সাজদাহ আদায় করা জায়েয আছে, তবে এটাও মাকরূহের সাথে আদায় হবে।

উল্লেখিত তিনটি সময়ে সকল নফল সালাত পড়া মাকরূহে তাহরীমি।

যে সব সময়ে নফল সালাত আদায় করা মাকরূহ

কিছু সময় আছে এমন, যে সময়গুলোতে নফল সালাত পড়া মাকরূহ। আর তা হচ্ছে-

১. সালাতুল ফজরের সময় হওয়া থেকে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সালাত ব্যতীত অন্য কোনো নফল সালাত আদায় করা। এ সম্পর্কে সালাতুল ফজরের শিরোনামে বিস্তারীত আলোচনা করা হয়েছে।

২. ফজরের ফরয সালাতের পর সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো নফল সালাত আদায় করা।

৩. সালাতুল আসরের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো নফল সালাত আদায় করা।

৪. জুমার দিনে খতীব সাহেব আরবি খুতবা শুরু করার পর থেকে ফরয সালাত শেষ করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো নফল সালাত আদায় করা।

৫. সালাতের জন্য ইক্বামত বা তাকবীর বলার সময় কোনো নফল সালাত পড়া। তবে ফজরের সুন্নত সালাত এই বিধানের অর্ন্তভুক্ত নয়। কারণ ইমাম সাহেবকে ফজরের দ্বিতীয় রাকআতে পাবার নিশ্চয়তা থাকলে ফজরের সুন্নাত সালাতকে ইক্বামতের সময়েও পড়া জায়েয আছে। তখন সুন্নাত সালাতকে মসজিদের কোণে পড়া উচিত।

৬. ঈদের সালাতের পূর্বে। অতএব ঈদের সালাতের পূর্বে সালাত আদায়ের মাঠে হোক বা ঘরে কিংবা মসজিদে হোক যে স্থানেই ঈদের সালাতের পূর্বে নফল সালাত পড়া মাকরূহ।

৭. ঈদের সালাতের পরে কেবল ঈদের মাঠে নফল সালাত পড়া মাকরূহ। সুতরাং ঈদের সালাত আদায় করার পর ঘরে নফল সালাত মাকরূহ হবে না।

৮. বেশি ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার সামনে এলে এবং খাবারের প্রতি প্রচন্ড চাহিদা থাকলে।

৯. মল মূত্র ও বায়ূ ত্যাগের চাপ থাকলে। ফরয হোক বা নফল, সব সালাতই মাকরূহ।

১০. এমন কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হলে যা মনোযোগ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং সালাতের বিনয়কে নষ্ট করে দেয়।

১১. শুধু হাজী সাহেবদের জন্য আরাফাতে যোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত আদায় করা।

১২. শুধু হাজী সাহেবদের জন্য মুজদালিফাতে মাগরিব এবং ইশারের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত আদায় করা।

প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর মাসনুন আমল

সালাত মুমিনের জীবনের সর্বোত্তম ইবাদত। সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির। আর এ যিকিরের মাধ্যমে মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি আসে। এজন্য সালাতের শেষে মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। আমরা সালাতে মনোযোগ দিতে পারি না বলে এ প্রশান্তি ভালোভাবে অনুভব করতে পারি না। তা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব মনোযোগ সহকারে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সালাত সম্পন্ন করলে সালাত আদায়কারী নিজেই হৃদয়ের প্রশান্তি ও আবেগ অনুভব করবেন। এ সময়ে তাড়াহুড়া করে উঠে চলে যাওয়া মুমিনের উচিত নয়। সালাতের পরে যতক্ষণ সম্ভব সালাতের স্থানে বসে যিকির-মুনাজাতে রত থাকা উচিত। কিছু না করে শুধু বসে থাকলেও ফিরিশতাগণের দুআ লাভের সৌভাগ্য লাভ হবে।

আবু হুরাইরা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيْهِ

ফিরিশতাগণ অনবরত তোমাদের জন্য দুআ করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সালাতের পর সালাতের স্থানে বসে থাকো। (ফিরিশতাগণ বলেন)

হে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাঁকে রহমত করুন, তাঁর তাওবা কবুল করুন। যতক্ষণ সে অহেতুক কাজ না করে এবং ওযূ নষ্ট না করে।[১১৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস বা গোলামকে মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস বা গোলামকে মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়।[১২০]

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে-

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَلَسَ فِيْ مَجْلِسِهِ حَتَّى تُمْكِنَهُ الصَّلَاةُ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَتَيْنِ

যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করার পর সালাত জায়েয হওয়ার সময় পর্যন্ত তাঁর বসার স্থানে বসে থাকবে সে একটি কবুল হজ্ব এবং একটি কবুল ওমরা করার সমান সওয়াব পাবে।[১২১]

এছাড়া সাহাবি-তাবেয়ীগণ প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে কোনো কথোপকথনে লিপ্ত না হয়ে সাধ্যমতো বেশি সময় তাসবীহ, তাহলীল এবং দুআ ও যিকির করতে পছন্দ করতেন। ফরজ সালাতের পর দুআ কবুল হয় বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। এ জন্য ফরজ সালাতের পর বেশি করে দুআ করা উচিত। বিশেষ করে ফজর এবং আসরের সালাতের পরে দুআ, দরূদ ও যিকির এবং সুন্নাহ সম্মত আমল নিয়মিতভাবে বেশি করে পালন করা উচিত। আমরা এখানে সুন্নাহ সম্মত কিছু আমলের কথা উল্লেখ করেছি। পাঠক/পাঠিকা আমল করবেন। আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি আমাদেরকে এবং সকল পাঠক/পাঠিকাকে এর উত্তম বিনিময় দান করবেন।

---

[১১৯] আবু দাউদ, হাদীস-৫৫৯

[১২০] আবু দাউদ, হাদীস-৩৬৬৯

[১২১] আল-মুয়জামুল আওসাত, হাদীস-৫৬০২

১ নং আমল: ইস্তিগফার পড়া:

প্রত্যেক ফরজ সালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলা।[১২২]

২ নং আমল: আয়াতুল কুরসী পড়া:

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়া।[১২৩]

৩ নং আমল: সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করা:

হাদীসে এসেছে, হযরত উকবা ইবনে আমের রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন প্রত্যেক ফরয সালাতের পর সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করি।[১২৪]

৪ নং আমল: মাথায় হাত রেখে এই দুআ পড়া:

হযরত আনাস রাদি. বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করতেন তখন তিনি ডান হাত মাথায় রেখে নিম্নের দুআটি পড়তেন।

بِسْمِ اللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّى الهَمَّ وَالْحُزْنَ

বিছমিল্লা হিল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রাহীম, আল্লাহুম্মা আযহিব আন্নীল হাম্মা ওয়াল হুযনা।

আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি অতি করুনাময় এবং দয়ালু। হে আল্লাহ! আপনি আমার থেকে সকল দু:শ্চিন্তা এবং পেরেশানী দূর করে দিন।[১২৫]

৫ নং আমল: কপালে হাত রেখে এই দুআ পড়া:

اللّٰهمَّ أَذْهِبْ عَنِّى الهَمَّ وَالْحُزْنَ

[১২২] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৬২

[১২৩] বুলুগুল মারাম, হাদীস-৩২৬

[১২৪] আবু দাউদ, হাদীস-১৫২৫

[১২৫] মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-১৬৯৭১

আল্লাহুম্মা আযহিব আন্নীল হাম্মা ওয়াল হুযনা।

হে আল্লাহ! আপনি আমার থেকে সকল দু:শ্চিন্তা এবং পেরেশানী দূর করে দিন ।[১২৬]

৬ নং আমল: প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর এই দুআ পড়া:

.اللّٰهمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ

আল্লাহুম্মা আংতাছ ছালাম, ওয়া মিংকাছ ছালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।

হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই হয়। আপনি সুমহান, হে সম্মান ও মর্যাদার মালিক।[১২৭]

অনেকে উল্লেখিত দুআটির সাথে নীচের এই দুআটিও পড়ে-

وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ السَّلَامَ

ইলাইকা ইয়ার জিউছ ছালাম, ফাহায়্যিনা রাব্বানা বিচ্ছালাম, ওয়া আদখিলনা দারাকা ছালাম ...।

এটি হাদীসে বর্ণিত দুআ নয়। সুতরাং কেউ যদি এটিকে হাদীসে বর্ণিত দুআ হিসেবে পড়ে তাহলে আপত্তি আছে। কেননা যা হাদীসে নেই সেটাকে হাদীস বলা গুরুতর অপরাধ। তবে এই দুআটিকে স্বাভাবিক দুআ হিসেবে পড়লে তখন কোনো অসুবিধা নেই।[১২৮]

৭ নং আমল: প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর এই দুআ পড়া:

.اللّٰهمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুছনি ইবাদাতিক।

হে আল্লাহ! আপনার স্বরণ, কৃতজ্ঞতা এবং উত্তম ইবাদত পালনে আমাকে সাহায্য করুন।

[১২৬] মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-১৬৯৭২

[১২৭] আবু দাউদ, হাদীস-১৫১৪

[১২৮] তুহফাতুল আহওয়াযী

ফযিলত: হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বলেছেন, হে মুয়ায, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি, তারপর তিনি বললেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি, তুমি কখনো ফরজ সালাতের (নামাযের) পর আল্লাহুম্মা... (উল্লেখিত আমলটি) বাদ দিবে না। মুয়ায বর্ণনাকারী ছানাবিহকে এবং তিনি আবু আব্দুর রহমানকে এমনই ওসীয়ত করেছেন।[১২৯]

৮ নং আমল: কুফুরী, দারিদ্রতা ও কবরের আযাব থেকে রক্ষার দুআ:

اللّٰهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরী, ওয়াল ফাক্বরী, ওয়া আযাবিল ক্বাবরী

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই কুফুরী, দারিদ্রতা এবং কবরের আযাব থেকে।

ফযিলত: হযরত মুসলিম ইবনে আবু বাকরা রাদি. বলেন, আমার পিতা সালাতের শেষে উল্লেখিত আমলটি করতেন। আমিও সালাতের শেষে আমলটি করতে লাগলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আমার আদরের ছেলে! তুমি এই আমলটি কোথায় থেকে শিখলে? আমি বললাম, আপনার থেকে শুনে শুনে শিখেছি। তখন তিনি বললেন, হে ছেলে! তুমি এই আমলটিকে গুরুত্বসহ পালন করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের শেষে এই আমলটি করতেন।[১৩০]

৯ নং আমল: সূরা সাফ্‌ফাত এর শেষ তিন আয়াত পড়া:

প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর সূরা সাফ্‌ফাত এর শেষ তিন আয়াত পড়া।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

[১২৯] আবু দাউদ, হাদীস-১৫২৪

[১৩০] মুসনাদে আহমদ, হাদীস-২০৪২৫; তাহযীবুল আসার, হাদীস-৩১০

পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে । রাসূলগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য।

ফযিলত: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এই আয়াতগুলো তিনবার পড়বে তাকে যতেষ্ঠ পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে।[১৩১]

১০ নং আমল: প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর এই দুআ পড়া:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللّٰهمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকালাহ, লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আয়ত্বাইতা, ওয়ালা মুয়ত্বিয়া লিমা মানায়তা। ওয়ালা ইয়াংফায়ু যাল জাদ্দি মিংকাল জাদ্দ।

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনিই সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তোমার দানে প্রতিবন্ধক নেই। আর আপনি না চাইলে কেউ দিতে পারে না। আর কোন সম্পদশালীর সম্পদ আপনার থেকে রক্ষা করতে পারে না।

নোট: প্রখ্যাত সাহাবি হযরত মুগীরাহ ইবনে শুয়বা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এই আমলটি করতেন।[১৩২]

১১ নং আমল: প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর এই দুআ পড়া:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

[১৩১] মুয়জামুত তাবরানী, হাদীস-৫১২৪

[১৩২] সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৬৬

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকালাহ, লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা নায়বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন নিয়মাতু ওয়ালা হুল ফাদ্বলু ওয়ালা হুছ ছানাউল হাছানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিছীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন।

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনিই সর্বশক্তিমান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। নিয়ামত এবং অনুগ্রহ তাঁর। তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। দ্বীন একমাত্র তাঁরই জন্য। যদিও অমুসলিমরা এতে অবিশ্বাসী।[১৩৩]

১২ নং আমল: প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর তাসবীহর আমল:

৩০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত।

প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ৩৩ বার ছুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল হামদু লিল্লাহ এবং ৩৩/৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলা। এই আমল সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ আছে। তবে উল্লেখিত সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ। এই তাসবীহগুলোর সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে প্রত্যেকটি ১০ বার করে মোট ৩০ বার। আর সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে প্রত্যেকটি ১০০ বার করে মোট ৩০০ বার। আবু হুরাইরা রাদি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ উপরোক্ত তাসবিহ প্রত্যেকটি ৩৩ বার করে মোট ৯৯ বার এবং একবার নীচের তাসবিহ পড়ে তাহলে তাঁর গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদিও তা সাগরের ফেনার মতো হয়। তাসবিহটি হচ্ছে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা- শারীকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালা হুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর।[১৩৪]

[১৩৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৭১

[১৩৪] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৩২৯

১৩ নং আমল: জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য:

সাতবার, শুধু সালাতুল ফজর ও মাগরিবের পর।

اللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান নার।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।[১৩৫]

ফযিলত: মুসলিম ইবনুল হারিস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের নামাযের পরেই দুনিয়াবী কথা বলার আগে এ দুআটি সাতবার পড়বে। যদি তুমি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। অনুরূপভাবে মাগরিবের নামাযের পরেই দুনিয়াবী কথা বলার আগে এ দুআটি সাতবার পড়বে। যদি তুমি ঐ রাতে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।[১৩৬]

১৪ নং আমল: ইলম, রিযিক ও আমল কবুল হওয়ার জন্য দুআ:

শুধু সালাতুল ফজরের পর।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا

আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ আলুকা ইলমান নাফিয়া, ওয়া আমালাম মুতাক্বাব বালা, ওয়া রিযক্বাং ত্বায়্যিবা।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, উত্তম ও আমল কবুল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি।[১৩৭]

১৫ নং আমল: সালাত ও ক্বিরাতের মধ্যে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষার দুআ:

হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমার ও আমার সালাতের মধ্যে

[১৩৫] আবু দাউদ, হাদীস-৫০৮১

[১৩৬] আবু দাউদ, হাদীস-৫০৮১

[১৩৭] মিশকাত, হাদীস-২৪৯৮;

অনুপ্রবেশ করে এবং ক্বিরাতের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঐটা একটা শয়তান। ওর নাম খিনযিব/খানযাব। যখন তুমি ওর উপস্থিতি অনুভব করবে তখন বলবে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। এরপর তোমার বুকের বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাদি. বলেন, আমি এই আমলটি করলাম। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার থেকে শয়তানকে দূর করে দিলেন।[১৩৮]

উল্লেখ থাকে যে সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময় ও অবস্থায় এরূপ হলে তখন আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম বললে এবং থুথু নিক্ষেপ করলেও সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দুআ:

اللّٰهمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، اللّٰهمَّ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا بِرَحْمَتِكَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

নোট: এই দুআটি কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। যে কোনো মুনাজাতে পড়া যাবে। তবে এই দুআটিকে প্রত্যেক সালাতের পর পালনীয় দুআর শিরোনামে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, আমরা সাধারণত সালাতের পরেই দুআ, মুনাজাত পালন করে থাকি। যেহেতু দুআটি তাৎপর্যপূর্ণ তাই যখন সুযোগ হয় তখন পড়া উচিত।[১৩৯]

[১৩৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৮৬৮

[১৩৯] মুয়জামুত তাবরানী, হাদীস-৩৪১

সালাতের মধ্যে পঠিত কতিপয় দুআ ও দুরূদ

তাকবীরে তাহরীমার পরের দুআ (সানা):-১ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার পর সালাতের শুরুতে বলতেন-

سُبْحَانَكَ اللّٰهمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রা কাছমুকা, ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুক।

হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষনা করছি, আপনারই প্রশংসা। অনেক বরকতময় আপনার নাম। সুউচ্চ আপনার মর্যাদা। কোনো মাবুদ নেই আপনি ছাড়া।[১৪০]

তাশাহহুদ:

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ ছালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু, আছছালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ, আছছালামু আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল্লাহিছ ছোয়ালিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

সমস্ত অভিবাদন এবং কল্যাণ ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।[১৪১]

[১৪০] আবু দাউদ, হাদীস-৭৭৬

[১৪১] সহীহ বুখারী, হাদীস-৭৩৮১

দুরূদ শরীফ:

দুরূদে ইবরাহীম ও কিছু কথা: মহান আল্লাহ সূরায়ে আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে সকল মুমিনগণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশের পূর্ব থেকেই মুমিনগণ (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করতেন। কিন্তু তাঁরা কিভাবে মহামানব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন এর উপর দুরূদ প্রেরণ করবেন? এ জন্য সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দুরূদ প্রেরণের পদ্ধতি জানতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের দুরূদ শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত অসংখ্য দুরূদ থেকে বাছাই করে সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত সহজ, তাৎপর্যপূর্ণ একটি দুরূদ এখানে উল্লেখ করছি। এই দুরূদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণ সালাতের মধ্যে তা পাঠ করতেন। এটিকে আমরা দুরূদে ইবরাহীম বলে থাকি। এই দুরূদটি সহীহ বুখারীর ৩৩৭০ নং হাদীসসহ আরো কয়েকটি স্থানে সামান্য ব্যবধানে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে এই-

اللّٰهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللّٰهمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। যেরুপ রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত দান করুন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর

পরিবার-পরিজনের উপর। যেরুপ বরকত দান করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত।

দুআয়ে মাছূরা:

اللّٰهمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফছী যুলমাং কাছিরা, ওয়ালা ইয়াগ ফিরুয যুনূবা ইল্লা আংতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইংদিকা ওয়ার হামনী ইন্না কাআংতাল গাফূরুর রাহীম।

হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অত্যাধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমাকারী নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিন এবং আপনি আমাকে দয়া করুন। আপনি ক্ষমাকারী এবং দয়াময়।[১৪২]

নোট: হযরত আবু বকর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি দুআ শিক্ষা দিন যা আমি সালাতের মধ্যে পড়তে পারি। তখন তিনি বললেন, তুমি সালাতের এই দুআটি (উপরে উল্লেখিত) পড়বে।

সালাতুল বিতিরের দুআ:

দুআয়ে কুনূত -১

اللّٰهمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

[১৪২] সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৩৪

আল্লা-হুম্মাহ দিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া আ-ফিনী ফীমান আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বা-রিক লী ফীমা- আ'অ্‌ত্বাইতা, ওয়া ক্বিনী শাররা মা ক্বাদ্বাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বদ্বযী ওয়ালা ইউক্বদ্বা আলাইকা, ওয়া ইন্নাহু লা- ইয়াযিল্লু মান ওয়া-লাইতা, ওয়ালা ইয়া ইযযু মান আদাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা- ওয়া তাআ- লাইতা।

'হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান করুন, যাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন তাদের সাথে। আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে। আমাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করুন, যাদেরকে আপনি ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে। আপনি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন। আপনি যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করেন। আপনার বিষয় কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আপনি যাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে অপমানিত হবে না। আর আপনি যাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে কখনো সম্মানিত হবে না। মহামহিমান্বিত বরকতময় আপনি, হে আমাদের প্রভু, মহামর্যাদাময় ও সর্বোচ্চ আপনি।'[১৪৩]

দুআয়ে কুনূত -২

اللّٰهمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللّٰهمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

আল্লা-হুম্মা ইন্না নাছতা ঈনুকা ওয়া নাছতাগ ফিরুকা, ওয়া নুয়মিনু বিকা ওয়ানাতা ওয়াক কালু আলাইকা, ওয়া নুছনী আলাইকাল খাইর, ওয়া নাসকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা, ওয়ানাখ লায়ু ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফ

[১৪৩] আবু দাউদ, হাদীস-১৪২৭; তিরমিযি, হাদীস-৪৬৪

জুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা নায়বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লী, ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছআ, ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজূ রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব।

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনার কাছে মাগফিরাত কামনা করি, আপনার প্রতি ঈমান রাখি, আপনার উপর ভরসা করি এবং উত্তম প্রশংসা করি। আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করি। অকৃতজ্ঞ হই না। আমরা বিচ্ছিন্ন হই এবং পরিত্যাগ করি তাকে যে আপনার অবাধ্য। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি, একমাত্র আপনার জন্যই সালাত আদায় করি এবং সাজদাহ আদায় করি। শুধু আপনার দিকেই ধাবিত হই। আপনার দাসত্ব অবলম্বন করি। আমরা আপনার রহমতের আশা করি এবং আপনার শাস্তির ভয় করি। নিশ্চয় আপনার শাস্তি কাফিরদেরকে স্পর্শ করবে।'[১৪৪]

সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাই না কেন?

শিরোনামের প্রশ্নটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কথাটিকে এভাবেও বলা যায়, সালাত আমাদেরকে পাপ থেকে ফিরায় না কেন? এখানে প্রশ্ন দুটি হলেও মর্ম একটাই। এই ধরণের প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয় সালাত অশ্লীল এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।[১৪৫]

এবার আসি মূল আলোচনায়। আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে অনেক লোক এমন আছেন, যারা সালাত আদায় করেন কিন্তু তাদের সালাত তাদেরকে অশ্লীল এবং অন্যায় থেকে ফিরায় না। সুতরাং এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে যে তাদের সালাত তাদেরকে অশ্লীল এবং অন্যায় থেকে ফিরায় না কেন? তারা আমল করেন কিন্তু কবুল হয় না কেন? সালাত

[১৪৪] আল-বাহরুর রায়িক এবং যাদুল মা'আদ

[১৪৫] সূরা আনকাবূত, আয়াত- ৪৫

আদায় করেন কিন্তু তাদের সালাত কবুল হয় না কেন? সে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পায় না কেন? আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ এমনও আছে যারা সালাত আদায় করেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পেয়ে হতাশ হয়ে যায়। তখন সে বলে আমি অনেক আমল করেছি, দীর্ঘদিন ধরে সালাত পড়েছি কিন্তু আমার আমল এবং সালাত তো কবুল হয় না। আমি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাই না। এই জন্য এখন আর আমল করি না, সালাতেও যাই না। আসলে কেন কবুল হয় না সেটা তার জানা নেই। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল কেন পায় না সেটা তার অজানা। এ জন্যই সে এমন ভুল মন্তব্য করে থাকে। যেন কোনো মুসলিম এমন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন এ জন্য এখানে আমল এবং সালাত কবুল না হওয়ার অনেক গোপন রহস্য থেকে আমরা কয়েকটি গোপন রহস্যের কথা সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাই না কেন শিরোনামে উল্লেখ করছি। যেমন-

রহস্য-১ : ঈমানের বিশুদ্ধতার অভাবেঃ

শির্ক ও কুফর মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়ার প্রথম শর্ত। কারণ শিরক করলে অন্যান্য আমলও বাতিল হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

তুমি যদি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল নিল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৪৬]

আমরা শবে বরাতের সালাত ও ইসলাম শিরোনামের আলোচনাতে দেখেছি যে মুশরিকসহ আরও অনেক শ্রেণির মানুষকে ক্ষমা করা হবে না। এর কারণ হচ্ছে শিরকে লিপ্ত হওয়া। এ জন্য সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে হলে প্রয়োজন ঈমানের বিশুদ্ধতা। ঈমানকে শিরক থেকে পবিত্র রাখতে হবে। তাহলে সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে।

[১৪৬] সূরা যুমার, আয়াত- ৬৫

রহস্য-২ : সুন্নাতের অনুসরণের অভাবেঃ

মুমিনের প্রতিটি আমল অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বা আদর্শের আলোকে পালন করতে হবে। তাঁর সুন্নাত বা আদর্শের আলোকে আমল না করে ভিন্ন পদ্ধতিতে পৃথিবী সমপরিমাণ ইখলাস থাকলেও তা মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

(হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন) অবশ্যই এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ কর। অন্য কোনো পথের অনুসরণ করো না। অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[১৪৭]

এ জন্য সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে হলে অবশ্যই সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে। নবীজির রেখে যাওয়া পদ্ধতিতে আমল করতে হবে। সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে হলে সুন্নাতের অনুসরণ আবশ্যক। সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে হলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বা আদর্শের আলোকে সালাত পালন করতে হবে।

রহস্য-৩ : ইবাদত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে না হওয়ার কারণেঃ

প্রতিটি ইবাদত পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে সে ইবাদত মহান আল্লাহর কাছে কোনোভাবেই কবুল হবে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

বড় দুঃখ আছে সেই নামাযীদের যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে। যারা মানুষকে দেখায়।[১৪৮]

[১৪৭] সূরা আনয়াম, আয়াত- ১৫৩

[১৪৮] সূরা মাউন, আয়াত- ৪,৫,৬

আয়াতে ঐ সমস্ত মানুষের শাস্তির কথা বলা হয়েছে যারা সালাত (নামায) পড়ে মানুষকে দেখানোর জন্য। যা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। তাই সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে হলে অবশ্যই ইবাদত করতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাহলে সালাতের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে।

রহস্য-৪ : ইসলামের অন্যান্য বিধানকে সঠিকভাবে পালন না করার কারণে:

এই কথাটিকে আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজে বুঝতে পারি। যেমন মনে করুন, আমরা এখানে একটি ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি। এই ঘড়িতে অনেকগুলো যন্ত্রাংশ লাগানো হয়েছে। একটার সাথে আরেকটাকে কানেকশান দেয়া হয়েছে। এতে চাবি দেবার নিয়ম করা হয়েছে। চাবি না দিলে ঘড়ির যন্ত্রাংশ থেমে যাবে। চাবি দিলেই ঘড়ি চলতে থাকবে। এসব করা হয়েছে যেন ঘড়ি ঠিকমতো সময় দেখাতে পারে। কিন্তু ঘড়ির এই যন্ত্রাংশ যদি একটার সাথে আরেকটার কানেকশান বা সংযোগ না থাকে তাহলে ঘড়িটি আমাদেরকে সঠিক সময় দেখাবে না। ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম হচ্ছে একটি ঘড়ির মতো। ইসলামের মধ্যেও ঘড়ির যন্ত্রাংশের মতো অনেক বিধি-বিধান আছে। আর সেই বিধি-বিধানগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখে। একটা ছাড়া আরেকটা চলতে পারে না। যেমন কেউ সালাত পড়ে, কিন্তু সিয়াম পালন করে না, তাহলে সে যেমন পূর্ণ মুসলিম নয়, ঠিক তেমনিভাবে কেউ সিয়াম পালন করে কিন্তু সালাত পড়ে না, সেও পূর্ণ মুসলিম নয়। কেউ হজ্ব পালন করে কিন্তু যাকাত প্রদান করে না সেও পূর্ণ মুসলিম নয়। তাহলে বুঝা গেল যে, ইসলামের একটি বিধান অন্য বিধানের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক রাখে। একটা ছাড়া আরেকটা চলতে পারে না। সুতরাং সালাতের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে হলে অবশ্যই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানকে মেনে চলতে হবে। ইসলামের বিধানকে বাস্তবায়ন করতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। তাহলেই সালাতের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে।

রহস্য-৫ : সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সালাত পালন না করার কারণে:

আমরা সব কিছুর মধ্যে সর্বোত্তম চাই। কিন্তু অবহেলা করি সালাতের মধ্যে। সালাতে দাড়াঁলে কোনো মতে রুকু সাজদা করে সালাত পালনের কাজ শেষ করে মুক্ত নি:শ্বাস ফেলি। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

আমরা একটু ইচ্ছা করলেই সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সালাত পালন করতে পারি। এর প্রয়োজন একটু সতর্কতা। সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সালাত পালনের জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথমত: সালাতের মধ্যে যে সব ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাত রয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করা। আমাদের অনেকেই এমন আছে যারা ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাতসমূহ জানে না। ফলে কখনো সালাতের মধ্যে ফরয এবং ওয়াজিব নষ্ট হলে তাদের সালাত নষ্ট হয়ে যায় তারা সেটা টেরও পায় না। এমন সালাতের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবে তো দূরের কথা তাদের সালাতই তো আদায় হয় না। দ্বিতীয়ত: খুশু-খুযূসহ সালাত আদায় করা। আমাদের সালাতের মধ্যে পরিপূর্ণ খুশু-খুযূ নেই। এই দুটি জিনিসের অভাবে আমরা সালাতের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাই না। সালাতের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে হলে অবশ্যই সালাতের মধ্যে উল্লেখিত দুটি জিনিস থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করত আবার সে চুরিও করত। তখন অন্যান্য সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে অভিযোগ করলেন। বললেন হে আল্লাহর রাসূল! এই লোক সালাতও পড়ে আবার চুরিও করে। তখন তিনি বললেন অচিরেই তার সালাত তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যখন তার সালাত উল্লেখিত দুটি গুণে গুণান্বিত হল তখন সে আর চুরি করতে যায় না। বরং তার সুন্দর সালাতই তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখল।

আমাদের এই বইয়ের মধ্যে সালাতে খুশু-খুযূ (মনোযোগ) অর্জনের পদ্ধতি শিরোনামে খুশু-খুযূ অর্জনের ২৫ টি পদ্ধতির কথা আলোচনা করেছি। সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ করছি

সালাতে খুশু-খুযূ (মনোযোগ) অর্জনের পদ্ধতি

খুশু-খুযূ সালাতের প্রাণ। সালাতের বাইরের কল্পনা খুশু-খুযূকে নষ্ট করে দেয়। যেমন, ব্যবসা-বানিজ্য, দোকান-পাট, জায়গা-জমি, গরু-ছাগল, ব্যাংক-ব্যালেন্স, টাকা-পয়সা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, অনলাইন-অফলাইন, ফেইসবুক, টুইটার, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার, সমাজ, দেশ, রাজনীতি,

সমাজনীতি, অর্থনীতি, লেখা-পড়া এবং চাকুরীসহ বিভিন্ন কাজের প্রতি আকর্ষণ আমাদের সালাতের মনোযোগ নষ্ট করে দেয়। আমাদের ব্রেইনকে ব্যস্ত করে দেয়। ফলে আমরা সালাতে পুরোপুরি মনোযোগী হতে পারি না। খুশু-খুযূ আনতে পারি না সালাতের মধ্যে। এ সব দিক থেকে ব্রেইনকে ফিরিয়ে সালাতের মধ্যে খুশু-খুযূ আনার কিছু পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি বা কৌশলগুলো গ্রহণ করলে আশা করা যায় সালাতের মধ্যে খুশু-খুযূ আসবে। এখানে আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বই-পুস্তক এবং বিশিষ্ট আলেম ও আল্লাহ ওয়ালাদের বয়ান বা লেকচার থেকে কৌশলগুলো সংগ্রহ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আপনার সমস্যা এবং অবস্থার নিরিখে কৌশলগুলো প্রয়োগ করলে আশা করা যায় আপনি সালাতের মধ্যে খুশু-খুযূ আনতে পারবেন। আপনি যথাযথ ফলাফল পাবেন। ইনশাআল্লাহ।

পদ্ধতি-১ : সালাতের মধ্যে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষার দুআ:

আবুল আলা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي.

হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাদি. বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমার ও আমার সালাতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং ক্বিরাতের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, ঐটা একটা শয়তান। ওর নাম খিনযিব/খানযাব। যখন তুমি ওর উপস্থিতি অনুভব করবে তখন বলবে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।' এরপর তোমার বুকের বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাদি. বলেন, আমি এই আমলটি করলাম। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার থেকে শয়তানকে দূর করে দিলেন।[১৪৯]

[১৪৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৮৬৮

উল্লেখ থাকে যে সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময় এবং যে কোনো অবস্থায় এরূপ হলে তখন আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম বললে এবং থুথু নিক্ষেপ করলেও সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না।

পদ্ধতি-২ : সালাতকে জীবনের শেষ সালাত মনে করা:

সালাতের মধ্যে যদি এই ধ্যান করা হয়, এই সালাতই হয়তো আমার জীবনের শেষ সালাত। এরপর হয়তো আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাহলেও সালাতে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে নসিহত করুন। তখন তিনি তাকে কয়েকটি নসিহত করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম নসিহতটি ছিল-

إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ

যখন তুমি সালাতে দাড়াঁবে, তখন তুমি মনে করবে এটা তোমার বিদায়ী (জীবনের শেষ) সালাত।[১৫০]

এই ধ্যান করে সালাত আদায় করলে আশা করা যায় সালাতের মধ্যে খুশু-খুযূ আসবে। ইনশাআল্লাহ।

পদ্ধতি-৩ : আমি আল্লাহকে দেখছি অথবা আল্লাহ আমাকে দেখছেন:

সালাত শুরু করার পর এ কল্পনা করুন, আমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখছি। অন্যদিকে মন যাওয়া মাত্রই একথা কল্পনা করুন। এতে সালাতে মনোযোগ সৃষ্টি হবে। এ কল্পনাও করুন, আমি কীভাবে সালাত পড়ছি, কীভাবে তিলাওয়াত করছি, কীভাবে উঠা-বসা এবং রুকু-সাজদা করছি, তা সবই আল্লাহ দেখছেন। মনে মনে ভাবতে থাকুন। দেখবেন খুশু-খুযূ সৃষ্টি হচ্ছে। এ কথাগুলো হাদীসে খুব সুন্দরভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি এমনভাবে ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি এমনটা মনে না হয় তাহলে মনে করতে হবে তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখছ।[১৫১]

[১৫০] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস- ৪১৭১

[১৫১] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৫০ এবং ৪৭৭৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১০২ এবং ১০৬

পদ্ধতি-৪ : অর্থ ও মর্ম বোঝার জন্য ব্রেইনকে ব্যস্ত রাখুন:

আমরা দীর্ঘদিন তিলাওয়াত, তাসবীহ এবং যিকির করার কারণে এখন এগুলো রোবটের মতো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ফলে আমাদের ব্রেইন ভিন্ন একটি কাজ অনুসন্ধান করতে থাকে। সে ব্যবসা-বানিজ্য, দোকান-পাট, জায়গা-জমি, গরু- ছাগল, ব্যাংক-ব্যালেন্স, টাকা-পয়সা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, অনলাইন-অফলাইন, ফেইসবুক, বন্ধু-বান্ধব এবং লেখা-পড়া এবং বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন আমরা সালাতে অমনোযোগী হয়ে যাই। আমাদের খুশু-খুযূ থাকে না। এ জন্য সালাতের তিলাওয়াত, তাসবীহ এবং যিকিরের অর্থ ও মর্মের প্রতি মনোযোগ দিন। বোঝার চেষ্টা করুন। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তার অর্থের প্রতি অবশ্যই মনোযোগ দিন। রুকু-সাজদা করার সময় তাসবীহগুলোর অর্থের প্রতি মনোযোগ দিন। তাহলে ব্রেইন অন্য দিকে যাবে না। কারণ ব্রেইন একই সাথে দুটি কাজ সমান মনোযোগী হয়ে পরিচালনা করতে পারে না। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে আশা করা যায় সালাতের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে। তবে কিছু দিন পর ঐ সূরা এবং আয়াতও যান্ত্রিক পদ্ধিতে পঠিত হতে থাকবে। এই জন্য নতুন সূরা এবং আয়াত মুখস্ত করে তা দিয়ে সালাত আদায়ের চেষ্টা করুন। তাহলে খুশু-খুযূ ঠিক থাকবে। ইনশাআল্লাহ।

পদ্ধতি-৫ : সালাতে পঠিত শব্দগুলো নিজের কানে লাগিয়ে পড়ুন:

সালাতে পঠিত তিলাওয়াত, তাসবীহ ও যিকিরের শব্দের প্রতি মনোযোগ দিন। সেগুলো লক্ষ্য করে গভীরভাবে ভাবুন। একা একা সালাত পড়ার সময় তিলাওয়াত ও যিকিরের বাক্যগুলো একটু জোড়ে উচ্চারণ করুন। যেন আওয়াজ নিজ কানে পৌঁছে। তবে তা যেন কারও ইবাদত বা অন্য কোনো আমলে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

পদ্ধতি-৬ : সালাতকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার উপযুক্ত করুন:

একটু লক্ষ্য করুন, আপনি যেই সালাত আদায় করছেন তা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য কতটুকু সুন্দর হয়েছে। কী পরিমান সুন্দর হওয়া উচিত ছিল।

পদ্ধতি-৭ : মানবিক প্রয়োজন সমাধান করুন:

পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে সালাতে দাড়াঁনো ঠিক নয়। পেশাব-পায়খানা এবং অন্যান্য প্রয়োজন সমাধান করে সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো উচিত। নতুবা খুশু-খুযূ আসবে না।

পদ্ধতি-৮ : আমি তো মহান আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি:

একথা ভাবুন, দুনিয়ার রাজা-বাদশার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেউ অন্য মনস্ক হয় না। তাহলে আমি সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি, তাহলে আমি অন্য মনস্ক হই কীভাবে?

পদ্ধতি-৯ : আযানের পর দুআ পাঠ করা।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ اَلدَّعْوَةِ اَلتَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ اَلْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا اَلْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا اَلَّذِىْ وَعَدْتَهُ

আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দায়ওয়া তিত তা-ম্মাহ, ওয়াছ ছালাতিল ক্বায়িমাহ, আতি মুহাম্মাদা নিল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাযিলাহ, ওয়াব আছহু মাক্বামাম মাহমুদা। আল্লাযী ওয়াত তাহ।

হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিতি সালাতের মালিক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসীলা (নৈকট্য) এবং মহা মর্যাদা। তাঁকে উন্নীত করুন সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাঁকে ওয়াদা করেছেন।[১৫২]

পদ্ধতি-১০ : ওযূর পূর্বের দুআ পাঠ করা:

بِسْمِ اللهِ / بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

বিছমিল্লাহ / বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

আল্লাহর নামে / পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।[১৫৩]

নোট: ওযূর আগে এই দুআ ছাড়া অন্য কোনো দুআ নেই। অথচ আমাদের দেশে অনেকে নাওয়াইতু আন.... ইত্যাদি দুআ পড়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হাদীসে এমন কিছুই নেই।

---

[১৫২] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬১৪

[১৫৩] আবু দাউদ, হাদীস-১০২

পদ্ধতি-১১ : সালাতের মাসআলা এবং ফযিলতের প্রতি লক্ষ্য রাখা:

সালাতে দাড়াঁনোর সময় একথা লক্ষ্য রাখা ভালো যে, সালাত আদায় করার সময় কিছু কাজ আছে যা সালাত নষ্ট করে দেয়। আবার কিছু কাজ এমনও আছে যা সালাতকে নষ্ট করে না, তবে সালাতের সওয়াবকে কমিয়ে দেয়। সালাতের অনেক ফযিলত থেকে কিছু ফযিলত মুখস্ত রেখে তা সালাত আদায়ের সময় লক্ষ্য করলে আশা করা যায় সালাতের মধ্যে খুশু-খুযূ সৃষ্টি হবে।

পদ্ধতি-১২ : ওযূর শেষের দুআ পাঠ করা:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، واجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবীন। ওয়াজ আলনী মিনাল মুত্বা ত্বাহ্হিরীন।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করো।[১৫৪]

ফযিলত: যে এই দুআ পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।[১৫৫]

পদ্ধতি-১৩ : সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন এবং আরামদায়ক পোশাক পরিধান করা:

মহান আল্লাহ বলেন-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

হে আদম সন্তান! যখনই তোমরা কোনও মসজিদে আসবে তখন নিজেদের শোভার বস্তু (পোশাক) নিয়ে আসবে।[১৫৬]

পদ্ধতি-১৪ : দৃষ্টিকে সালাতের সাজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা। প্রয়োজনে সুতরা ব্যবহার করা।

পদ্ধতি-১৫ : জামাতে সালাত আদায় করলে কাতার সোজা করে দাড়াঁনো।

পদ্ধতি-১৬ : সালাতের পূর্ব থেকেই মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করা।

---

[১৫৪] তিরমিযি, হাদীস-৫৫

[১৫৫] তিরমিযি, হাদীস-৫৫

[১৫৬] সূরা আরাফ, আয়াত-৩১

পদ্ধতি-১৭ : সালাতের মধ্যে হাই এলে সাধ্যমতো ঠেকানো উচিত।

পদ্ধতি-১৮ : যে সব সালাতের পূর্বে সুন্নত আছে তা আদায় করা।

পদ্ধতি-১৯ : সালাতের প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।

পদ্ধতি-২০ : খাবার প্রস্তুত থাকলে তা খেয়ে সালাতে দাড়াঁনো।

পদ্ধতি-২১ : প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়া।

পদ্ধতি-২২ : সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করা।

পদ্ধতি-২৩ : আযানের জবাব দেওয়া।

পদ্ধতি-২৪ : সুগন্ধি ব্যবহার করা।

পদ্ধতি-২৫ : সুর দিয়ে পড়া।

নোট: সালাতের মধ্যে খুশু-খুযূ সৃষ্টি করার জন্য আরও কিছু কাজ আছে। এখানে আমরা যা উল্লেখ করেছি এগুলো থেকে প্রথমে দুটি বা তিনটি করে আমলের চেষ্টা করা উত্তম। এগুলো সালাতের মধ্যে আয়ত্বে আসার পর আরও কয়েকটি আমল করার চেষ্টা করা। এভাবে ক্রমান্বয়ে সবগুলো আমল হয়ে যাবে। তখন সালাত অনেক সুন্দর হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে সবগুলো পদ্ধতিকে একসাথে অনুসরণ করার চেষ্টা করলে মস্তিষ্কের উপর অধিক চাপ সৃষ্টি হবে। যা ঠিক হবে না। কারণ মস্তিষ্কের উপর অধিক চাপ সৃষ্টি করলে মস্তিষ্কে শুষ্কতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সালাত আদায়ের পদ্ধতি

যখন তুমি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে, তখন কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। যে সালাত আদায়ের ইচ্ছা করেছো তা মনে মনে নিয়্যত করবে। কত রাকাত পড়বে তাও মনের মধ্যে স্থীর করবে। নিয়্যত করার জন্য মুখে বাংলা বা আরবিতে কিছু বলতে হবে না। নিয়্যত করার পর তোমার উভয় হাত কানের উভয় কানের বরাবর তুলবে। অত:পর বলবে, আল্লাহু আকবার। বলার সাথে সাথে হাতকে নাভীর নীচে বাম হাত রাখবে এবং বাম হাতের উপর ডান হাতকে রাখবে। অত:পর চুপিসারে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

(ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রা কাছমুকা, ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুক।) দুআটি পড়বে। এরপর চুপিসারে পড়বে-

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানীর রাজীম, বিছমিল্লাহির রহমানীর রাহীম)

এরপর সূরা ফাতিহা পড়বে। সূরা ফাতিহা পড়া শেষ হলে চুপিসারে আমীন বলবে। অত:পর কোনো একটি সূরা বা কমপক্ষে তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত পড়বে। এরপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে। রুকুতে গিয়ে মাথা, পিঠ এবং কোমর বরাবর সমান রাখার চেষ্টা করবে। উভয় হাতের আঙ্গুল ফাঁকা রেখে হাঁটু ধরবে। রুকুতে থাকা অবস্থায় তিনবার বলবে-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

(ছুবহা-না রাব্বীয়াল আযীম, ওয়া বিহামদিহি।)[১৫৭]

এরপর তিনবার

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

(ছামিয়াল্লা হুলিমান হামিদাহ।)[১৫৮]

বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং দাঁড়ানো অবস্থায় বলবে-

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(রাব্বানা লাকাল হামদ্।)[১৫৯]

সালাত আদায়কারী ব্যক্তি মুক্তাদী হয়ে থাকলে ছামিয়াল্লা হুলিমান হামিদাহ বলবে না। বরং শুধু রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে।

[১৫৭] আবু দাউদ, হাদীস-৮৭১ এবং ৮৭০

[১৫৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৭৩৩

[১৫৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-৭৩৩;

তারপর তাকবীর বলে উভয় হাটু অত:পর উভয় হাত, অত:পর নাক এবং কপালকে মাটিতে রাখবে। মাটিতে রাখার সময় নাক এবং কপালকে দুই হাতের মাঝখানে রেখে সাজদাহ দেবে।

মানুষের ভীর না হলে বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদেশ এবং পেট উরুদ্বয় থেকে দূরে রেখে নাক ও কপাল দ্বারা শান্ত চিত্তে সাজদাহ করবে। তবে মহিলারা বাহুদ্বয়কে দূরে না রেখে একত্রে রেখে সাজদাহ করবে। আর সাজদার সময় হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। এরপর তিনবার বলবে-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

(ছুবহা-না রাব্বীয়াল আয়্লা।)[১৬০]

এরপর তাকবীর বলে প্রথম সাজদা থেকে মাথা উঠাবে। দুই হাতকে উভয় উরুর উপর রাখবে। স্থীর হয়ে বসবে। এরপর দ্বিতীয় সাজদা করবে। দ্বিতীয় সাজদাতেও তিনবার বলবে-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

(ছুবহা-না রাব্বীয়াল আয়্লা।)[১৬১]

এরপর আর না বসে তাকবীর বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়ানোর সময় হাত দিয়ে জমিনে ভর দিবে না। এতোক্ষণে সালাতের প্রথম রাকাত সম্পন্ন করা হলো। এভাবে প্রথম রাকআতে যা করা হয়েছে, দ্বিতীয় রাকাতের তা করতে হবে। তবে দ্বিতীয় রাকআতে কখনো হাতকে কান বরাবর উঠাবে না এবং চুপিসারে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

(ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রা কাছমুকা, ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুক।) দুআটি পড়বে না। আর চুপিসারে-

[১৬০] আবু দাউদ, হাদীস-৮৭১ এবং ৮৭০

[১৬১] আবু দাউদ, হাদীস-৮৭১ এবং ৮৭০

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানীর রাজীম, বিছমিল্লাহির রহমানীর রাহীম) এইগুলোও পড়বে না।

এভাবে দ্বিতীয় রাকাতের সাজদা শেষ করার পর বাম পা বিছিয়ে দেবে। বাম পায়ের উপরই বসবে। ডান পা খাড়া করে রাখবে। উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখবে। তখন দুই হাতকে উভয় উরুর উপর রাখবে। তখন আঙ্গুলগুলোকে খুলে রাখবে। মিলিয়ে রাখবে না।

এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত এই তাশাহহুদটি পড়বে-

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ ছালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু, আছছালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ, আছছালামু আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল্লাহিছ ছোয়ালিহীন, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।[১৬২]

আর তাশাহহুদটি পড়ার সময় যখন লা-ইলাহা- বলবে তখন শাহাদাত (ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নিকটবর্তী) আঙ্গুলটি উঠিয়ে ইঙ্গিত করবে (আল্লাহ এক)। আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুলকে নামিয়ে ফেলবে। যদি সালাত দুই রাকাত বিশিষ্ট হয়, যেমন ফজরের সালাত বা অন্য কোনো দুই রাকাত বিশিষ্ট সালাত, তাহলে তাশাহহুদ পাঠ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করবে। দরুদ হলো এই-

১৬২ সহীহ বুখারী, হাদীস-৭৩৮১

اللّٰهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ؛ اللّٰهمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।[১৬৩]

এরপর কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত যে কোন দুআ করা যায়। হযরত আবু বকর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি দুআ শিক্ষা দিন যা আমি সালাতের মধ্যে পড়তে পারি। তখন তিনি বললেন, তুমি সালাতের মধ্যে এই দুআটি পড়বে।

اللّٰهمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফছী যুলমাং কাছিরা, ওয়ালা ইয়াগ ফিরুয যুনূবা ইল্লা আংতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইংদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আংতাল গাফূরুর রাহীম।[১৬৪]

এরপর সালাম ফিরাবে। সালাম হলো-

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রথমে ডান দিকে সালাম ফিরাবে। তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাবে। সালাম ফিরাবার সময় নিকটস্থ সালাতরত ব্যক্তি এবং ফিরিশতাদের নিয়্যত করবে।

১৬৩ সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৩৭০

১৬৪ সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৩৪

আর যদি সালাত তিন রাকাত বিশিষ্ট হয়, তাহলে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু...) পাঠ করার পর আর কিছুই পাঠ করা যাবে না। বরং এরপর তৃতীয় রাকাতের জন্য তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে যাবে। তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এরপর যথা নিয়মে রুকু, সাজদা সম্পন্ন করে বসবে। পূর্বের নিয়মে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদে ইবরাহীম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. থেকে বর্ণিত দুআটি পড়ে সালাম ফিরাবে।

আর যদি সালাত চার রাকাত বিশিষ্ট হয়, তাহলে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু...) পাঠ করার পর আর কিছুই পাঠ করা যাবে না। বরং এরপর তৃতীয় রাকাতের জন্য তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে যাবে। তৃতীয় রাকাত এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। যদি ফরয সালাত হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করবে না। আর যদি ফরয সালাত না হয়, তাহলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করতে হবে। এরপর যথা নিয়মে রুকু, সাজদা সম্পন্ন করে বসবে। পূর্বের নিয়মে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদে ইবরাহীম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. থেকে বর্ণিত দুআটি পড়ে সালাম ফিরাবে।

সালাতের রহস্য

মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে যত ইবাদত করার আদেশ করেছেন এর মধ্যে সালাত এতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যার তুলনা মেলে না। কারণ হচ্ছে সালাতের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদের মিনার থেকে আহ্বান করা হয়। আমরা যদি সেই আহ্বানে সঠিক নিয়ম মেনে সাড়া দিতে না পারি তাহলে আমাদের দ্বারা ইসলামের অন্যান্য কাজে সফলতার আশা করা যায় না। হয়তো কেউ এই কথাটি সহজে মানতে নারাজ। কিছুটা অবাস্তব বলে মনে হতেও পারে কারো কাছে। এই জন্য আমি একটি উদাহরণের মাধমে আপনাদের হৃদয়ে ঐ কথাটির বাস্তবতা তুলে ধরতে চাই।

যারা পুলিশ কিংবা সৈনিক ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করেছেন তারা খুব ভালো করে জানেন যে, প্রত্যেক পুলিশ কিংবা সৈনিক চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়ার

আগে তাকে অনেক কঠোরতার সাথে ট্রেনিং করতে হয়। ট্রেনিং করানোর সময় অফিসার দিনে-রাতে কয়েকবার বিউগল বাজিয়ে তাদেরকে একত্রিত করেন। কর্মজীবনের দায়িত্ব পালনের কলা-কৌশল, নিয়ম-নীতি সফলতা এবং ব্যর্থতার কারণ বুঝিয়ে দেন। অফিসারের বিউগলের সংকেতের মাধ্যমে সৈনিকগণ বুঝে নিতে পারেন এই সংকেতের মাধ্যমে অফিসার তাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং কোন স্থানে একত্রিত হওয়ার অর্ডার করেছেন। এভাবে একজন অফিসার প্রতিদিন কয়েকবার বিউগল বাজিয়ে এবং সংকেত দিয়ে তার সৈনিকগণকে অভ্যস্ত করিয়ে থাকেন। কোনো সৈনিক যদি অফিসারের বিউগলের আওয়াজ শোনে এবং সাংকেতিক ইঙ্গিত পেয়েও অক্ষম ও নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে তখন অফিসার বুঝে নেন যে ঐ সৈনিক কর্মজীবনের দায়িত্ব পালনে অযোগ্য। অফিসার প্রথমেই তাকে বরখাস্ত করেন। তেমনিভাবে মসজিদের মিনার থেকে প্রতিদিন পাঁচবার আযানের মাধ্যমে বিউগল বাজানো হয়। এই বিউগলের আওয়াজ শোনে সকল মুমিনগণ সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে। তারা কুরআনে বর্ণিত জুন্দুল্লাহ বা আল্লাহর সৈনিক। সৈনিকগণ যদি মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেন তাহলে প্রমাণ হবে তারা আল্লাহর জমিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করতে পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত আছেন।

আমরা উপরে উল্লেখিত উদাহরণের বাস্তবতা দেখতে পাই সালাতের মধ্যে সতর্কতা এবং কঠোর নিয়ম-নীতি পালনের মধ্যে। কারণ, একজন মুমিন সালাতে আল্লাহু আকবার বলে হাত উপরের দিকে উত্তোলন করে। এতে সে নিজের শক্তি, বাহাদুরী সবকিছুর ব্যপারে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে। তারপর দুহাত বেধেঁ অপরাধী গোলামের মতো নত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি নিবন্ধ রাখে সাজদার দিকে। মুখ দিয়ে মহান আল্লাহর গুণগান গাইতে থাকে। স্বীকার করে নিজের অপরাধের কথা। তখনো সে তার শরীরকে সামান্য নড়চাড়া করতে দেয় না। যখন সে রুকুতে যায় তখন অপমানিত গোলামের মতো আস্তে আস্তে রুকুতে যায়। তখনও সে বলে আল্লাহু আকবার। রুকুতে গিয়েও সে মহান আল্লাহর গুণগান গাইতে ভুলে না। সে বলে সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁর প্রশংসা-সহ।

এভাবে রুকু থেকে উঠে খুব ধীরে ধীরে। তখনও সে মহান আল্লাহর গুণগান গাইতে থাকে। এক পর্যায়ে সে সাজাদাতে গিয়ে তার দেহের সর্বোচ্চ সম্মানী স্থান কপালকে মাটিতে লাগিয়ে গোলামীর চোরান্ত পর্যায়ের বহি:প্রকাশ করে থাকে। নাক মাটিতে লাগাতেও কুণ্ঠিত হয় না। এভাবে একজন মুমিন সালাতে দাঁড়ানোর সময় থেকে নিয়ে কপাল এবং নাক মাটিতে লাগানো পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে সে এ কথার প্রমাণ দেয় যে, সে মহান আল্লাহর অনুগত একান্ত বিনয়ী একনি গোলাম। এই গোলাম তার মহান রবের পক্ষ থেকে বিউগল বাজানো হলে সে প্রস্তুত। সে মহান রবের প্রেরিত ধর্মের সৈনিক। মহান আল্লাহর অনুগত গোলাম।

সালাতের গুরুত্ব

সালাত আদায়ের গুরুত্ব অনেক। আমরা কুরআন-হাদীস থেকে সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ এবং তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানের পর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সর্বপ্রথম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দায়িত্বটি অর্পিত হয়- তা হলো সালাত। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গাতে ঈমান ও তাওহীদের পর প্রথম ফরয আমল হিসেবে সালাতের কথা আলোচনা হয়েছে। সূরা বাকারার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে হিদায়াত অর্জনকারী দলের বর্ণনা করত:

১. আল-কুরআনের শুরুতেই সালাতের নির্দেশ:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে।[১৬৫]

কুরআনের অন্যত্রে যারা ঈমান গ্রহণ করে না এবং সালাত আদায় করে না তাদের উভয়ের অপরাধের কথা একই বিন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

[১৬৫] সূরা বাকারা, আয়াত-৩

মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى

তারা ঈমানও গ্রহণ করে না এবং সালাতও আদায় করে না।[১৬৬]

২. একনিষ্ঠভাবে সালাত আদায়ের নির্দেশ:

মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয় নি যে, তারা খাঁটি মনে করে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। এটাই সঠিক ধর্ম।[১৬৭]

সূরা বায়্যিনাতে তাওহীদের আলোচনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামগণের দাওয়াতের দ্বিতীয় বিষয় বস্তু হিসাবে সালাতকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. যত্নসহকারে সালাত আদায়ের নির্দেশ:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

তোমরা সমস্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের ব্যপারে। আর মহান আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।[১৬৮]

৪. সালাত কায়েমের জন্য সন্তানের প্রতি আল্লাহর ওলী হযরত লুকমানের নছিহত:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ()

[১৬৬] সূরা কিয়ামাহ, আয়াত-৩১

[১৬৭] সূরা বায়্যিনাহ, আয়াত-৫

[১৬৮] সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৩৮

হে আদরের সন্তান! তুমি সালাত কায়েম করো। মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করো। মন্দ কাজে বারণ করো। তোমার কষ্ট দেখা দেয় তাতে ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ।[১৬৯]

৫. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবেঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সালাতের হিসাব দিতে সক্ষম হবে, সেই সফল হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিসাব দিতে পারবে না সে ধ্বংস হবে।[১৭০]

৬. সুন্দরভাবে সালাত পালন করলে গোনাহ ক্ষমার প্রতিশ্রুতিঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ঐ সালাতের জন্য উত্তমভাবে ওযূ করেছে এবং সময় মতো সালাতগুলো আদায় করেছে, সঠিকভাবে বিনয়ের সাথে রুকু করেছে, তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। আর যারা এমন করবে না তার জন্য আল্লাহর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন, নতুবা তাকে শাস্তি দিবেন।[১৭১]

---

[১৬৯] সূরা লুকমান, আয়াত- ১৭

[১৭০] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪১৩

[১৭১] আবু দাউদ, হাদীস-৪২৫

সালাতের সাধারণ ফযিলত

সালাত আদায়ের ফযিলত অনেক। আমরা কুরআন-হাদীস থেকে সালাতের ফযিলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

১. সালাত কায়েমকারীগণ প্রকৃত মুত্তাকীনঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ () الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ()

এটি এমন কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত এমন মুত্তাকীনদের জন্য যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে। আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[১৭২]

২. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার সর্বোত্তম পদ্ধতি সালাতঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।[১৭৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় মহান আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।[১৭৪]

৩. সালাত পালনকারীদের ভয় থাকবে নাঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ()

---

[১৭২] সূরা বাকারা, আয়াত- ২ ও ৩

[১৭৩] সূরা বাকারা, আয়াত-৪৫

[১৭৪] সূরা বাকারা, আয়াত- ১৫৩

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে তারা তাদের রবের কাছে নিজেদের প্রতিদান লাভের উপযুক্ত হবে। তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা কোন দুঃখও পাবে না।[১৭৫]

৪. সালাত কায়েমকারীদেরকে মহা প্রতিদান দেওয়া হবে:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ()

যারা সালাত কায়েমকারী, যাকাত দাতা, আল্লাহ এবং পরকাল দিবসে বিশ্বাসী, এরাই হল তারা যাদেরকে আমি মহা প্রতিদান দান করব।[১৭৬]

৫. সালাত কায়েমকারীদের সঙ্গে মহান আল্লাহ আছেন:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ

মহান আল্লাহ বলে দিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম করো। যাকাত আদায় করো। আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনে থাকো এবং তাদের সঙ্গে মর্যদাপূর্ণ আচরণ করে থাকো।[১৭৭]

৬. সালাত আদায়কারীগণ মহান আল্লাহর পরম বন্ধু:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ()

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ, যারা আল্লাহর সামনে বিনীত হয়ে সালাত আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে।[১৭৮]

---

[১৭৫] সূরা বাকারা, আয়াত- ২৭৭

[১৭৬] সূরা নিসা, আয়াত- ১৬২

[১৭৭] সূরা মায়িদা, আয়াত- ১২

[১৭৮] সূরা মায়িদা, আয়াত- ৫৫

৭. সালাত আদায়কারীগণ প্রকৃত মুমিন:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ () أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ()

যারা সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।[১৭৯]

৮. সালাত আদায়কারীদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যদা:[১৮০]

৯. সালাত আদায়কারীদের জন্য রয়েছে ক্ষমা:[১৮১]

১০. সালাত আদায়কারীদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক রিযিক:[১৮২]

১১. সালাত আদায়কারীরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ()

নি:সন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি একা সালাত কায়েম করেছে ও যাকাত প্রদান করেছে। আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অত্রএব অবশ্যই তারা হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।[১৮৩]

১২. সালাত আদায়কারীর উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ()

---

[১৭৯] সূরা আনফাল, আয়াত- ৩ ও ৪

[১৮০] সূরা আনফাল, আয়াত- ৪

[১৮১] সূরা আনফাল, আয়াত- ৪

[১৮২] সূরা আনফাল, আয়াত- ৪

[১৮৩] সূরা তাওবা, আয়াত- ১৮

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদের উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।[১৮৪]

১৩. সালাত পাপকে মিটিয়ে দেয়:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ()

হে নবী! আপনি দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় পূণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ মানে তাদের জন্য এটি একটি উপদেশ।[১৮৫]

১৪. সালাত জিবিকার নিশ্চয়তা প্রদান করে:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ()

আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে জিবিকা চাই না। আমি আপনাকে জিবিকা দেই এবং আল্লাহ ভীরুতার পরিণাম শুভ।[১৮৬]

১৫. খুশু-খুযুসহ সালাত আদায় করলে সফলতা নিশ্চিত:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ () الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (

[১৮৪] সূরা তাওবা, আয়াত- ১৬২

[১৮৫] সূরা হুদ, আয়াত-১১৪

[১৮৬] সূরা তোয়াহা, আয়াত- ১৩২

নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ, যারা তাদের সালাতে আন্তরিকভাবে বিনীত (খুশু-খুযূসহ সালাত আদায়কারী)।[১৮৭]

১৬. সালাত রহমত পাবার নিশ্চয়তা দেয়:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ()

তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো। তোমরা অবশ্যই রহমত প্রাপ্ত হবে।[১৮৮]

১৭. সালাত অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ()

হে নবী! ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে। তা তিলাওয়াত করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকির তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস।[১৮৯]

১৮. নিয়মিত সালাত কৃপণতার শিকল থেকে মুক্তি দেয়:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا () إِلَّا الْمُصَلِّينَ ()

আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা ব্যতিক্রম, যারা সালাত আদায়কারী।[১৯০]

১৯. গোসল যেভাবে ময়লা দূর করে দেয় সালাতও গোনাহকে দূর করে দেয়:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

[১৮৭] সূরা মুমিনুন, আয়াত- ১ এবং ২

[১৮৮] সূরা নূর, আয়াত- ৫৬

[১৮৯] সূরা আনকাবূত, আয়াত- ৪৫

[১৯০] সূরা মায়ারিজ, আয়াত- ২১ এবং ২২

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَٰلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا

ঐ ব্যক্তির ব্যপারে তোমাদের মন্তব্য কি, যার দরজার সামনে একটি নদী থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার গায়ে কোনো ময়লা থাকবে? সাহাবিগণ বললেন, না, তার গায়ে কোনো ময়লা থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও তার (পাঁচবার গোসলের) মতো। মহান আল্লাহ এর দ্বারা (পাঁচবার সালাত আদায়ের দ্বারা) বান্দার গুনাহ মিটিয়ে দেন।[১৯১]

২০. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মধ্যবর্তী সময়ে সংঘঠিত গুনাহকে মুছে দেয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তাদের সমস্ত (ছগীরা অর্থাৎ ছোট-খাট) গুনাহকে মুছে দেয়। (যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং নিয়মিতভাবে জুমআ আদায় করেন।)[১৯২]

২১. পাচঁ ওয়াক্ত সালাত জান্নাতের গ্যারান্টি:

হাদীসে এসেছে-

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

[১৯১] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫২৮

[১৯২] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৩

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন, যে তা আদায় করবে তার জন্য মহান আল্লাহ্ তায়ার পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তা আদায় করবে না তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, তিনি যদি চান তাকে শাস্তি দিবেন, আর যদি চান ক্ষমা করবেন।[১৯৩]

সালাত থেকে আমাদের শিক্ষা

সালাত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা কুরআনুল কারীমের মধ্যে একটু মনোযোগ দিলেই দেখতে পাই যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বারবার বলেছেন, তোমরা সালাত কায়েম করো। কিন্তু সালাত কায়েমের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত আছে। এর মধ্যে একটি অভিমত হল জামাতের সাথে সালাত আদায় করা হলে সেই সালাত হল ইকামতে সালাত। অর্থাৎ কেউ যদি জামাতের সাথে সালাত আদায় করে তাহলে সে সালাত কায়েম করল। যদি সালাত কায়েম হয় অর্থাৎ জামাতের সাথে সালাত আদায় করা হয় তাহলে সেই সালাত থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। যেমন-

১. আদর্শবান নেতা নির্বাচন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়:

সালাত আমাদেরকে একজন আদর্শবান নেতা নির্বাচন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। কেননা, আমরা সালাতের জন্য একজন ইমাম নিয়োগ করি। সেই নিয়োগের সময় ইমাম সাহেবের লেখা-পড়া, গলার স্বর, শারীরিক কাঠামো কতটুকু পছন্দনীয় সেটা লক্ষ্য করে থাকি। এসব গুণাবলী পছন্দ হলেও তাকে আবার যাচাই শুরু করি। আমরা ইমাম সাহেবের কমনসেন্স কতটুকু আছে সেটাও টেস্ট করি। সবশেষে তার পেছনের ইতিহাস কী ছিল সেটা জানার চেষ্টা করি। এক পর্যায়ে সার্বিক দিক থেকে উপস্থিত কিংবা ইমাম ও খতিব পদের প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে ভালো এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী আমরা তাকে ইমাম ও খতিব নির্বাচন করি। যেভাবে আমরা একজন ইমাম ও খতিব নির্বাচন করি বিভিন্নভাবে যাচাই-বাছাই করে এবং তার পেছনের ইতিহাস জেনেশুনে ঠিক তেমনিভাবে আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতা

[১৯৩] আবু দাউদ, হাদীস- ১৪২২

নির্বাচনের সময়ও সেই বিষয়গুলোকে লক্ষ্য রেখে নেতা নির্বাচন করা উচিত। তাহলে আশা করা যায় দেশের জনগণের সম্পদ রক্ষা হবে দূর্নীতিবাজদের কালো হাত থেকে। জনগণ তাদের সঠিক অধিকার পাবে।

২. আদর্শবান নেতার আনুগত্য শিক্ষা দেয়ঃ

সালাতের শিক্ষা শিরোনামে এ কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, সালাত আমাদেরকে আদর্শবান নেতা নির্বাচন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। যখন এবজন আদর্শবান নেতা নির্বাচন করা হবে তখন তাঁর আনুগত্য করা জরুরী হয়ে পড়ে। সালাত আমাদেরকে এ কাজটি সুন্দর করে শিক্ষা দেয়। কেননা আমরা যখন সালাতে দন্ডায়মান হই তখন ইমাম সাহেব হাত উত্তোলন করার পূর্বে আমরা হাত উত্তোলন করি না। আবার ইমাম সাহেব উত্তোলন করার পর আমরা হাত উত্তোলন করতে বিলম্ব করি না। এভাবে সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কাজে ইমাম সাহেবের আনুগত্য করে থাকি। এতে আমরা একজন আদর্শবান ইমামের আনুগত্যের মাধ্যমে একজন আদর্শবান নেতা আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করি।

৩. নীতির ভিত্তিতে নেতার ভুল ধরতেও শিক্ষা দেয়ঃ

আমরা সালাতে ইমামের আনুগত্য এবং অনুস্বরণ করি। কিন্তু ইমাম সাহেব যদি এমন কোনো মারাত্মক ভুল করেন যে ভুলের কারণে সালাত একেবারে নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা ইমাম সাহেবকে তার ভুলের কারণে পেছন থেকে সিগন্যাল প্রদান করি। ভুলের কারণে সিগন্যাল দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। ইমাম সাহেবও তার ভুল ধরার কারণে রাগ করেন না। ক্ষিপ্ত হন না তার অনুসারীদের উপর। ঠিক তেমনিভাবে একজন নেতা যদি প্রকৃত সালাত আদায়কারী হয়ে থাকেন তিনিও দেশ ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ভুল করতে পারেন এবং কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে তিনিও রাগ করবেন না যদি তার কোনো অনুসারী তার কাজের কোনো ক্ষেত্রে ভুল ধরিয়ে দেয়। ভুল হতেই পারে। ভুল ধরিয়ে দেওয়া অনুসারীদের দায়িত্ব এবং ভুল সংশোধন করা নেতার দায়িত্ব।

৩. শৃঙ্খলিতভাবে জীবন-যাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ঃ

সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ ধাপে ধাপে শেষ করা হয়। কোন একটি আগে করা যায় না যে কাজটি পরে করার নিয়ম। আবার যে কাজটি পরে করতে হবে সে কাজটি আগে করা যায় না।

৪. সময়ের সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেয়ঃ

প্রতিটি মুমিন সঠিক সময়ে সালাত আদায় করতে হবে। সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা ফরয।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (٠)

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।[১৯৪]

মুমিনগণ সঠিক সময়ে আদায়ের জন্য দৈনিক পাঁচবার মসজিদে উপস্থিত হন। এভাবে প্রতিদিন সে সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে করার জন্য মানসিকভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন কোনো করার জন্য ভিন্ন কোনো সময়ে করবে বলে সে অলস হয়ে বসে থাকে না। তবে আমাদের দেশে সালাত আদায়ের সময়ের ব্যপারে একটা ভুল ধারণা আছে। সেটা হল, মুসল্লীগণ মসজিদে গিয়ে বারবার ঘরির দিকে তাকাতে থাকেন। সালাতের সময়সূচীর নির্ধারীত সময় হওয়ার পর তখন ১০ সেকেন্ট সময় বিলম্ব করতে নারাজ। অস্থীর হয়ে পড়েন অনেকেই। কেউ কেউ আদবের শালীনতা ছেড়ে দিয়ে ইমাম সাহেবকে কর্কশ ভাষায় ডাকাডাকি শুরু করে থাকে। এগুলো অন্যায়। এখানে সূচীতে নির্ধারীত সময়েই সালাতে দাঁড়ানো ফরয নয়। সামান্য পরে দাঁড়ালেও কোনো অসুবিধা নেই। যে সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করা ফরয তা হচ্ছে সালাতের সময় হওয়ার পর থেকে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করা ফরয। এই কথা অনেকে না জানার কারণে অন্যায় এবং ভুলের স্বীকার হয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন।

৫. সালাত আমাদেরকে বিনয় অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়ঃ

প্রতিটি মুমিন মহান আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য। বিশেষ করে আমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে মহান আল্লাহকে একটু বেশিই স্মরণ করে থাকি। তখন আমাদের হৃদয় কোমল থাকে। অন্তরে বিনয় লালিত হয়। কেউ একটু কটু কথা বললেও আমরা রাগান্বিত হই না। ক্ষিপ্ত হই না। মনে ভাবতে থাকি আল্লাহর কাজে

[১৯৪] সূরা নিসা, আয়াত- ১০৩

এসে রাগ করা বা ক্ষিপ্ত হওয়া অনুচিত। এমনকি কারও পা আমাদের পায়ের সঙ্গে লেগে গেলেও আমরা পাল্টা পা লাগিয়ে দেই না। এগুণ বিনয়ের গুণ। বিনয়ী হওয়ার কারণেই আমরা অন্যায়ের স্বীকার হওয়া সত্বেও কাউকে তখন আক্রমন করি না। এভাবে একজন মুমিন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে গিয়ে বিনয়ের স্বভাব অর্জনের প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এই প্রশিক্ষণ সালাতের বাইরে এবং মসজিদের বাইরেও কাজে লাগাতে পারলে সামাজিক অশান্তি অনেক কমে যেত। সমাজ হয়ে উঠত আলোকিত।

৬. সালাত সামাজিক জীবনে বৈষম্য দূর এবং পরষ্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয়:

বর্তমানে আমাদের দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা বড় অদ্ভুত। কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে ধনী-গরীব পরষ্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকলে অনেক ধনী ব্যক্তিরা গরীবদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। অনুষ্ঠানে গেলে গরীবের পাশে বসতে অনীহা বোধ করে। এভাবে অনেক ক্ষেত্রে গরীবদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয়। গরীবদেরকে যথাযথভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে নিতে পারে না। অথচ এ ধনী ব্যক্তিরাই মসজিদে গিয়ে সালাতে দাঁড়ালে তখন কে গরীব আর কে ধনী সেটা বিবেচনা করে না। এমনকি কোনো গরীবের পা যদি ধনী ব্যক্তির পায়ের সাথে লেগে যায় তবুও গরীবের প্রতি ক্ষিপ্ত হয় না। মসজিদে সালাতের মধ্যে ধনী-গরীব পরষ্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যেভাবে আবদ্ধ হয়ে একই কাতারে একসঙ্গে দাঁড়াতে পারে সেই শিক্ষা সালাত থেকে নিতে পারলে আমাদের সামাজিক জীবনে এতো বৈষম্য থাকতো না।

৭. সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিপরীতে শান্তি কামনা শিক্ষা দেয়:

আমরা সালাতের শেষে ডানে-বামে সালাম প্রদান করি। এই সালামের অর্থ হল, আপনার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। এই ঘোষনার মাধ্যমে একজন সালাত পালনকারী ব্যক্তি অপরকে এ কথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, আপনি আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ। কারণ যে ব্যক্তি অন্য জনের শান্তি ও রহমত কামনা করে সে ঐ ব্যক্তির জন্য ত্রাসের কারণ হতে পারে না। অন্যজনের মনের মধ্যে আতঙ্কেরও কারণ হতে পারে না। সে তো সালাম প্রদানের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির শান্তি কামনা করছে। সুতরাং সালাত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিতে শিক্ষা দেয়। অন্যজনের শান্তি কামনা করতে শিক্ষা দেয়।

৮. সর্বদা গোনাহ থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ:

আমরা সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করি। মসজিদ অবশ্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান। মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের প্রিয়নবী জনাব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে কোনো নবীর জন্য মসজিদ ব্যতীত অন্য স্থানে সালাত আদায় করার অনুমতি ছিল না। একমাত্র আমাদের নবীর জন্যই মসজিদ ছাড়াও যে কোন স্থানে সালাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

হাদীসে এসেছে-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয় নি। ১. আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। ২. সমস্ত জমিনকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াক্ত হয় সেখানেই যেন সালাত আদায় করে নেয়। ৩. আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে। ৪. অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। ৫. আমাকে ব্যাপক শাফায়াতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।[১৯৫]

উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা গেল যে, আমরা যে সব মসজিদে সালাত আদায় করি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবশ্যই মসজিদ এবং উত্তম স্থান। মসজিদ ছাড়া মসজিদের বাইরের অংশ শরয়ী মসজিদ না হলেও আমাদের

[১৯৫] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৪৩৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত বুখারীর হাদীস- ৪২৫

নবীর জন্য এবং আমাদের জন্য সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে মসজিদের বিধান বা সালাত আদায়ের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাহলে এ কথা বলা যায় যে, আমরা যে মসজিদে সালাত আদায় করি এর মর্যাদা বেশি হলেও আকারে ছোট। আর মসজিদের বাইরের বিশাল অংশটি মর্যাদা এবং সাওয়াবের দিক থেকে অনেক কম এবং ছোট হলেও আকারের দিক থেকে অনেক বড়। সুতরাং আমরা আকারের দিক থেকে ছোট মসজিদে গিয়ে এ কথা বিশ্বাস করি এবং হৃদয়ে লালন করি যে মসজিদে গিয়ে মিথ্যা কথা বললে, অন্যায় করলে, খুন-খারাবী করলে অনেক গোনাহ হবে এবং মহান আল্লাহ দেখবেন। কিন্তু আকারের দিক থেকে অনেক বড় মসজিদ হলো মসজিদের বাইরের অংশ। এই বড় অংশে আমরা খুন-খারাবী, মারামারি, মিথ্যা কথা বলা, অন্যায় করাসহ যাবতীয় পাপে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। অথচ আমরা যদি মসজিদে গিয়ে সালাতের শিক্ষা নিতে পারতাম তাহলে মসজিদে গিয়ে যেভাবে গোনাহ থেকে মুক্ত থাকি মসজিদের বাইরেও সেভাবে গোনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারতাম।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সালাতের উল্লেখিত শিক্ষা এবং অন্যান্য শিক্ষা যথাযথভাবে গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সালাতের বহুবিধ উপকারীতা

সালাতের মধ্যে স্বাস্থ্যগত বহুবিধ উপকারীতার বিবরণ:

সালাতের একাধিক শারীরিক ও শরীর বৃত্তীয় উপকারীতা রয়েছে। সালাতের সময় শরীরের অধিকাংশ পেশী এবং জয়েন্টগুলোর ব্যায়াম হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো রুকু-সাজদার শারীরিক নড়াচড়া, হাত-পায়ের, পেছনের এবং পেরেনিয়াম পেশীর (Perineum muscles) ধারাবাহিকভাবে ব্যায়াম হয়। সালাত এক ধরণের মানসিক থেরাপি। যা আত্মাকে শান্ত ও সুখী রাখে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত দুঃচিন্তা থেকে মুক্ত রাখে। সম্প্রতি রিপোর্টে এসেছে যে, নিয়মিত সালাত আদায়কারী একজন ব্যক্তির সাধারণত বাত

জাতীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা কম থাকে। সালাতের কারণে প্রায় সব প্রধান হাড় ও জয়েন্টগুলোতে ব্যায়াম হয়ে থাকে। ডাউফেশ (Doufesh) এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, সয়ংক্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের (Parasympathetic) কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্রের (Sympathetic) কার্যকলাপ হ্রাস পায়। এইভাবে নিয়মিত সালাত আদায় মনের ভার হালকা করতে, উদ্বেগকে হ্রাস করতে এবং কার্ডিওভাসকুলার (Cardiovascular) ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সালাতের দাঁড়ানো ও সাজদারত অবস্থায় যথাক্রমে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন হৃদস্পন্দন এইচ আর (HR) তৈরী করছে। নিম্ন এইচ আর (HR) একক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের জন্য সাম্ভাব্য সুবিধার হতে পারে। সালাতের সময় ও সালাতের পরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সিস্টোলিক (Systolic) এবং ডায়াস্টোলিক (Diastolic) যথেষ্ট পরিমাণে রক্তচাপ হ্রাস পায় সালাতরত অবস্থায়। প্রকৃতপক্ষে সালাতের প্রত্যেক কাজে আত্মিক উপকারীতার সাথে স্বাস্থ্যগত উপকারীতাও জড়িত।

সালাত মুমিনের শরীর নরম এবং সতেজ রাখে:

সালাত আদায় করতে হলে ওযূ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ওযূর মধ্যে তিনবার গড়গড়া করে কুলি করা এবং সমস্ত মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করা। নাকে পানি দেওয়া। কনুইসহ তিরবার হাত ধৌত করা। সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা। উভয় কান মাসেহ করা। দুই পায়ের টাকনুসহ ধৌত করা। এভাবে একজন মুমিন দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার ওযূ করার মাধ্যমে শরীরকে ময়লা এবং জীবানু থেকে মুক্ত করেন। এতে শরীর নরম এবং সতেজ থাকে।

দুশ্চিন্তামুক্ত, মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে:

রমযান মাসে প্রত্যেক মুসলমানকে অতিরিক্ত ২০ রাকাত সালাত আদায় করতে হয়। যার প্রতি চার রাকাত পরপর দুই মিনিটের একটি বিরতি থাকে। রমযান মাসে ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে ক্ষুধার কারণে রক্তে গ্লোকোজ এবং ইনসুলিনের মাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। ইফতারের পর আহরিত খাদ্য রক্তের গ্লোকোজের মাত্রা বাড়াতে থাকে। আর এর সঙ্গে

প্লাজমা ইনসুলিনও কয়েক ঘন্টার মধ্যে রক্তে গ্লোকোজের মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং যখনই কেউ সালাত শুরু করে তখন সেই গ্লোকোজ মাংসপেশী, যকৃত এবং আরও অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়া গ্লোকোজ বিপাকের মাধ্যমে কার্বন-ডাই অক্সাইডও পানিতে রূপান্তর হয়। যা সালাত তথা শারীরিক নড়াচড়ার ফল। আর এটা শরীরকে সাবলীল, দুশ্চিন্তামুক্ত, মানসিক চাপ কমাতে কমাতে সাহায্য করে। যা শরীরের জন্য খুবই ভালো।

ক্যালরী কমাতে এবং সহনশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেঃ

এছাড়াও তারাবীর সালাত মুমিনের সহনশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। কারণ তারাবীর ২০ রাকাত সালাত একটানা শারীরিক নড়াচড়ার মাধ্যমে আদায় করতে হয়।

হাড়ের ক্ষয় রোধ করে এবং কলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করেঃ

এছাড়াও আমাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি। এর নাম 'অষ্টিওপরোসিস' (Ostoeporosis) যার কারণে বৃদ্ধ বয়সে আমাদের হাড়ের ক্ষয় সৃষ্টি হয়। হাড় দূর্বল ও চিকন হয়ে যায়। এর কারণ হলো হাড়ে খনিজ উপাদান ও স্পঞ্জিনেসের (Sponginess) অভাব। যাই হোক, নিয়মিত সালাত আদায়ে এই রোগ প্রতিরোধ হয়। কারণ সালাতে নিয়মিত শারীরিক নড়াচড়া পুনরাবৃত্তি হয় যা টেনডন তথা রগের ক্ষমতা বাড়ায়। হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা সংরক্ষন করে এবং মাংশপেশীর শক্তি ও নমনীয়তা বাড়ায়। একটি উদ্দীপক হরমোন আছে, এ্যাড্রেনালীন (Adrenaline) যা ছোটখাট কাজের কারণে নিঃসরন হয়। এর নিঃসরন উদ্দীপনা তথা কাজ শেষেও হতে থাকে। 'সিমপেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম' (Sympathetic Nervous System) আমাদের শরীরে 'মোটর নার্ভ' (Motor Nerves) সরবরাহ করে। যা শরীরের অভ্যন্তরীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদযন্ত্রের পেশীকে নমনীয় করতে সাহায্য করে। আর এই নার্ভাস সিস্টেমটি সক্রিয় করতে তারাবীর সালাতই যথেষ্ট। তাই যখন এ্যাড্রেনালিন (Adrenaline) হরমোন নিঃসরন হয়, এটা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদস্পন্দনের হারকেও বাড়িয়ে দেয়। হজম প্রক্রিয়া ধীর করে দেয়। রক্তচাপ বাড়ায় এবং গ্লোকোজ সরবরাহের জন্য গ্লাইকোজেনকে (Glycogen) সচল করে দেয় যা টিস্যুকে সক্রিয় করে

ও কঙ্কাল-পেশীর ক্লান্তি দূর করে। একইভাবে সালাতের আরো কিছু উপকারীতা হলো, এটা কলেস্টেরল কমাতে পারে। কারণ, নিয়মিত ব্যায়াম কলেস্টেরল (Cholesterol) কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায়। আর সালাত হলো সবচেয়ে ভালো ব্যায়ামগুলোর একটি উন্নত ব্যায়াম।

শরীরে এবং মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করেঃ

তাকবীর বলার সময় আমাদের হাত ও কাঁধ নাড়াতে হয় যা ধড়ের মধ্যে রক্ত প্রবাহ বাড়ায় এবং এটা শরীরে রক্ত সরবরাহ ভালো করে। তাশাহুদের সময় বসা অবস্থায় শরীর হালকা ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়। এছাড়াও সালাত শরীরকে অনেক রোগ থেকে রক্ষা করে যেমন- বাত, গিটে ব্যাথা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি। সাজদার সময় যখন আমরা মাটিতে কপাল স্পর্শ করি তখন মস্তিষ্কে নতুন করে রক্ত সরবরাহ হয়। অনেক যোগ ব্যায়ামে এই ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়।

সালাত স্মরনশক্তি এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করেঃ

বলা হয়েছে যে, নির্ভুলভাবে সালাত আদায় করলে দাঁড়ানো, রুকুতে যাওয়া, সাজদাহ করা এবং প্রতি দুই সাজদার মাঝখানে বসা ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের নড়াচড়ার মধ্যে একটি চমৎকার স্বাচ্ছন্দ সাদৃশ্য ও সমন্বয় তৈরী করে। ফলে, যারা নিয়মিত সালাত আদায় করে তাদের ভ্যারিকোজ তথা শিরা ফুঁলে যাওয়া রোগ আক্রমন করে না বললেই চলে। আবার সাজদা সালাতের সেই অংশ যেখানে মাথা হৃৎপিন্ডের নিচে অবস্থান করে। তাই রক্তের নিম্নগতির জন্য এই সময় মাথায় রক্তের গতি বেড়ে যায়, যা স্মরনশক্তি, মনোযোগ এবং মনোজ্ঞানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

হৃৎপিন্ডকে সুস্থ রাখেঃ

এছাড়াও সাজদার সময় সাইনাসে প্রবাহের সৃষ্টি হয়। যা স্বাস্থ্যকর। যার ফলে সাইনাসের ব্যাথা কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একজন মানুষ যখন স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালায় তখন সে টেনে নেওয়া বাতাসের দুই তৃতীয়াংশ বাতাস বের করে দেয়। আর এক তৃতীয়াংশ বাতাস ফুসফুসে রয়ে যায়। আমরা যখন সাজদায় যাই তখন পেটের নিচের অংশে চাপ পড়ে। যা ডায়াফ্রেমে চাপ দেয়। ডায়াফ্রেম তখন ফুসফুসের নিচের অংশে চাপ দেয়। আর আমরা যদি সাজদার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালাই তখন থেকে যাওয়া সেই এক তৃতীয়াংশ বাতাসও বেড়িয়ে যায়। যা একটি

স্বাস্থ্যকর ফুসফুসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে সালাত হৃৎপিন্ডের আকৃতিকেও ঠিক রাখে।

রুকুর স্বাস্থ্যগত উপকারীতা:

যেহেতু রুকু পিঠ বাঁকা করে এবং পা সোজা রেখে করতে হয় তাই শরীরের নীচের অংশের মাংসপেশীগুলোতে পশ্চাৎদেশ, উরু ও পায়ের আঙ্গুলে টান পড়ে। বারবার এই ধরণের নড়াচড়ায় শরীরের এই মাংসপেশীগুলো শক্তিশালী হয়। এছাড়াও রুকুতে ধড়ের উপরের দিকে রক্ত সঞ্চলন বেড়ে যায় যা পাকস্থলী, পেট এবং কিডনীর মাংসপেশীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সাহায্য করে। রুকুর সময় পা এবং পাকস্থলীর মধ্যে সমকোন তৈরী হয়। এতে পাকস্থলীর মাংসপেশীর উন্নতি সাধন করে। এই অবস্থায় শরীরের সবচেয়ে উপরের অংশের মাথা, চোখ, কান এবং ফুসফুসেও রক্ত সঞ্চালন অনেক বেড়ে যায়।

সাজদার স্বাস্থ্যগত উপকারীতা:

যেহেতু মাথা হৃদপিন্ডের চেয়ে নিম্ন অবস্থানে থাকে, এ জন্য এটি মাথায় রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধি করে। যার ফলে মানসিক স্বাস্থ্য যেমন- স্মৃতিশক্তি, ঘনত্ব এবং অন্যান্য মানসিক বিষয়গুলোতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এছাড়া সাজদার সময় এভডোমিনাল ভিসরা (Abdominal Visra পাতলা পর্দা) (Diaphram) এর উপর চাপ প্রয়োগ করে যা ফুসফুসের নিম্ন অংশে এবং নিচের লোব (Lobe) এর মধ্যে চাপ দেয়, যেটা ফুসফুসের জন্য স্বাস্থ্যকর।

সালাতের উপকারীতা বিষয়ক এই সেশনটি আমরা শেষ করতে চাচ্ছি এই বলে যে, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির (Harvard University) একজন বিশেষজ্ঞ, বেনসন (Benson) উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে তারাবীর সালাত আদায় করতে থাকলে শরীরের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তার মতে, সালাতের এই ব্যায়াম যা গভীর চিন্তা থেকে মনকে বিরত রাখে। তা এক ধরনের বিনোদনের মত কাজ করে। এর ফলে রক্তচাপ কমে এবং অক্সিজেনের শোষন কম হয়। কারন হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইসলামে সালাতের অনেক উপকারীতা আছে।

এই গভেষনাটিতে বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিমসহ অনেক বড় বড় স্কলারগণ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন:

১. https://umexpert.umedu.my/file/publication/00013965_144929.pdf
২. https://www.hiqma.com/ নামাজের-শারীরিক-উপকারীতা

‘আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সালাতের বহুবিধ উপকারীত’ লেখাটি ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব সাইফুল ইসলাম ভাই সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

সালাত আদায় না করার পরিণাম

১. বড় দুঃখ আছে যারা সালাত আদায়ে গাফলতি করে:

মহান আল্লাহ বলেন-

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

বড় দু:খ আছে সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে। যারা মানুষকে দেখায়।[১৯৬]

২. সালাত না পড়লে অপমান ও অপদস্তের শাস্তি ভোগ করতে হবে:

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞

এ আয়াতের সারকথা হলো, কিয়ামতের দিবসের কঠিন মুহুর্তে আল্লাহ তায়ালার একটি আলোকবর্তিকা প্রকাশ পাবে। সবাইকে সাজদাবনত হতে বলা হবে। তখন কেবল তারাই সাজদাবনত হতে পারবে যারা দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য সাজদা করত, অর্থাৎ সালাত আদায় করত। কিন্তু সুস্থ-সবল

[১৯৬] সূরা মাউন, আয়াত- ৪,৫,৬

থাকা সত্বেও যারা সালাত পড়ত না, যারা সালাতের জন্য আহবান করত তাদের কথা শুনত না, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্বেও সেদিন সাজদা করতে পারবে না। তাদের কোমরকে শক্ত করে দেয়া হবে। তখন তারা অপমান ও অপদস্তের শাস্তি ভোগ করবে। তাদের দৃষ্টি মাটির দিকে অবনত থাকবে।[১৯৭]

৩. সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে, শয়তান কানে পেশাব করে দেয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

হযরত আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হলো, যে ব্যক্তি সারা রাত এমন কি সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলো। সে সালাতও পড়ে নি। তখন তিনি বললেন, সে এমন ব্যক্তি যার কানে শয়তান পেশাব করেছে।[১৯৮]

৪. সালাত ত্যাগ করা কুফুর ও শিরকের দিকে ধাবিত করে:

হযরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

ব্যক্তি ও কুফুর-শিরকের মাঝে (সম্পর্কের) সুত্র হচ্ছে সালাত ত্যাগ করা।[১৯৯]

৫. সেচ্ছায় সালাত ত্যাগ করলে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়:

হযরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

[১৯৭] সূরা আল-কলম, আয়াত- ৪২ এবং ৪৩

[১৯৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৩২৭০

[১৯৯] সহীহ্ মুসলিম, হাদীস- ২৫৬

ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করবে না। কারণ যে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।[২০০]

৬. সালাত না পড়লে নাজাতের ওসীলা হবে না:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সালাতের কথা আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করবে কিয়ামতের দিন সালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ এবং নাজাতের জন্য ওসীলা হবে। আর যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করবে না তার জন্য সালাত আলো, প্রমাণ এবং নাজাতের জন্য ওসীলা হবে না। কিয়ামতের দিন সে কারূন, ফিরআউন এবং হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে।[২০১]

৭. আযান শুনেও সালাতে উপস্থিত না হওয়া অবশ্যই জুলুম:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ একেবারে জুলুম, কুফুর ও মুনাফিকী, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর (মুয়াযযিনের) ডাক শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয় না।[২০২]

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস সমূহ থেকে সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা ভালোভাবে জানতে পেরেছি, সালাতের ব্যপারে অবহেলা করা যে কত বড় অপরাধ তাও বুঝতে পেরেছি।

[২০০] সুনানে ইবেন মাজাহ, হাদীস-৪০৩৪

[২০১] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস- ১৪৬৭

[২০২] তারগীব

জামাতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

জামাতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব অনেক। আমরা কুরআন-হাদীস থেকে জামাতের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

১. লোকেরা যদি জামাতের ফযিলত জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে অংশগ্রহণ করত:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যদি লোকেরা আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারের সালাত আদায় করার সওয়াব সম্পর্কে অবগত হতো, তাহলে তারা এ সওয়াব অর্জন করার জন্য এমনভাবে প্রতিযোগিতা করতো, লটারী ব্যতীত এর কোনো সমাধানই পাওয়া যেতো না। আর যদি তারা জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা কত সওয়াব তাহলে তারা অবশ্যই প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করতো। আর যদি ইশা এবং ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করার ফযিলত জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে অংশগ্রহণ করত।[২০৩]

[২০৩]

জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ফযিলত

জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ফযিলত অনেক। আমরা কুরআন-হাদীস থেকে জামাতের ফযিলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করছি। কেউ যদি জামাতের সাথে সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে গিয়ে সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তার জন্য রয়েছে অনেক বড় সুসংবাদ।

১. সালাতের জন্য অপক্ষো করলে ফিরিশতাগণ ক্ষমা এবং রহমতের দুআ করেন:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সালাতের জন্য সালাতের স্থানে বসে অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে হে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাঁকে রহমত করুন। সে ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের স্থান ত্যাগ না করেন অথবা ওযূ নষ্ট না করেন।[২০৪]

২. প্রতি কদমে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

[২০৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৫৪১

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি ফরয সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে ওযূ করে বের হয় তার একটি কদমে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং অপর কদমে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।[২০৫]

৩. একাকী সালাত পড়ার চেয়ে জামাতে পড়লে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জামাতে সালাত আদায়ের ফযিলত একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব হয়।[২০৬]

৪. যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সালাতুল ইশা এবং ফজর আদায় করল সে যেন পুরো রাত নফল সালাত আদায় করল:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّان رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ইশার সালাত জামআতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধ রাত পর্যন্ত নফল সালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাতও জামআতের সাথে করল, সে যেন সারারাত নফল সালাত আদায় করল।[২০৭]

---

[২০৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১৫৫৩

[২০৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৪৫

[২০৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৫২৩

৫. জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে ইহরাম বেঁধে হজ্বে গমন করার সমান সওয়াব:

আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ

হযরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি ঘর থেকে উত্তমভাবে ওযূ করে বের হয়ে ফরয সালাতের জন্য মসজিদে গমন করে (জামাতের সাথে সালাত আদায় করে) তার বিনিময় হলো ইহরাম বেঁধে হজ্বে গমন করার সমান সওয়াব। আর যে ব্যক্তি সালাতুদ দোহা আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয় তার বিনিময় হল ওমরা আদায় করার সমান সওয়াব।[২০৮]

৬. একনাগাড়ে চল্লিশ দিন জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকবীরে উলার সাথে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জামাতে সালাত আদায় করবে তার জন্য দুটি সনদ রয়েছে। একটি হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। অপরটি হচ্ছে মুনাফিকি থেকে মুক্তির সনদ।[২০৯]

---

[২০৮] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫৫৮

[২০৯] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-২৪১

জামাতে সালাত আদায় না করার পরিণাম

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিতে চান:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন। আমার ইচ্ছা হয় কিছু সংখ্যক যুবককে অনেকগুলি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আনতে বলি। তারপর সালাতের নির্দেশ প্রদান করি। সালাতের ইকামত দেওয়া হবে। তারপর একজনকে নির্দেশ প্রদান করি যে সে যেন লোকদেরকে ইমামতি করে সালাত আদায় করে। এরপর আমি ঐ সব লোকের কাছে যাই যারা অকারণে জামাতে না গিয়ে ঘরে সালাত আদায় করে নেয় এবং তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেই।[২১০]

২. অকারণে জামাতে না গেলে সালাত কবূল হয় না:

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে

[২১০] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৪৪

কোনো রকম কারণ ব্যতীত জামাতে উপস্থিত না হয়, তার সালাত কবূল হয় না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ বলতে কি বুঝায়? তিনি জবাব দিলেন অসুস্থতা, ভয়, ভীতি।[২১১]

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অভিমত:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তি সারাদিন সিয়াম পালন করে এবং সারারাত নফল সালাত পড়ে কিন্তু জুমআ এবং জামাতে উপস্থিত হয় না, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে একথা বললেন, ঐ লোকটি জাহান্নামী।[২১২]

মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাত করার বিধান

জামাতের সাথে সালাত আদায় করার গুরুত্ব এবং ফযিলত অনেক বেশি। সকল মুমিনের হৃদয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের আগ্রহ এবং উপস্থিত হওয়ার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা করা উচিত। তারপরও কখনো জামাতে সালাত আদায় করতে না পারলে তখনও মুমিনগণ মসজিদে গিয়ে দ্বিতীয়বার জামাত করে সালাত আদায় করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তখন শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাঁধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। অর্থাৎ কোনো মসজিদে একবার জামাতের সাথে সালাত আদায় করার পর একই মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাতের সাথে সালাত করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম কী করতেন?

আমরা এখানে প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করব। তারপর একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও সমকালীন ফাতওয়া উল্লেখ করব।

[২১১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫৫১

[২১২] তিরমিযি

দ্বিতীয় জামাত জায়েয না হওয়ার দলিল:

সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ী রাহি. বলেছেন যে মসজিদে একবার সালাত পড়া হয়েছে সে মসজিদে একা একাই সালাত আদায় করবে। একই কথা বলেছেন ইমাম আবু হানীফা রাহি.।

দলিল-১ :

وَكَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ

হযরত আসওয়াদ রাদি. কখনো জামাতে সালাত আদায় করতে না পারলে অন্য মসজিদে চলে যেতেন।[২১৩]

দলিল-২ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلى الله عليه وَسلم أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِيْنَةِ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا فَمَالَ إِلى مَنْزِلِه فَجَمَعَ أَهْلَه فَصَلَّى بِهِمْ

হযরত আবু বাকরা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার বাইরে থেকে সালাত আদায় করার ইচ্ছায় আগমন করলেন। এসে দেখলেন লোকজন সালাত সম্পন্ন করেছে। তিনি ঘরে গেলেন। পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।[২১৪]

দলিল-৩ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. এর আমল:

أَنَّ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدَ أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدْ صَلُّوْا فَرَجَعَ بِهِمَا إِلَى الْبَيْتِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمَا

[২১৩] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৬৪৫

[২১৪] মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস- ২১৭৭ ইমাম হাইসামী রাহি. বলেছেন: হাদীসটির বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. এর সঙ্গে আলকামা এবং আসওয়াদ রাদি. মসজিদে এলেন। লোকেরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। অথচ তারা পূর্বেই সালাত আদায় সম্পন্ন করেছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. উভয়কে নিয়ে বাড়িতে গেলেন। তাদের একজনকে ডান দিকে এবং অপর জনকে বাম দিকে দাঁড় করালেন। তারপর তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।[২১৫]

দলিল-৪ : শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহি. এর অভিমত:

فَلَوْ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَسْجِدِ جَائِزَةً مُطْلَقًا لَمَا جَمَعَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ فِي الْبَيْتِ مَعَ أَنَّ الْفَرِيْضَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ كَمَا هُوَ مَعْلُوْمٌ

(আল-মুয়জামুল কাবীর গ্রন্থের ৯৩৮০ নং হাদীসের ভিত্তিতে তিনি বলেন) যদি মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাত করা জায়েয হতো তাহলে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদি. বাড়িতে যেতেন না। অথচ মসজিদে ফরয আদায় করা উত্তম হওয়ার বিষয়টি সবারই জানা।

তিনি এ কথাও বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদি. এর আমলটি আছার হলেও এটি মারফু হাদীসের হুকুমে।[২১৬]

দ্বিতীয় জামাত জায়েয হওয়ার দলিল:

একাধিক সাহাবি এবং তাবেয়ী আলেম এবং ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেছেন যে মসজিদে একবার সালাত পড়া হয়েছে সে মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাত করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

দলিল-১ :

جَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً

হযরত আনাস রাদি. মসজিদে গিয়ে যদি দেখতেন সালাত পড়া হয়ে গেছে, তখন তিনি আযান এবং ইকামত দিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন।[২১৭]

[২১৫] আল-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস- ৯৩৮০

[২১৬] বিস্তারীত জানার জন্য: শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী এর রচিত 'তামামুল মিন্নাতি' দ্র.।

দলিল-২ :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلٰى هٰذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلّٰى مَعَهُ

হযরত আবু সাঈদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করার পর এক ব্যক্তি আগমন করল। তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে তার সাথে কে ব্যবসা করবে? এক ব্যক্তি (হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি.) দাঁড়াল। সে তার সাথে সালাত আদায় করল। (এটা ছিল দ্বিতীয় জামাত)[২১৮]

একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও সমকালীন ফাতওয়াঃ

১. দ্বিতীয় জামাত জায়েয হওয়ার পক্ষে সহীহ বুখারী থেকে উদ্ধৃত ৬৪৫ নং বিবরণে যেভাবে হযরত আনাস রাদি. এর কথা বলা হয়েছে যে, তিনি জামাতে অংশ গ্রহণ করতে না পারলে আযান ও ইকামত দিয়ে সালাত আদায় করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে ঐ বিবরণের শুরুতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হযরত আসওয়াদ রাদি. জামাত না পেলে অন্য মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতেন। সুতরাং হযরত আসওয়াদ এবং আনাস রাদি. এর আমল পরস্পর বিরোধী। কেননা হযরত আসওয়াদ রাদি. জামাত না পেলে অন্য মসজিদে চলে যেতেন। যদি দ্বিতীয় জামাত করা তিনি জায়েয মনে করতেন তাহলে তিনি অন্য মসজিদে যেতেন না। তাহলে প্রমাণ হলো তিনি দ্বিতীয় জামাতের পক্ষে নন। অথচ আনাস রাদি. দ্বিতীয় জামাত করার পক্ষে ছিলেন। অতএব বুখারী থেকে উদ্ধৃত ঐ বিবরণটি পরস্পরে বিপরীত।

২. হযরত আনাস রাদি. যে মসজিদে আযান ও ইকামত দিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন তা ছিল রাস্তার পাশের মসজিদ। কেননা, ঐ মসজিদের নাম ছিল বনু সালাবার মসজিদ। তখন মদীনা তাইয়িবাতে এই নামে প্রসিদ্ধ কোনো মসজিদ ছিল না। সুতরাং হযরত আনাস রাদি. এর

[২১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৬৪৫

[২১৮] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস- ২২০

আমলকে দলিল হিসেবে মেনে নিলে এ কথা বলা যায় যে, রাস্তা কিংবা বাজারের মসজিদে যেখানে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্ধারীত নেই সেই মসজিদে দ্বিতীয়বাার জামাত করা যায়।

৩. দ্বিতীয় জামাত জায়েয হওয়ার পক্ষে তিরমিযি থেকে উদ্ধৃত হযরত আবু সাঈদ রাদি. এর বিবরণে উল্লেখ আছে যে মসজিদে জামাতের সাথে সালাত হয়ে গেছে সে মসজিদে এক ব্যক্তি আগমন করল। তার সঙ্গে আবু বকর সিদ্দীক রাদি. সালাত আদায় করলেন। ঐ জামাতে সর্বমোট লোক সংখ্যা ছিল দুইজন এবং দ্বিতীয় জামাতে সালাত আদায় করার জন্য অন্য কাউকে আহ্বান করা হয় নি। এ ছাড়াও আবু বকর সিদ্দীক রাদি. ছিলেন নফল সালাত আদায়কারী। কেননা তিনি ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সালাত আদায় করেছিলেন। সুতরাং হাদীসকে দলিল হিসেবে মেনে নিলে এ কথা বলা যায় যে, কেউ ফরয সালাত আদায় করলে তার পেছনে নফল সালাতের নিয়তে সালাত আদায় করা। এই পদ্ধতিতে মসজিদে দ্বিতীয়বাার জামাত করা যায়।

দ্বিতীয় জামাত জায়েয হওয়ার কয়েকটি শর্ত ও পদ্ধতিঃ

উপরের হাদীস সমূহ থেকে পর্যালোচনা শেষে যে সারমর্ম পাওয়া গেছে তা হচ্ছে-

১. হযরত আনাস রাদি. এর আমলকে দলিল হিসেবে মেনে নিলে এ কথা বলা যায় যে, রাস্তা কিংবা বাজারের মসজিদে যেখানে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্ধারীত নেই সেই মসজিদে দ্বিতীয়বাার জামাত করা যায়। অন্যথায় দ্বিতীয় জামাত করা মাকরূহ।

২. তিরমিযি থেকে উদ্ধৃত হযরত আবু সাঈদ রাদি. এর বিবরণকে দলিল হিসেবে মিনে নিলে এ কথা বলা যায় যে, কাউকে সালাতের জন্য আহ্বান না করলে এবং পেছনে কেউ নফল সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় জামাত করা যায়।

৩. ইমাম আবু ইউসুফ রাহি. বলেনঃ যদি মিহরাব থেকে সরে একটু দূরে আযান ও ইকামত এবং সালাতের জন্য কাউকে আহ্বান ব্যতিত জামাতের সাথে সালাত আদায় করে তাহলে জায়েয আছে।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিবরণ

ফজরের সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়:

ফজরের সালাতের সময় শুরু হয় সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার (শেষ রাত্রে পূর্বাকাশে সাদা রেখা পরিলক্ষিত হওয়ার) পর থেকে। এর শেষ সময় হলো সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। এর সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো এক ঘন্টা ২৫/২৭ মিনিট। আর সর্বনিম্ন সময় হলো এক ঘন্টা ১০/১২ মিনিট। সাধারণত মে, জুন এবং জুলাই মাসে সময়টা একটু বেশি হয়ে থাকে। আর অন্যান্য মাসে সময়টা একটু কম হয়ে থাকে। সূর্য উদয় হওয়ার সাথে সাথেই ফজরের সময় শেষ হয়ে যায়। বর্তমান যুগে নিজ এলাকার জন্য নির্ধারিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফজরের সালাতের সময় নির্ণয় ভালো।

হাদীসে এসেছে-

وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সুবহে সাদিক উদয় হয়। এর শেষ ওয়াক্ত হল যখন সূর্য উদয় হয়।[২১৯]

ফজরের এই সময়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ইসলামি পরিভাষায় প্রথম অংশকে গালাস (কিছু অন্ধকার) এবং দ্বিতীয় অংশকে ইসফার (কিছুটা আলোকিত) বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম অংশে অর্থাৎ কিছুটা অন্ধকার থাকতেই সালাতুল ফজর আদায় করতেন। আর জীবনের শেষ দিকে অধিকাংশ সময়ে ইসফার অর্থাৎ কিছুটা আলোকিত হলে সালাতুল ফজর আদায় করতেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত দুটো সময়েই

২১৯ সুনানুত তিরমিযি, হাদীস- ১৫১; হাদীসটি মুরসাল। তবে কেউ কেউ মারফু হিসেবেও বর্ণনা করেছেন।

সালাতুল ফজর আদায় করেছেন, তাই গবেষক উলামায়ে কিরাম বলেন, রমযান মাসে গালাসে অর্থাৎ কিছুটা অন্ধকার থাকতেই পড়া উত্তম। আর রমযান মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে ইসফার অর্থাৎ কিছুটা আলোকিত হওয়ার পরই পড়া উত্তম। কিছুটা আলোকিত হওয়ার পর সালাতুল ফজর পড়া উত্তম হওয়ার ব্যাপারে হাদীস থেকে আমরা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারি।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

হযরত আবু বারযা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময়ে সালাতুল ফজর আদায় করতেন, যখন আমাদের একজন তার পার্শ্ববর্তী অন্যজনকে চিনতে পারতো। তিনি এই সালাতে ৬০ থেকে একশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন।[২২০]

সালাতুল ফজর কিছুটা আলোকিত হলে পড়ার মধ্যে সওয়াব বেশি:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রাদি. বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা সালাতুল ফজরকে কিছু আলোকিত হলে আদায় করো। কেননা এর সওয়াব অনেক বেশি।[২২১]

হযরত আলী রাদি. কিছুটা আলোকিত হলে ফজর পড়তেন।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ لِمُؤَذِّنِهِ أَسْفِرْ أسفر يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ

২২০ সহীহ বুখারী, আয়াত-৫৪১

২২১ সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-১৫৪

আলী ইবনে রবীয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হযরত আলী রাদি. কে এ কথা বলতে শোনেছি যে, তিনি তাঁর মুয়াজ্জিনকে বলতেন আলোকিত কর, আলোকিত কর। অর্থাৎ ফজরের সালাতকে আলোকিত হওয়ার পর পড়।[২২২]

সাঈদ ইবনে যুবাইরও তাঁর মুয়াজ্জিনকে একই নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[২২৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. সালাতুল ফজর পড়তেন কিছুটা আলোকিত হওয়ার পর।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيْدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِيْ الْكَبِيْرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُوْنَ

আবদুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদি. কিছুটা আলোকিত হওয়ার পর সালাতুল ফজর পড়তেন। ইমাম তাবারানি রাহি. তাঁর রচিত আল-মুজামুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি এ কথাও বলেছেন যে বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[২২৪]

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রাহি. এর বলেন:

مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ.

সাহাবায়ে কিরাম কোনো বিষয়ে এতোটা ঐক্যমত হয় নি যতোটা ঐক্যমত হয়েছেন ফজরের সালাতকে আলোকিত করে পড়ার ব্যপারে।[২২৫]

[২২২] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস- ২১৬৫

[২২৩] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস- ২১৬৬

[২২৪] মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস- ১৭৭৩

[২২৫] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস- ৩২৭৫

রমযান মাসে সালাতুল ফজরের সময়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদি. থেকে বর্ণিত, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও যায়েদ ইবনে সাবিত রাদি. একত্রে সাহরী খেলেন। যখন তাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাতে দাঁড়ালেন। সালাত আদায় করলেন। (কাতাদাহ রাহ. বলেন) আমরা আনাস রাদি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের সাহরী খাওয়া থেকে অবসর হয়ে সালাতে দাঁড়ানোর মধ্যে কতটুকু সময় ছিল? তিনি বললেন, কোনো লোক পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে যে পরিমাণ সময় লাগে সে পরিমাণ সময়।[২২৬]

ফজরের সালাতের রাকাত সংখ্যা:

ফজরের সালাত মোট চার রাকাত। প্রথমে দুই রাকাত সুন্নত। এই সুন্নত আবশ্যক। তারপর দুই রাকাত ফরয।

ফজরের সালাতের সুন্নত কিরাত:

ফজরের ফরয সালাতে সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সূরা সমূহ থেকে যে কোনো সূরা তিলাওয়াত করা। তবে এই সূরাগুলোকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বা বেশি প্রয়োজন মনে করা উচিত নয়। মাঝে মধ্যে ভিন্ন সূরাও পড়া যেতে পারে।[২২৭]

[২২৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৭৬

[২২৭] কিফায়াতুল মুফতি- ৩/৪১৪

ফজরের সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:

ফজরের সুন্নত সালাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

১. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত, সকল সুন্নত সালাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নফল বা সুন্নত সালাতকে ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের মতো গুরুত্ব দিতেন না।[২২৮]

২. নবীজি কখনও ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ছাড়তেন না:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে বা প্রকাশ্যে কখনও দুই রাকাত সালাত বাদ দিতেন না। আর তা হলো ফজরের (ফরয) সালাতের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত সালাত।[২২৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের আমল থেকে একথা প্রমানিত আছে যে,ফজরের সুন্নত সালাতের গুরুত্ব অন্যান্য সুন্নত সালাতের চেয়ে অনেক বেশি। এজন্য এর বিধান হলো, ফজরের ফরয সালাতের জামাত শুরু হওয়ার পরও যদি সুন্নত আদায় করে জামাতের সঙ্গে অন্তত এক রাকাত সালাত পাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সুন্নত সালাত আদায় করেই জামাতে অংশ গ্রহণ করা উচিত।

---

[২২৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭১৯

[২২৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৯২

৩. নবীজি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সব সময় পড়তেন:

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত-

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত সালাত এবং ফজরের ফরযের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত সালাত কখনো ছাড়তেন না। (সব সময় পড়তেন)।[২৩০]

এই সুন্নত সালাত হল সুন্নতে মুয়াক্বাদা। তা পরিত্যগ করা মোটেও ঠিক নয়।

ফজরের সুন্নত সালাতের ফযিলত:

ফজরের সুন্নত সালাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। সুতরাং এর ফযিলতও অনেক বেশি। আমরা এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

১. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পুরো পৃথিবী থেকে উত্তম:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত সালাত) পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, সবগুলোর চেয়েও উত্তম।[২৩১]

২. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়লে জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়:

হাদীসে এসেছে-

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ **الْفَجْرِ**

---

[২৩০] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৮২

[২৩১] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭২১

(উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকাত (সুন্নত) সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। (ওই বারো রাকাত সালাত হলো) যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত এবং ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। মাগরিবের ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। ইশার ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। আর ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দুই রাকাত।[২৩২]

ফজরের ফরয সালাতের গুরুত্ব:

সালাতের গুরুত্ব শিরোনামে আলোচনা করেছি। সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

ফজরের ফরয সালাতের ফযিলত:

১. যে ব্যক্তি সালাতুল ফজর আদায় করবে সে জান্নাতে যাবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

হযরত আবু বকর ইবনে আবু মূসা রাদি. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি দুই শীতের সালাত আদায় করবে অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৩৩]

২. ফজর ও আসরের সালাত পড়লে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না:

হাদীসে এসেছে-

عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

[২৩২] তিরমিযি, হাদীস-৪১৫

[২৩৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৭৪

হযরত আবু বকর ইবনে ওমারা রাদি. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত আদায় করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[২৩৪]

নোট: এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই হাদীসটিতে বলা হয়েছে কেউ যদি সালাতুল ফজর এবং আসর আদায় করে তাহলে সে জাহান্নামে যাবে না। সুতরাং জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য কী আর কোনো আমল করার প্রয়োজন নেই। শুধুই কি সালাতুল ফজর এবং আসর আদায় করেই জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে?

উল্লেখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, কোনো ব্যক্তি যদি সালাতুল ফজর এবং আসর সঠিকভাবে আদায় করে তাহলে সে অন্য তিন ওয়াক্তের সালাতও পালন করবে। আর যখন তার সালাত সুন্দর হয়ে যাবে তখন ইসলামের অন্যান্য বিধানও সে পালন করবে। কেননা সালাত মানুষকে সকল অন্যায় এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব কোনো মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকলে এবং সালাতের প্রতি যত্নবান হলে সে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে। এই জন্যই উল্লেখিত হাদীসে সালাতুল ফজর এবং আসর আদায়ের কারণে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. সালাতুল ফজর আদায়কারীকে মহান আল্লাহ হিফযত করবেন:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِى ذِمَّةِ اللهِ

হযরত আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত জুনদুব কাসরী রাদি.-কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সালাতুল ফজর আদায় করে সে মহান আল্লাহর হিফাযতে থাকবে।[২৩৫]

[২৩৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪৬৮

[২৩৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৫২৬

৪. সালাতুল ফজর ও আসর মহান আল্লাহর কাছে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছানো হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একদল ফিরিশতা রাত্রে তোমাদের মধ্যে অবতরণ করেন। আরেক দল ফিরিশতা দিনের বেলায় তোমাদের মধ্যে অবতরণ করেন। উভয় দল ফিরিশতা সালাতুল ফজর এবং আসরের সময় একত্রিত হন। যে সব ফিরিশতা তোমাদের মাঝে রাত্র যাপন করেছেন তারা আসমানে চলে যান। মহান তাদের থেকে বেশি জানার পরও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় রেখে এসেছ? জবাবে তারা বলেন, আমরা তাদেরকে সালাতরত পেয়েছিলাম এবং সালাতরত অবস্থায় রেখে এসেছি।[২৩৬]

৫. সালাতুল ফজর আদায় করলে সারাদিন মন প্রফুল্ল থাকে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

---

[২৩৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৫৫

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে থাকে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিট দেয় এবং প্রতিটি গিট দেওয়ার সময় শয়তান এই বলে ফুঁক দেয় এখনও অনেক রাত আছে, তুমি ঘুমিয়ে থাকো। তারপর সে যদি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে তার একটি গিট খুলে যায়। তারপর সালাতের জন্য ওযূ করলে আরেকটি গিট খুলে যায়। অত:পর যখন সে সালাত আদায় করে তখন তার তৃতীয় গিট খুলে যায়। তখন সে আনন্দিত ও প্রফুল্ল মন নিয়ে সকাল করে। অন্যথায় সে অলস ও অপবিত্র মন নিয়ে তার দিনের সূচনা হয়।[২৩৭]

৬. যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের জন্য বের হল, সে যেন ঈমানের পতাকা নিয়ে বের হল:

হাদীসে এসেছে-

عن سلمان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ

হযরত সালমান রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ফজরের সালাত পড়ার উদ্দেশ্যে বের হল (মসজিদের দিকে)। সে যেন ঈমানের পতাকা নিয়ে বের হল। আর যে ব্যক্তি (সালাত আদায় না করে) বাজারের গেল সে যেন শয়তানের পতাকা নিয়ে বের হল।[২৩৮]

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: ফজরের ফরয সালাতের জামাত শুরু হলে সুন্নত পড়া যাবে কিনা?

উত্তর: ইতোপূর্বে আমরা ফজরের সুন্নত সালাতের গুরুত্ব জেনেছি। ফজরের সুন্নত সালাতের গুরুত্বের কারণেই জামাত শুরু হওয়ার পরও সাহাবায়ে কিরাম যদি এক রাকাত পাবারও সম্ভাবনা মনে করতেন, তাহলে তাঁরা সুন্নত সালাত আদায় করেই জামাতে অংশ গ্রহণ করতেন।

---

[২৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৪২

[২৩৮] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-২২৩৪

হাদীসে এসেছে-

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسى قَالَ: جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু মূসা রাদি. বলেন, আমাদের মসজিদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. আগমন করলেন। তখন ইমাম সাহেব ফজরের সালাত পড়াচ্ছিলেন। তিনি একটি খুটির কাছে ফজরের সুন্নত সালাত আদায় করলেন। কেননা, তিনি আগে সুন্নত সালাত পড়তে পারেন নি। ইমাম হাইসামী (রাহ.) বলেছেন হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[২৩৯]

উল্লেখিত হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের সুন্নত সালাত আদায় করে জামাতে অন্তত এক রাকাত পাবার সম্ভাবনা থাকলে মসজিদের এক কোণে বা জামাত থেকে একটু দূরে সুন্নত সালাত আদায় করেই জামাতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। আর যদি সুন্নত সালাত পড়তে গেলে জামাতে এক রাকাত পাবারও সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সুন্নত সালাত আদায় না করেই জামাতে অংশ গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন: যদি কেউ ফজরের সুন্নত সালাতকে ফরয সালাতের পূর্বে পড়তে না পারে তাহলে সে ফজরের সুন্নত সালাত পড়তে পারবে কিনা এবং কখন পড়বে?

উত্তর: যদি কেউ ফজরের সুন্নত সালাত ফরয সালাতের পূর্বে পড়তে না পারে তাহলে সে ফজরের সুন্নত সালাত পড়তে পারবে। এখন জানার বিষয় হলো সে অনাদায়কৃত সুন্নত সালাত কখন পড়বে? সহীহ হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, সে অনাদায়কৃত সুন্নত সালাত অবশ্যই সূর্যোদয়ের ১২/১৪ মিনিট পর আদায় করবে। সূর্যোদয়ের পূর্বে সুন্নত সালাত পড়া মোটেও ঠিক নয়।[২৪০]

হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের ফরয সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে কোনো সালাত আদায় করতে

[২৩৯] মাজমাউয যাওয়াইদ২৩৯২

[২৪০] নবীজির নামায- ২৩৩

নিষেধ করেছেন। এখানে আমরা দুটি হাদীস উল্লেখ করবো। হাদীস দুটি থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ফজরের অনাদায়কৃত সুন্নত সালাত পরেও পড়া যায় এবং তা সূর্যোদয়ের পরেই পড়তে হয়।[২৪১]

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুই রাকাত সুন্নত (সময়মতো) পড়ল না, সে যেন সূর্যোদয়ের পর তা আদায় করে।[২৪২]

হযরত ইমাম মালিক (রাহি.) বলেন-

أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

তিনি জেনেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি.-এর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সালাত ছুটে গিয়েছিল। তিনি তা সূর্যোদয়ের পর আদায় করলেন।[২৪৩]

উল্লেখিত দুটি হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, কেউ যদি ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে সুন্নত সালাত পড়তে না পারে তাহলে অনাদায়কৃত সুন্নত সালাতকে পড়া যাবে এবং তা সূর্যোদয়ের পরেই পড়তে হবে যদি কেউ পড়তে চায়।

প্রশ্ন: কেউ মনে করেন যে, ফজরের ফরয সালাতের পর এবং সূর্যোদয়ের আগেই অনাদায়কৃত সুন্নত সালাত পড়া যাবে। তারা এই মতের উপর এই হাদীসটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন-

عَنْ قَيْسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَنِي أُصَلِّي فَقَالَ مَهْلًا

[২৪১] নবীজির নামায- ২৩৩

[২৪২] তিরমিযি, হাদীস-৪২৩

[২৪৩] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস-২৮৬

يَا قَيْسُ أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَالَ فَلَا إِذَنْ

হযরত কায়েস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে মসজিদে গেলেন। সালাত শুরু হয়ে গেল। আমি তাঁর সঙ্গে ফজরের সালাত পড়লাম। সালাত শেষে মসজিদ থেকে প্রস্থান করার সময় তিঁনি আমাকে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে কায়েস! থামো। তুমি কি দুই সালাত এক সঙ্গে পড়ছ? আমি বললাম, আমার ফজরের দুই রাকাত সালাত (সুন্নত) পড়া হয় নি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে অসুবিধা নেই।[২৪৪]

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, ফজরের ফরয সালাতের পর এবং সূর্যোদয়ের আগেই অনাদায়কৃত সুন্নত সালাত পড়া যাবে। এখন মূল প্রশ্ন হলো, আসলেই কি এভাবে পড়া যাবে? অথচ ইতোপূর্বে একটি প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেছে যে, ফজরের ফরযের পর এবং সূর্যোদয়ের আগে কোনো সালাত পড়া যাবে না। তাহলে আমরা কোন হাদীসের আলোকে আমল করবো? আমাদের করণীয় কী?[২৪৫]

উত্তর: আমরা পূর্বেই বলেছি যে, ফজরের ফরয সালাতের পর এবং সূর্যোদয়ের আগে কোনো সালাত পড়া যাবে না। এ বিষয়ে দুটি হাদীসও উল্লেখ করেছি। সুতরাং এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, ফজরের ফরয সালাতের পর এবং সূর্যোদয়ের আগে কোনো সালাতই পড়া যাবে না। এবার আমরা প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসের দলিল বুঝার চেষ্টা করবো। প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসের দলিলটি দুই কারণে অগ্রহণযোগ্য এবং বাতিল।

প্রথমত: যেই হাদীস দিয়ে ফরয সালাতের পর এবং সূর্যোদয়ের আগে সুন্নত সালাত পড়ার বিষয়ে দলিল দেওয়া হয়েছে সেই হাদীস দিয়ে দলিল দেওয়া ঠিক হয় নি। কেননা সেই হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি (রাহ.) বলেছেন-

[২৪৪] তিরমিযি, হাদীস-৪২২

[২৪৫] নবীজির নামায-২৩৪

وَاِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَاِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيْثِ لَيُسَ بِمُتَّصِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ

অর্থাৎ বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা হাদীসটির সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তিনি কায়স থেকে বর্ণনাটি শোনেন নি।

দ্বিতীয়ত: কায়স রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিতে ফজরের সুন্নত সালাতের কথা বলা হয়েছে কিনা তা সুস্পষ্ট নয়। বরং অস্পষ্ট। সুতরাং এমন অস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে সুস্পষ্ট বিবরণকে উপেক্ষা করা অযৌক্তিক।

যোহরের সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়:

ঠিক দ্বি-প্রহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সালাতুয যোহর শুরু হয়। আর প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত ঐ ছায়াটা বস্তুর দ্বিগুণ লম্বা হওয়া পর্যন্ত যোহরের সালাতের সময় বাকী থাকে। সুতরাং মাটিতে সোজা একটা লাঠি দাঁড় করিয়ে উল্লেখিত পদ্ধতিতে কিংবা নিজ এলাকার জন্য নির্ধারিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যোহরের সালাতের সময় নির্ণয় করা যেতে পারে।

এখানে একটি কথা মনে রাখা ভালো যে, শীতকালে যোহরের সালাতের সময় হওয়ার পর প্রথম সময়ে পড়া ভালো। আর গরমকালে যোহরের সালাত একটু বিলম্ব করে পড়া ভালো। আমরা এ বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করছি।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাফে রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা রাদি.-কে যোহরের সালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আবু হুরায়রা রাদি. বললেন, হ্যাঁ, আমি এ সম্পর্কে তোমাকে বলব। তুমি যোহরের সালাত আদায় করবে যখন তোমার ছায়া তোমার সমান হবে। তারপর যখন ছায়া তোমার দ্বিগুণ হবে তখন আসরের সালাত আদায় করবে। যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন মাগরিবের সালাত আদায় করবে।[২৪৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর সালাত আদায় করতেন:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদি. কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত (আদায় করা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনি সালাত আদায় করতেন।[২৪৭]

গরমকালে বিলম্ব করে এবং শীতকালে প্রথম সময়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ

(হযরত আনাস রাদি. বলেন) যখন প্রচন্ড ঠাণ্ডা (শীতকাল) হতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম সময়ে যোহরের সালাত আদায় করতেন। আর যখন প্রচন্ড গরম (গরমকাল) হতো তখন তিনি বিলম্ব করে সালাত আদায় করতেন।[২৪৮]

হযরত আনাস রাদি. থেকে আরেক বর্ণনায় আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে-

[২৪৬] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস-১২

[২৪৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৩৬

[২৪৮] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৯০৬

عن أَنَس بْن مَالِكٍ يَقُوْل: كَانَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ

হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতের নিয়ম ছিল: গরমেরকালে গরমের তীব্রতা কিছুটা কমার পর তিনি যোহরের সালাত আদায় করতেন। আর শীতকালে সালাতের সময় হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সালাত আদায় করতেন।[২৪৯]

আবু যার গিফারীর বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

হযরত আবু যার গিফারী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কোনো একটি সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। এক সময় মুয়াজ্জিন যোহরের আযান দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: গরম কমতে দাও। কিছুক্ষণ পর মুয়াজ্জিন আবারও আযান দিতে চাইলেন। এবারও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: গরম কমতে দাও। এভাবে তিনি সালাত আদায় করতে এতো বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলাগুলোর ছায়া প্রত্যক্ষ করলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: গরমের প্রচণ্ডতা আসে জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং গরম প্রচণ্ড হলে, গরমের উত্তাপ কিছু হ্রাস পাবার পর সালাত আদায় করো।[২৫০]

নোট: যোহরের সালাতের সময় সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখিত পাঁচটি হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে,

[২৪৯] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-৪৯৯

[২৫০] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৩৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের সালাতের নিয়ম ছিল: গরমকালে গরমের তীব্রতা কিছুটা কমার পর তিনি যোহরের সালাত আদায় করতেন। আর শীতকালে সালাতের সময় হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সালাত আদায় করতেন।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

যোহরের সালাত মোট **১২** রাকাত। প্রথমে চার রাকাত সুন্নত। তারপর চার রাকাত ফরয। দুই রাকাত সুন্নত এবং দুই রাকাত নফল।

যোহরের সালাতের সুন্নত কিরাত:

যোহরের ফরয সালাতে সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সূরা সমূহ থেকে যে কোনো সূরা তিলাওয়াত করা। তবে এই সূরাগুলোকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বা বেশি প্রয়োজন মনে করা উচিত নয়। মাঝে মধ্যে ভিন্ন সূরাও পড়া যেতে পারে।[২৫১]

চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:

যোহরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব অত্যাধিক।

১. হাদীসে এসেছে- উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত-

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত সালাত এবং ফজরের ফরযের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত সালাত কখনো ছাড়তেন না।[২৫২]

এই সুন্নত সালাত হল সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তা পরিত্যগ করা মোটেও ঠিক নয়।

[২৫১] কিফায়াতুল মুফতি- ৩/৪১৪

[২৫২] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৮২

২. হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদি. -কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে আমার ঘরে যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন। তারপর মসজিদে গিয়ে লোকদের নিয়ে যোহরের ফরয সালাত আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন। তিনি লোকদেরকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। এমনিভাবে তিনি লোকদেরকে নিয়ে ইশার সালাত আদায় করতেন, এরপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন।[২৫৩]

চার রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:

যোহরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের অনেক ফযিলত রয়েছে।

১. যোহরের চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে:

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

[২৫৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১২৫৩

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ

(উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকাত (সুন্নত) সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। (ওই বারো রাকাত সালাত হলো) যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত এবং ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। মাগরিবের ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। ইশার ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। আর ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দুই রাকাত।[২৫৪]

২. যোহরের চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায়কারীর জন্য আসমানে রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ.

হযরত আবু আইউব রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যোহরের ফরজ সালাতের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করলে আসমানের রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এই চার রাকাত সালাত আদায়ে মাঝখানে কোনো সালাম নেই। [২৫৫]

৩. যোহরের চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায়কারীকে জাহান্নামে দেওয়া হবে না:

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

[২৫৪] তিরমিযি, হাদীস-৪১৫

[২৫৫] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১২৭২

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

যে ব্যক্তি যোহরের (ফরযের) আগের চার রাকাত এবং যোহরের (ফরযের) পরের চার রাকাত সালাত নিয়মিত আদায় করে মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেন।[২৫৬]

এখানে যোহরের ফরয সালাতের পর যেই চার রাকাত সালাতের কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম দুই রাকাত সালাত হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আদায় করা অত্যাবশ্যক। আর পরের দুই রাকাত সালাত হচ্ছে নফল সালাত। এই আলাদা আদায় করা ঐচ্ছিক। করলে অনেক সওয়াব রয়েছে।

যোহরের ফরয সালাতের গুরুত্ব:

সালাতের গুরুত্ব এবং ফযিলত শিরোনামের আলোচনায় দেখুন।

যোহরের ফরয সালাতের ফযিলত:

সালাতের গুরুত্ব এবং ফযিলত শিরোনামের আলোচনায় দেখুন।

যোহরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদি. -কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[২৫৬] তিরমিযি, হাদীস-৪২৮

আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে আমার ঘরে যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন। তারপর মসজিদে গিয়ে লোকদের নিয়ে যোহরের ফরয সালাত আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন। তিনি লোকদেরকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। এমনিভাবে তিনি লোকদেরকে নিয়ে ইশার সালাত আদায় করতেন, এরপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন।[২৫৭]

যোহরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

যে ব্যক্তি যোহরের (ফরযের) আগের চার রাকাত এবং যোহরের (ফরযের) পরের চার রাকাত সালাত নিয়মিত আদায় করে মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেন।[২৫৮]

এখানে যোহরের ফরয সালাতের পর যেই চার রাকাত সালাতের কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম দুই রাকাত সালাত হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আদায় করা অত্যাবশ্যক। আর পরের দুই রাকাত সালাত হচ্ছে নফল সালাত। এই আলাদা আদায় করা ঐচ্ছিক। করলে অনেক সওয়াব রয়েছে।

যোহরের দুই রাকাত নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত:

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

[২৫৭] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১২৫৩

[২৫৮] তিরমিযি, হাদীস-৪২৮

যে ব্যক্তি যোহরের (ফরযের) আগের চার রাকাত এবং যোহরের পরের চার রাকাত সালাত নিয়মিত আদায় করে মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেন।[২৫৯]

এখানে যোহরের ফরয সালাতের পর যেই চার রাকাত সালাতের কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম দুই রাকাত সালাত হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আদায় করা অত্যাবশ্যক। আর পরের দুই রাকাত সালাত হচ্ছে নফল সালাত। এই আলাদা আদায় করা ঐচ্ছিক। পড়লে অনেক সওয়াব রয়েছে। না পড়লে কোনো গোনাহ হবে না।

আপনার জিজ্ঞসার জবাব:

প্রশ্ন: যোহরের সালাতের শেষ সময় কোনটি? অর্থাৎ ঐ সময়টা কতক্ষণ পর্যন্ত যেই সময়ে যোহরের সালাত পড়লে আদায় হিসেবে বিবেচ্য হবে। কাযা বলে গণ্য হবে না।

উত্তর: যোহরের সালাতের সময় শুরু হয় সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে। আর এর সময়টা বাকী থাকে আসরের সালাতের সময় শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ যোহরের সালাতের শেষ সময় হলো আসরের সালাতের সময় শুরু হওয়ার পর্যন্ত। সুতরাং আসরের সালাতের সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই যোহরের সালাত পড়ে নিলে তা আদায় হিসেবে বিবেচ্য হবে। কাযা বলে গণ্য হবে না।

এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ

যোহরের সালাতের সময় শুরু হয় সূর্য (পশ্চিম দিকে) হেলে যাওয়ার পর। এর শেষ সময় হলো আসরের সালাতের সময় শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।[২৬০]

প্রশ্ন: কেউ যদি যোহরের ফরযের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত সালাত সময়মতো পড়তে না পারে তাহলে কী করণীয়?

[২৫৯] তিরমিযি, হাদীস-৪২৮

[২৬০] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস- ১৫১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ৭১৭২

উত্তর: কেউ যদি যোহরের ফরযের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত সালাত পড়তে না পারে তাহলে তার জন্য করণীয় হলো, সে ফরয সালাতের পর তা আদায় করে নিবে।[২৬১]

(তবে এটা সুন্নত হিসেবে আদায় হবে না বরং তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। কারণ এই সুন্নত সালাতের সময় ছিল ফরয সালাতের পূর্বে। সুতরাং ফরয সালাতের পূর্বে পড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তারপরও যদি না পড়া যায়, তাহলে পরে পড়তে পারবে বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।)

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের ফরজ সালাতের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত সালাতকে ফরয সালাতের পূর্বে পড়তে না পারলে ফরজের পরে তা আদায় করতেন।[২৬২]

আসরের সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়:

মাটিতে একটা লাঠি সোজা করে দাঁড় করিয়ে লাঠির মূল ছায়া ব্যতীত ঐ ছায়াটা বস্তুর দ্বিগুণ লম্বা হওয়ার পর থেকে আসরের সালাতের সময় শুরু হয়। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সময় বাকী থাকে। সুতরাং মাটিতে সোজা একটা লাঠি দাঁড় করিয়ে উল্লেখিত পদ্ধতিতে কিংবা নিজ এলাকার জন্য নির্ধারিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আসরের সালাতের সময় নির্ণয় করা যেতে পারে।

[২৬১] নবীজির নামায-২৩৫

[২৬২] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪২৬

এ বিষয়ে হাদীসে এভাবে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাফে রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা রাদি.-কে যোহরের সালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আবু হুরায়রা রাদি. বললেন, হ্যাঁ, আমি এ সম্পর্কে তোমাকে বলব। তুমি যোহরের সালাত আদায় করবে যখন তোমার ছায়া তোমার সমান হবে। তারপর যখন ছায়া তোমার দ্বিগুণ হবে তখন আসরের সালাত আদায় করবে। যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন মাগরিবের সালাত আদায় করবে।[২৬৩]

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যদি সূর্য হলুদ বর্ণ হয়ে যায় তাহলে আসরের সালাত আদায় করা মাকরূহ। যদিও মাকরূহ হয়ে যায় তবুও সালাত আদায় করতে হবে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকাত পড়ার সময় পায়, সে যেন তার সালাতকে পূর্ণ করে।[২৬৪]

সহীহ মুসলিমের মধ্যে আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে-

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

[২৬৩] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস-১২

[২৬৪] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৫৬

যখন তোমাদের কেউ সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকাত পড়ার সময় পায়, সে যেন পূর্ণ আসরকে পেল।[২৬৫]

সালাতের রাকাত সংখ্যাঃ

আসরের সালাত মোট আট রাকাত। প্রথমে চার রাকাত সুন্নত। তারপর চার রাকাত ফরয।

আসরের সালাতের সুন্নত কিরাতঃ

আসরের ফরয সালাতে সূরা তারিক থেকে সূরা বাইয়্যিনাহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সূরা সমূহ থেকে যে কোনো সূরা তিলাওয়াত করা। তবে এই সূরাগুলোকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বা বেশি প্রয়োজন মনে করা উচিত নয়। মাঝে মধ্যে ভিন্ন সূরাও পড়া যেতে পারে।

চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্বঃ

আসরের চার রাকাত ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত সালাত রয়েছে। এটি হলো ঐচ্ছিক সুন্নত সালাত। অর্থাৎ নিয়মিত না পড়লে গুনাহ হবে এমন নয়। বরং পড়লে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে। না পড়লেও কোনো গুনাহ নেই। তবে পড়া উত্তম। সময় সল্পতার কারণে চার রাকাত পড়তে না পারলে দুই রাকাতও পড়া যায়।

চার রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলতঃ

আসরের চার রাকাত সুন্নত সালাত যদিও না পড়লে কোনো গুনাহ নেই, তবে পড়লে অনেক সওয়াব রয়েছে। বেশ ফযিলত রয়েছে এই সালাতের।

আসরের সুন্নত সালাত আদায়কারীর উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করেনঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

[২৬৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১৪০৪

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহমত করুন, যে ব্যক্তি আসরের (ফরয সালাতের) পূর্বে চার রাকাত (সুন্নত সালাত) পড়ল।[২৬৬]

চার রাকাত ফরয সালাতের গুরুত্বঃ সালাতের গুরুত্ব এবং ফযিলত শিরোনামের আলোচনা দেখুন।

চার রাকাত ফরয সালাতের ফযিলতঃ

১. সালাতুল আসর ও ফজর মহান আল্লাহর কাছে সঙ্গে সঙ্গে পৌছানো হয়ঃ

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ একদল ফিরিশতা রাত্রে তোমাদের মধ্যে অবতরণ করেন। আরেক দল ফিরিশতা দিনের বেলায় তোমাদের অবতরণ করেন। উভয় দল ফিরিশতা সালাতুল ফজর এবং আসরের সময় একত্রিত হন। যে সব ফিরিশতা তোমাদের মাঝে রাত্র যাপন করেছেন তারা আসমানে চলে যান। মহান তাদের থেকে বেশি জানার পরও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায়

[২৬৬] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১২৭৩

রেখে এসেছ? জবাবে তারা বলেন, আমরা তাদেরকে সালাতরত পেয়েছিলাম এবং সালাতরত অবস্থায় রেখে এসেছি।[২৬৭]

২. আসর ও ফজরের সালাত পড়লে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না:

হাদীসে এসেছে-

عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

হযরত আবু বকর ইবনে ওমারা রাদি. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত আদায় করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[২৬৮]

নোট: উল্লেখিত হাদীসের উপর একটি প্রশ্ন ও উত্তর রয়েছে। তা জানার জন্য সালাতুল ফজরের আলোচনার শিরোনামে ফরজের ফযিলতে উল্লেখিত হাদীসে দেখুন।

৩. যে ব্যক্তি সালাতুল আসর আদায় করবে সে জান্নাতে যাবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

হযরত আবু বকর ইবনে আবু মূসা রাদি. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি দুই শীতের সালাত আদায় করবে অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৬৯]

---

[২৬৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৫৫

[২৬৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪৬৮

[২৬৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৭৪

৪. যে ব্যক্তি সালাতুল আসর ছেড়ে দিবে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

হযরত আবুল মালীহ (রাহি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মেঘাচ্ছন্ন দিনে কোনো একটি যুদ্ধে আমরা বুরাইদা রাদি.-এর সঙ্গে ছিলাম। বুরাইদা বললেন, সালাতুল আসর সময় হবার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করো। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সেচ্ছায় আসরের সালাত ছেড়ে দিয়েছে, তার আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।[২৭০]

৫. যে ব্যক্তি সালাতুল আসর ছেড়ে দিবে তার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যার আসরের সালাত ছুটে গেল, যেন তার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল।[২৭১]

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: পশ্চিম আকাশে সূর্য লাল হওয়ার পরও আসরের সালাত পড়া যায় কিনা? তখন কি কাযা পড়ার নিয়ত করতে হয়?

উত্তর: পশ্চিম আকাশে সূর্য লাল হওয়ার পরও আসরের সালাত পড়া যায়। তখন কাযা পড়ার নিয়ত করতে হয় না। তবে ইচ্ছা করে সূর্য পশ্চিম আকাশে লাল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা গুনাহ।

---

[২৭০] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৫৩

[২৭১] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৫২

মাগরিবের সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়ঃ

মাগরিবের সালাতের সময় হলো আসরের সালাতের শেষ সময়ে অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর থেকে সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার পর যে লালিমা দেখা যায় সেই লালিমার পর আকাশে একটি শুভ্রতা প্রকাশ পায়। ঐ শুভ্রতা মিটে যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময় বাকী থাকে। শীতকালীন সময়ে মাগরিবের আনুমানিক সময় হল প্রায় এক ঘন্টা ১০/১৫ মিনিট। আর গ্রীষ্মকালে এর সময় হলো প্রায় এক ঘন্টা ২৩/২৮ মিনিট। তবে এলাকার ব্যবধানে কিছুটা ব্যবধান হবে।[২৭২]

বর্তমান সময়ে নিজ এলাকার জন্য নির্ধারিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাগরিবের সালাতের সময় নির্ণয় করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

হযরত সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম, যখন সূর্য পর্দার আড়াল হয়ে যেত।[২৭৩]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাফে রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা রাদি.-কে যোহরের সালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আবু

[২৭২] (শরহে বেকায়া, আল-ফিকহুল মুয়াসসার)

[২৭৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৬১

হুরায়রা রাদি. বললেন, হ্যাঁ, আমি এ সম্পর্কে তোমাকে বলব। তুমি যোহরের সালাত আদায় করবে যখন তোমার ছায়া তোমার সমান হবে। তারপর যখন ছায়া তোমার দ্বিগুণ হবে তখন আসরের সালাত আদায় করবে। যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন মাগরিবের সালাত আদায় করবে।[২৭৪]

উল্লেখিত দুটি হাদীস (সালামা এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাফে রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) থেকে মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত জানা গেল।

আল-মুয়জামুল আওসাতে বর্ণিত হাদীসে মাগরিবের শেষ সময়ের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। জনৈক সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর এক পর্যায়ে সালাতের সময় হয়ে গেল।

ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى كَادَ يَغِيْبُ بَيَاضُ النَّهَارِ

অত:পর সূর্য অস্ত যাবার পর মাগরিবের আযান দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের সালাতকে এতো বিলম্ব করলেন যে আকাশের শুভ্রতা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।[২৭৫]

নোটঃ হাদীস থেকে জানা গেল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের সালাতকে এতো বিলম্ব করলেন যে আকাশের শুভ্রতা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এই শুভ্রতার পরই ইশার সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়। সুতরাং মাগরিবের সালাতের শেষ সময় হলো ইশার সালাতের সময় শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

মাগরিবের সালাতকে কিছুটা দ্রুত পড়া উত্তমঃ

হাদীসে এসেছে-

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ فَقَالَ

[২৭৪] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস-১২

[২৭৫] আল-মুয়জামুল আওসাত, হাদীস- ৬৭৮৭

شُغِلْنَا. قَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ

হযরত মারসাদ বিন আবদুল্লাহ রাদি. বলেন, আবু আইয়ুব রাদি. সৈনিক হিসেবে যে সময়ে মিশরে আগমন করলেন তখন ওকবা ইবনে আমের রাদি. মিশরের গভর্নর ছিলেন। একদিন ওকবা ইবনে আমের রাদি. মাগরিবের সালাতকে বিলম্ব করলেন। তখন আবু আইয়ুব রাদি. তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, হে ওকবা! এটি কোন ধরণের সালাত? তিনি জবাব দিলেন আমরা একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আবু আইয়ুব রাদি. বললেন, হে ওকবা! আপনি কী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শোনেন নি। তিনি বলেছেন: আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মধ্যে অথবা আসল অবস্থার মধ্যে থাকবে যতদিন তারা মাগরিবের সালাতকে আকাশের তারকারাজি আলো ছড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত বিলম্ব না করে এর আগেই সালাত পড়ে নিবে।[২৭৬]

নোট: হাদীসটি থেকে জানা গেল যে, মাগরিবের সালাতকে বেশি বিলম্ব না করা। আকাশের তারকার আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই পড়ে নেওয়া কল্যাণকর। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো মাগরিবের সালাতকে বিলম্ব করে পড়ার কারণ ছিল উম্মতকে মাগরিবের শেষ সময় শিক্ষা দেওয়া। বিলম্বে পড়া জায়েয থাকলেও অকারণে বিলম্ব করা উচিত নয়।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

মাগরিবের সালাত মোট সাত রাকাত। প্রথম তিন রাকাত ফরয। দুই রাকাত সুন্নত। তারপর দুই রাকাত নফল।

ফজরের সালাতের সুন্নত কিরাত:

মাগরিবের ফরয সালাতে সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত মধ্যবর্তী সূরা সমূহ থেকে যে কোনো সূরা তিলাওয়াত করা। তবে এই সূরাগুলোকে

[২৭৬] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস- ৪১৮

নির্দিষ্ট করে নেওয়া বা বেশি প্রয়োজন মনে করা উচিত নয়। মাঝে মধ্যে ভিন্ন সূরাও পড়া যেতে পারে।[২৭৭]

ফরয সালাতের গুরুত্ব:

সালাতের গুরুত্ব এবং ফযিলত শিরোনামের আলোচনা দেখুন।

ফরয সালাতের ফযিলত:

সালাতের গুরুত্ব এবং ফযিলত শিরোনামের আলোচনা দেখুন।

সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:

১. হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي . . . وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম . . . . মাগরিবের পরে বাড়িতে গিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন।[২৭৮]

২. হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

[২৭৭] ফাতওয়ায়ে শামী- ১/৩৯৯

[২৭৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৯৩৭

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদি. -কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে আমার ঘরে যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন। তারপর মসজিদে গিয়ে লোকদের নিয়ে যোহরের ফরয সালাত আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন। তিনি লোকদেরকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। এমনিভাবে তিনি লোকদেরকে নিয়ে ইশার সালাত আদায় করতেন, এরপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন।[২৭৯]

সুন্নত সালাতের ফযিলত:

মাগরিবের ফরয সালাতের পর দুই রাকাত সুন্নত সালাতের অনেক ফযিলত রয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ

(উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকাত (সুন্নত) সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। (ওই বারো রাকাত সালাত হলো) যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত এবং ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। মাগরিবের ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। ইশার ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। আর ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দুই রাকাত।[২৮০]

[২৭৯] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১২৫৩

[২৮০] তিরমিযি, হাদীস- ৪১৫

নফল সালাতের গুরুত্ব:

হযরত কাব ইবনে উজরা (রাহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْمَغْرِبَ قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। লোকেরা নফল সালাত আদায় করতে দাঁড়াল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এ সালাত অবশ্যই তোমাদের ঘরে আদায় করা উচিত।[২৮১]

নফল সালাতের ফযিলত:

সালাতের গুরুত্ব এবং ফযিলত শিরোনামের আলোচনা দেখুন।

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: মাগরিবের আযানের পর কতটুকু সময় বিলম্ব করে জামাত শুরু করা যায়?

উত্তর: মাগরিবের আযান হওয়ার পর দুই রাকাত সালাত আদায় করতে যেই পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হয় এই পরিমাণ বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। এর চেয়ে বেশি বিলম্ব করা মাকরূহ। এটি হানাফি মাযহাবের ভাষ্যমতে।

ইশার সালাতের আলোচনা

সালাতের সময়:

ইশার সালাতের সময় হলো, সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার পর যে লালিমা দেখা যায় সেই লালিমার পর আকাশে একটি শুভ্রতা প্রকাশ পায়। ঐ শুভ্রতা মিটে যাওয়ার পর থেকে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়। (আনুমানিক

[২৮১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৩০০

মাগরিবের এক ঘন্টা ২০/৩০ মিনিট পর থেকে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়।) ইশার সালাতের সময় বাকী থাকে সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ সাহরীর সময় শুরু হওয়া পূর্ব পর্যন্ত। তবে ইশার সালাতের সময়ের তিনটি পর্ব রয়েছে।

প্রথম পর্ব: মুস্তাহাব। এটি হচ্ছে, রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পর্ব: জায়েয। এটি হচ্ছে, অর্ধ রাত পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্ব: মাকরূহ। সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ সাহরীর সময় শুরু হওয়া পূর্ব পর্যন্ত।[২৮২]

আমরা এ বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করছি-

আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

যদি আমার উম্মতের কষ্টের আশংকা না করতাম তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অথবা অর্ধ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করার নির্দেশ করতাম।[২৮৩]

অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আমর (রাহি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদি.-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত (আদায় করা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: সূর্য পশ্চিম দিকে গড়ালেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের সালাত আদায় করতেন। সূর্য সতেজ থাকতেই আসরের সালাত আদায় করতেন। সূর্য অস্ত গেলেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। লোকজন

[২৮২] আহসানুল ফাতাওয়া-২/১৩০

[২৮৩] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-১৬৭

বেশি হলে ইশার সালাতকে একটু আগে আগেই আদায় করতেন। আর লোকজন কম হলে বিলম্বে আদায় করতেন।[২৮৪]

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

ইশার সালাত মোট সতের রাকাত। যথাক্রমে চার রাকাত সুন্নত। চার রাকাত ফরয। দুই রাকাত সুন্নত। দুই রাকাত নফল। তিন রাকাত বিতর। দুই রাকাত নফল।

ইশার সালাতের সুন্নত কিরাত:

ইশার ফরয সালাতে সূরা তারিক থেকে সূরা বাইয়্যিনাহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সূরা সমূহ থেকে যে কোনো সূরা তিলাওয়াত করা। তবে এই সূরাগুলোকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বা বেশি প্রয়োজন মনে করা উচিত নয়। মাঝে মধ্যে ভিন্ন সূরাও পড়া যেতে পারে।[২৮৫]

চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত:

ইশার সালাতের পূর্বে সময় পেলে চার রাকাত সুন্নত সালাত পড়া ভালো এবং অনেক সওয়াব। সময় কম হলে চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাতও পড়া যায়। না পড়লেও কোনো গুনাহ নেই।

চার রাকাত ফরয সালাতের গুরুত্ব:

সালাতের গুরুত্ব এবং ফযিলত শিরোনামের আলোচনা দেখুন।

চার রাকাত ফরয সালাতের ফযিলত:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

[২৮৪] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৬৫

[২৮৫] ফাতওয়ায়ে শামী-১/৩৯৯

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি লোকেরা আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারের সালাত আদায় করার সওয়াব সম্পর্কে অবগত হতো, তাহলে তারা এ সওয়াব অর্জন করার জন্য এমনভাবে প্রতিযোগিতা করতো, লটারী ব্যতীত এর কোনো সমাধানই পাওয়া যেতো না। আর যদি তারা জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা কত সওয়াব তাহলে তারা অবশ্যই প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করতো। আর যদি ইশা এবং ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করার ফযিলত জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে অংশগ্রহণ করত।[২৮৬]

ফরয সালাতের পর দুই রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদি. -কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে আমার ঘরে যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন। তারপর মসজিদে গিয়ে লোকদের নিয়ে যোহরের ফরয সালাত আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন। তিনি লোকদেরকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। এমনিভাবে তিনি লোকদেরকে নিয়ে ইশার

[২৮৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬১৫

সালাত আদায় করতেন, এরপর আমার ঘরে এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন।[২৮৭]

ফরয সালাতের পর দুই রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:

ইশার ফরয সালাতের পর দুই রাকাত সুন্নত সালাতের অনেক ফযিলত।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ

(উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকাত (সুন্নত) সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। (ওই বারো রাকাত সালাত হলো) যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত এবং ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। মাগরিবের ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। ইশার ফরয সালাতের পরে দুই রাকাত। আর ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দুই রাকাত।[২৮৮]

সালাতুল বিতর-এর পূর্ববর্তী নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত:

তবে এই সালাত পড়লে সওয়াব আছে। না পড়লে কোনো গুনাহ নেই।

হযরত সাদ ইবনে হিশাম বলেন-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنْزِلَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ أَطْوَلَ مِنْهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

[২৮৭] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১২৫৩

[২৮৮] তিরমিযি, হাদীস-৪১৫

‘উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত শেষ করে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দুই রাকাত সালাত পড়লেন। অতপর এর চেয়েও দীর্ঘ করে আরও দুই রাকাত সালাত পড়লেন। এরপর তিনি তিন রাকাত সালাতুল বিতর পড়লেন।’[২৮৯]

হাদীসটির সনদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ ব্যতীত সকল রাবী ইমামুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের নিকট নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং ইমাম নাসাঈ আরো অনেক মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে রাশেদকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। সুতরাং হাদীসের সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[২৯০]

সালাতুল বিতর:

আমরা সালাতুল বিতর সম্পর্কে আলাদা শিরোনামে একটু পরেই বিস্তারীত আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

সালাতুল বিতর-এর পরবর্তী নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত:

তবে এই সালাত পড়লে সওয়াব আছে। না পড়লে কোনো গুনাহ নেই।

হযরত সাদ ইবনে হিশাম বলেন-

عَنْ عَائِشَةَ . . . . ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ فِيهِنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَرْكَعُ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ جَالِسٌ

‘উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. . . . . . . এরপর তিনি তিন রাকাত সালাতুল বিতর পড়লেন। সালাতুল বিতরের মধ্যে দুই রাকাতের পর সালাম ফেরান নি। এরপর তিনি বসে বসে আরো দুই রাকাত সালাত পড়লেন। তিনি বসেই রুকু করতেন এবং বসেই সাজদা করতেন।’[২৯১]

---

[২৮৯] মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ২৫২২৩

[২৯০] মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ২৫২২৩

[২৯১] মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ২৫২২৩

হাদীসটির সনদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ ব্যতীত সকল রাবী ইমামুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের নিকট নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং ইমাম নাসাঈ আরো অনেক মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে রাশেদকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। সুতরাং হাদীসের সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[২৯২]

সালাতুল বিতরের আলোচনা

আমরা ইতোঃপূর্বে ইশার সালাতের আলোচনাতে একথা বলেছি যে, সালাতুল বিতর এর আলোচনা একটু বিস্তারীত করব। আমরা সালাতুল বিতর বিষয়ক যে আলোচনা করব তা সহজে বুঝার জন্য এবং মনে রাখার সুবিধার্থে আলোচনাকে ১০ টি শিরোনামে উপস্থাপন করব।

১. সালাতুল বিতর এর সময়:

২. ইসলামে সালাতুল বিতর এর বিধান/হুকুম:

৩. সালাতুল বিতর এর গুরুত্ব:

৪. ইসলামে সালাতুল বিতর এর ফযিলত:

৫. সালাতুল বিতর এর রাকাত সংখ্যা:

৬. সহীহ হাদীসের আলোকে কুনূত পড়ার সময়:

৭. সালাতুল বিতিরের দুআয়ে কুনূত ও কিছু কথা:

৮. দুআয়ে কুনূত এর আগে-পরে হাত উঠানোর বিধান:

৯. আপনাদের কাছে আমাদের প্রস্তাব:

১০. আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

---

[২৯২] মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ২৫২২৩

শিরোনামের পর এবার বিস্তারীত:

১. সালাতুল বিতর এর সময়:

সালাতুল বিতর সময় হলো সালাতুল ইশার পর থেকে সুবহে সাদিক (শেষ রাত্রে পূর্বাকাশে সাদা রেখা পরিলক্ষিত হওয়া পর্যন্ত) অর্থাৎ সাহরীর সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। তবে কেউ যদি ইশার সালাতের পূর্বে বিতর পড়ে নেয় তাহলে ইশার সালাতের পর পুনরায় বিতর পড়ে নেয়া ওয়াজিব।[২৯৩]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

'হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে কারো আশঙ্কা হলে সে যেন রাতের প্রথমভাগেই (ইশার সালাতের) পর বিতর আদায় করে নেয়। আর কেউ যদি শেষ রাতে জাগ্রত হতে পারবে বলে নিশ্চিত হয় তাহলে সে যেন শেষভাগে সালাতুল বিতর আদায় করে নেয়। কেননা শেষ রাতের সালাতে ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন। আর এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা।'[২৯৪]

হযরত খারিজা ইবনে হুযায়ফা রাদি. বলেন-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন আল্লাহ তায়ালা এমন এক সালাত প্রদান করেছেন যা

[২৯৩] (শরহে বেকায়া, আল-ফিকহুল মুয়াসসার)

[২৯৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১৮০২; সহীহ মুসলিম, ই.ফা. হাদীস- ১৬৩৬

তোমাদের জন্য লাল উট থেকেও বেশি উত্তম। সালাতটি হল বিতর। এ সালাতের সময় হলো ইশা থেকে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।[২৯৫]

২. ইসলামে সালাতুল বিতর এর বিধান/হুকুম:

ইসলামি নীতি ও আইন শাস্ত্রের সকল নির্ভরযোগ্য কিতাবে সালাতুল বিতরকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। সালাতুল বিতর সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বিতর অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব)। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতর অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব)। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতর অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব)। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়।[২৯৬]

হযরত খারিজা ইবনে হুযায়ফা রাদি. বলেন-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন আল্লাহ তায়ালা এমন এক সালাত প্রদান করেছেন যা তোমাদের জন্য লাল উট থেকেও বেশি উত্তম। সালাতটি হল বিতর। এ সালাতের সময় হলো ইশা থেকে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।[২৯৭]

[২৯৫] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৫২

[২৯৬] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪২১

[২৯৭] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৫২

নোট: এখানে হযরত খারিজা ইবনে হুযায়ফা রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর এ কথা তো সকলেরই জানা যে, শুধু ফরয এবং ওয়াজিবের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা হয়ে থাকে। আর সুন্নাত এবং নফলের সম্বন্ধ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে করা হয়ে থাকে। সুতরাং সুন্নাত নয়। সালাতুল বিতর ওয়াজিব।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

হযরত আবু আইউব আনসারী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর সালাতুল বিতর আদায় করা অত্যাবশ্যক।[২৯৮]

৩. সালাতুল বিতর এর গুরুত্ব:

ক. সালাতুল বিতর আদায়ের নির্দেশ:

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বলেন, আমাকে আমার বন্ধু আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন; মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত আমি সেগুলো পরিত্যাগ করব না। তা হচ্ছে-

صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

ক. প্রতিমাসে তিন দিন সিয়াম (রোযা) পালন করা। খ. সালাতুদ দোহা (ইশরাক ও চাশতের নামায)। গ. সালাতুল বিত্র (বিতরের নামায) আদায় করে ঘুমানো।[২৯৯]

খ. সালাতুল বিতর প্রত্যেক মুসলমানের উপর অত্যাবশ্যক:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

[২৯৮] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪২৪

[২৯৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৭৮

হযরত আবু আইউব আনসারী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর সালাতুল বিতর আদায় করা অত্যাবশ্যক।[৩০০]

গ. সালাতুল বিতর না পড়লে সে রাসূলের পরিপূর্ণ উম্মত নয়:

হযরত বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বিতর অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব)। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতর অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব)। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতর অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব)। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়।[৩০১]

৪. ইসলামে সালাতুল বিতর এর ফযিলত/মর্যাদা:

সালাতুল বিতর এর অনেক ফযিলত রয়েছে। আমরা এখানে কিছু ফযিলতের কথা আলোচনা করছি।

ক. সালাতুল বিতর লাল উট থেকেও বেশি উত্তম:

ইতোপূর্বে আমরা হযরত খারিজা ইবনে হুযায়ফা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে একটি ফযিলতের কথা জানতে পেরেছি। হাদীসটি আমরা আবারও উল্লেখ করছি। হযরত খারিজা ইবনে হুযায়ফা রাদি. বলেন-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

[৩০০] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪২৪

[৩০১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪২১

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন আল্লাহ তায়ালা এমন এক সালাত প্রদান করেছেন যা তোমাদের জন্য লাল উট থেকেও বেশি উত্তম। সালাতটি হল বিতর। এ সালাতের সময় হলো ইশা থেকে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।[৩০২]

খ. সালাতুল বিতর পড়লে মহান আল্লাহ খুশি হন:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

হযরত আলী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: হে আহলে কুরআন! হে মুসলমান) তোমরা বিতর সালাত আদায় কর। কেননা মহান আল্লাহ বিতর (বিজোড়)। অতএব তিনি বিজোড়কে পছন্দ করেন।[৩০৩]

৫. সালাতুল বিতর এর রাকাত সংখ্যা:

আমরা জানি যে, দুরাকাতের কমে কোনো সালাত নেই। সালাতের সর্ব নিম্ন সংখ্যা হলো দুই রাকাত। তবে দুই রাকাতের চেয়ে বেশি রয়েছে। যেমন, তিন রাকাত, চার রাকাত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, সালাতুল বিতর সর্বনিম্ন তিন রাকাত।

হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত-

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

[৩০২] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৫২

[৩০৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৪১৬

তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত কেমন হতো? তিনি বললেন, (শুধু রমযান মাসে কেন?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ও অন্যান্য মাসেও এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাকাত পড়তেন। এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলব! এরপর তিনি আবার চার রাকাত পড়তেন। এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্যতা বর্ণনাতীত। এরপর তিনি তিন রাকাত (বিতর) পড়তেন।[৩০৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ) فَقَرَأَ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠলেন। মিসওয়াক করলেন এবং ওযূ শেষ করে সূরা আলে ইমরানের ১৯৪ নং আয়াত থেকে সূরার শেষ অর্থাৎ ২০০ নং আয়াত পর্যন্ত পড়লেন। তারপর তিনি দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। এতে কিয়াম-কিরাত, রুকু, সাজদাহ দীর্ঘ করলেন। সালাত শেষ করে তিনি শুইলেন। নাক ডাকালেন। পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবারে মোট ছয় রাকআত সালাত আদায় করলেন। প্রত্যেক সালাতের পূর্বে তিনি মিসওয়াক করতেন এবং ওযূ করতেন। আর সূরা আলে ইমরানের ঐ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন।

[৩০৪] সহীহ বুখারী, হাদীস- ১১৪৭

তারপর তিনি তিন রাকাত বিতর পড়লেন। যখন মুয়াযযিন আযান দিলেন তখন তিনি সালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন।'[৩০৫]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. বলেন-

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের প্রথম রাকআতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তেন।[৩০৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে আট রাকাত তাহাজ্জুদ সালাত পড়তেন। বিতর পড়তেন তিন রাকাত।[৩০৭]

হযরত সাদ ইবনে হিশাম বলেন-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنْزِلَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ أَطْوَلَ مِنْهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ فِيهِنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَرْكَعُ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ جَالِسٌ

'উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত শেষ করে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দুই রাকাত সালাত পড়লেন। অতপর এর চেয়েও দীর্ঘ করে আরও

[৩০৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮৩৫

[৩০৬] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৬৩

[৩০৭] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস- ১৭০৬

দুই রাকাত সালাত পড়লেন। এরপর তিনি তিন রাকাত সালাতুল বিতর পড়লেন। সালাতুল বিতরের মধ্যে দুই রাকাতের পর সালাম ফেরান নি। এরপর তিনি আরো বসে বসে দুই রাকাত সালাত পড়লেন। তিনি বসেই রুকু করতেন এবং বসেই সাজদা করতেন।'[৩০৮]

হাদীসটির সনদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ ব্যতীত সকল রাবী ইমামুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের নিকট নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং ইমাম নাসাঈ আরো অনেক মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে রাশেদকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। সুতরাং হাদীসের সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[৩০৯]

উপরোক্ত দলীলসমূহ থেকে প্রমাণ হয় যে, বিতরের সালাত তিন রাকাত হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। বিশেষ করে বিতর সালাতের ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদি. ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল বিতর তিন রাকাত পড়তেন। অন্যদিকে এক রাকাত বিতর পড়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অনেকের মতেই এক রাকাত বিতর পড়া ঠিক নয়। তাই দলীলের বিচারে যেমন তিন রাকাত বিতর পড়া উচিত। ঠিক তেমনিভাবে সতর্কতার খাতিরেও বিতরের সালাত তিন রাকাত পড়া উচিত।

৬. সহীহ হাদীসের আলোকে কুনূত পড়ার সময়:

সালাতুল বিতরে দুআয়ে কুনূত পড়তে হয়। পড়া ওয়াজিব। পড়তে হবে সালাতুল বিতরের তৃতীয় রাকআতে। সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোনো সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়ার পর। অবশ্যই রুকুতে যাবার আগেই পড়তে হবে। এ সম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের আমলের কথা উল্লেখ করবো।

[৩০৮] মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ২৫২২৩

[৩০৯] মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ২৫২২৩

হযরত আসেম (রাহ.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ قَبْلَهُ. قُلْتُ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: كَذَبَ. إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا؛

আমি হযরত আনাস রাদি. কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, কুনূত পড়ার বিধান রয়েছে। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করেছি, রুকুর আগে নাকি রুকুর পরে? তিনি বলেছেন রুকুর আগে আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, আপনি নাকি রুকুর পরে কুনূত পড়ার কথা বলেন। তিনি বললেন, সে ভুল বলেছে। রুকুর পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু এক মাস কুনূত পড়েছিলেন।[৩১০]

উল্লেখিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন-

وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في المغازي بلفظ سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة قال لا بل عند الفراغ من القراءة ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع ؛ فتح الباري: باب القنوت قبل الركوع او بعده

হযরত আসেম (রাহ.)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আব্দুল আযীয ইবনে সুহাইব। বর্ণনাটি মাগাযী অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। সে বর্ণনায় রয়েছে যে, এক ব্যক্তি আনাস রাদি.-কে জিজ্ঞাসা করল, কুনূত রুকুর পরে পড়বে, নাকি (রুকুর আগে) অর্থাৎ ক্বিরাত শেষ হওয়ার পর? তিনি উত্তরে বললেন, ক্বিরাত শেষ হওয়ার পর পড়বে, অর্থাৎ রুকুর আগে পড়বে।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন, কুনূত বিষয়ে আনাস রাদি. থেকে যতগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় তার সার নির্যাস হলো এই যে,

---

[৩১০] সহীহ বুখারী, হাদীস-১০০২

যে কুনূত বিশেষ উদ্দেশ্যে পড়া হয় তা হবে রুকুর পরে। হযরত আনাস রাদি. থেকে সকল বর্ণনায় একথাই এসেছে। আর সাধারণ কুনূত যা সব সময় পড়া হয় সে সম্পর্কে (বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেলেও) রুকুর আগে কুনূত পড়ার কথাই হলো সহীহ বর্ণনা।[৩১১]

হযরত উবাই ইবনে কাব রাদি. বলেন-

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতর পড়তেন। তিনি রুকুর আগে কুনূত পড়তেন।[৩১২]

রুকুর আগে কুনূত পড়া সম্পর্কে সাহাবাদের আমলঃ

সাহাবি হযরত আল-কামা রাদি. বলেন-

اَنَّ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِيْ الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিগণ বিতর সালাতে রুকুর আগে দুআয়ে কুনূত পড়তেন।[৩১৩]

৭. সালাতুল বিতিরের দুআয়ে কুনূত ও কিছু কথাঃ

বিভিন্ন হাদীসে কয়েকটি দুআয়ে কুনূত বর্ণিত হয়েছে। আমরা এখানে দুটি দুআয়ে কুনূত উল্লেখ করেছি।

দুআয়ে কুনূত -১

اللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

---

[৩১১] ফাতহুল বারী

[৩১২] ইবনে মাযাহ, হাদীস-১১৮২

[৩১৩] মুসান্নাফু ইবনে আবী শাইবা, হাদীস-৬৯১১

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান করুন, যাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন তাদের সাথে। আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে। আমাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করুন, যাদেরকে আপনি ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে। আপনি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন। আপনি যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করেন। আপনার বিষয় কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আপনি যাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে অপমানিত হবে না। আর আপনি যাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে কখনো সম্মানিত হবে না। মহামহিমান্বিত বরকতময় আপনি, হে আমাদের প্রভু, মহামর্যাদাময় ও সর্বোচ্চ আপনি।[৩১৪]

নোটঃ শব্দের সামান্য ব্যতিক্রমসহ অন্যান্য বর্ণনায়ও এ দুআ এসেছে। সকল বর্ণনার দুআগুলোকে একসাথে করলে পূর্ণ দুআটি যেভাবে পড়া যায় তা আমরা দুআয়ে কুনূত-২ শিরোনামে এখানে উল্লেখ করেছি।

দুআয়ে কুনূত -২

اللّٰهمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللّٰهمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনার কাছে মাগফিরাত কামনা করি, আপনার প্রতি ঈমান রাখি, আপনার উপর ভরসা করি এবং উত্তম প্রশংসা করি। আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করি। অকৃতজ্ঞ হই না। আমরা বিচ্ছিন্ন হই এবং পরিত্যাগ করি তাকে যে আপনার অবাধ্য। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি, একমাত্র আপনার জন্যই সালাত আদায় করি এবং সাজদাহ আদায় করি। শুধু আপনার দিকেই ধাবিত হই। আপনার দাসত্ব অবলম্বন করি। আমরা আপনার

[৩১৪] আবু দাউদ, হাদীস-১৪২৭; তিরমিযি, হাদীস-৪৬৪

রহমতের আশা করি এবং আপনার শাস্তির ভয় করি। নিশ্চয় আপনার শাস্তি কাফিরদেরকে স্পর্শ করবে।[৩১৫]

বিতির সালাতের পরের দুআঃ

اللّٰهمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، لَا أُحصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

হে আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাই। আপনার শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাই। আপনার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। আপনি সেই প্রশংসার যোগ্য যা আপনি নিজেই করেছেন।[৩১৬]

নোটঃ এই দুআটি বিতির নামাযের সালামের আগে পড়তে হবে নাকি সালামের পরে পড়তে হবে সেটা স্পষ্ট নয়। সুনানে আবু দাউদ এর **১৪২৯** নং হাদীস থেকে জানা যায় যে, দুআটি বিতির সালাতের সালাম ফিরানোর পরে পড়তে হবে। আর সুনানে তিরমিযি এর ৩৫৬৬ নং হাদীস থেকে জানা যায় যে দুআটি বিতির সালাতের সালাম ফিরানোর আগেই পড়তে হবে। দুভাবেই পড়া যেতে পারে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

৮. দুআয়ে কুনূত এর আগে তাকবীর বলে হাত উঠানো এবং দুআয়ে কুনূত পড়াঃ

সালাতুল বিতরের শেষ রাকাতে দুআয়ে কুনূত পড়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান বরাবর হাত উঠাতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. এর আমলঃ

أَنَّه كَانَ يَقْرَأُ فِيْ اٰخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

‘তিনি বিতরের শেষ রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন। এরপর হাত উঠাতেন। তারপর তিনি রুকুর পূর্বে দুআয়ে কুনুত পড়তেন।’[৩১৭]

[৩১৫] আল-বাহরুর রায়িক এবং যাদুল মাআদ

[৩১৬] তিরমিযি, হাদীস-৩৫৬৬; আবু দাউদ, হাদীস-১৪২৯

৯. আপনাদের কাছে আমাদের প্রস্তাব:

আমাদের এতোক্ষণের দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে সালাতুল বিতির তিন রাকাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মক্কা-মদীনাসহ বিশ্বের প্রায় সব জায়গাতে তিন রাকাত করেই পড়া হচ্ছে। সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক এবং ভিত্তিহীন বর্ণনার উপর নির্ভর করে তিন রাকাতের কমের পক্ষে নতুন মতবাদ চালু করা শুভবুদ্ধির পরিচয় মনে করা যায় না। কেউ যদি এক রাকাত আদায় করতে চায় তাহেল সে এক রাকাত আদায় করুক। এতে সমস্যা নেই। তবে সমস্যা হলো, যারা তিন রাকাত বিতির আদায় করেন তাদেরকে বিদআতী বলা। এখানে মনে রাখতে হবে সালাতুল বিতির নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করা মোটেও ঠিক হবে না। আমাদের দেশে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যে গুলো নিয়ে আলোচনা করা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যেমন- সুদ, ঘুষ, চুরির বিচার, ইভটিজিং, যৌতুক, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি।

১০. আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: আমরা ইতিপূর্বে হাদীসের আলোকে জানতে পেরেছি যে, দুআয়ে কুনূত রুকুর পূর্বেই পড়তে হবে। কিন্তু যে সব হাদীসে দুআয়ে কুনূতকে রুকুর পরে পড়তে বলা হয়েছে, সে সব হাদীসের ব্যপারে কী বলবেন? আমরা সে সব হাদীসের উপর আমল করি না কেন?

উত্তর: বিতর সালাতের রুকু করার পর দুআয়ে কুনূত পড়ার কথা যে সব হাদীসে বলা হয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হাদীস হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রাহ.) থেকে বর্ণিত।

হাদীস-

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ
قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

[৩১৭] ইমামুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী রাহি. এর রচিত 'জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন' পৃ.-১৮

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক রাদি. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ফজরের সালাতে দুআয়ে কুনূত পড়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি কি রুকুর পূর্বে কুনূত পড়েছেন? আনাস রাদি. বললেন, তিনি কিছু দিন রুকুর পরে পড়েছেন।[৩১৮]

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পারি যে, উল্লেখিত হাদীসটিতে যে কুনূতের কথা বলা হয়েছে, তা সালাতুল ফজরের সময়ের কথা বলা হয়েছে। অথচ আমরা যে কুনূতের কথা বলছি তা হচ্ছে সালাতুল বিতরের। সুতরাং সালাতুল ফজরের কুনূতকে সালাতুল বিতরের মধ্যে প্রয়োগ করার অবকাশ নেই। কারণ আমরাও মুসলিম উম্মাহর জাতীয় বিপদের সময়ে সালাতুল ফজরের সময়ে যে কুনূত পড়ি তা রুকুর পরে। আর যেহেতু সালাতুল বিতরের কুনূত সম্পর্কে সহীহ বুখারীসহ আরো অনেক কিতাবে বর্ণিত হাদীসে একথা বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতর সালাতে দুআয়ে কুনূত রুকুর আগেই পড়েছেন। তাই সালাতুল বিতরের মধ্যে দুআয়ে কুনূত রুকুর আগে পড়তে হবে। আমরা এ সম্পর্কে সহীহ হাদীসের আলোকে কুনূত পড়ার সময় শিরোনামে কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছি।

প্রশ্ন: কেউ যদি সময়মতো সালাতুল বিতর পড়তে না পারে, তাহলে তার জন্য কী করণীয়?

উত্তর: সালাতুল বিতর এর সময় হলো ইশা থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য তাহাজ্জুদ সালাতের পর বিতর পড়া উত্তম। অন্যরা ইশার সালাতের পরই বিতর সালাত আদায় করে নিবে। কেউ যদি সময়মতো বিতর আদায় করতে না পারে তাহলে পরে কাযা করতে হবে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ

[৩১৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-১০০১

যে ব্যক্তি বিতর ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকল কিংবা তা ভুলে গেল, সে যেন স্মরণ হওয়ার পর তা আদায় করে নেয়।[৩১৯]

বায়হাকীতে আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ

যে ব্যক্তি বিতর ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকল কিংবা তা ভুলে গেল, সে যেন সকাল বেলায় অথবা স্মরণ হওয়ার পর তা আদায় করে নেয়।[৩২০]

যেহেতু বর্তমান সময়ের মানুষ কর্মব্যস্ত তাই সালাতুল বিতর ইশার পর পরই অর্থাৎ ঘুমানোর আগেই আদায় করে নেয়া উত্তম। হযরত আবু হুরাইরা রাদি. বলেন, আমাকে আমার বন্ধু আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন; মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত আমি সেগুলো পরিত্যাগ করব না। তা হচ্ছে-

صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

ক. প্রতিমাসে তিন দিন সিয়াম (রোযা) পালন করা। খ. সালাতুদ দোহা (ইশরাক ও চাশতের নামায)। গ. সালাতুল বিত্‌র (বিতরের নামায) আদায় করে ঘুমানো।[৩২১]

প্রশ্ন: কুনূত পড়ার সময় হাত বাঁধা থাকবে নাকি ছাড়া থাকবে?

উত্তর: এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, সালাতের কিছু স্থানে নির্দিষ্ট দুআ রয়েছে এবং আরও কিছু স্থানে দুআ পড়ার সুযোগ রয়েছে। যেমন- শেষ বৈঠকে দুআ করা। দুই সাজদার মধ্যে দুআ করা ইত্যাদি। আবার নফল সালাতের সাজদার মধ্যেও দুআ করার সুযোগ রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে দুআ করার সময় সালাতের স্বাভাবিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ সালাতের যে রুকনে দুআ করা হচ্ছে, দুআর কারণে সে রুকনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না। এটা সকল সালাতের সাধারণ নিয়ম।

[৩১৯] আবু দাউদ

[৩২০] সুনানুল বায়হাকী, হাদীস-৪৩১০

[৩২১] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৭৮

সুতরাং সালাতে দুআ করার এই সাধারণ নিয়ম থেকে বোঝা যায় যে, সালাতুল বিতর এর রুকুর আগে যখন দুআয়ে কুনূত পাঠ করা হবে, তখন হাত বাঁধা অবস্থায় দুআয়ে কুনূত পাঠ করা হবে। তখন হাত ছাড়া অবস্থায় রাখতে হবে না।[৩২২]

প্রশ্ন: আমরা ইতিপূর্বে হাদীসের আলোকে জানতে পেরেছি যে, সালাতুল বিতর তিন রাকাত। কিন্তু যে সব হাদীসে সালাতুল বিতর এক রাকাত বলা হয়েছে, সে সব হাদীসের ব্যপারে কী বলবেন? আমরা সে সব হাদীসের উপর আমল করি না কেন?

উত্তর: আপনার প্রশ্ন সঠিক। এখানে আমরা সালাতুল বিতর এক রাকাত সম্পর্কিত সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস উল্লেখ করব। তার পর সে হাদীসের উপর আলোচনা করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করব।

সালাতুল বিতর এক রাকাত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস:

আনাস ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত:

قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ
فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রাদি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সালাতে কিরাত দীর্ঘ করব? এ ব্যপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাত দুই, দুই রাকাত করে আদায় করতেন, এবং এক রাকাত বিতর আদায় করতেন।[৩২৩]

প্রশ্ন: সালাতুল বিতরের প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা পড়তে হবে নাকি?

উত্তর: হ্যাঁ, পড়তে হবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. বলেন-

[৩২২] নবীজীর নামায, পৃ.২৪৮

[৩২৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-৯৫৫

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের প্রথম রাকআতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তেন।[৩২৪]

নোট: তবে তিনি সালাতুল বিতরের মধ্যে অন্যান্য সূরাও পড়তেন।

সালাতুল জুমার আলোচনা

সালাতের সময়:

ঠিক দ্বি-প্রহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সালাতুল জুমার সময় শুরু হয়। আর প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত ঐ ছায়াটা বস্তুর দ্বিগুণ লম্বা হওয়া পর্যন্ত সালাতুল জুমার সময় বাকী থাকে। সুতরাং মাটিতে সোজা একটা লাঠি দাঁড় করিয়ে উল্লেখিত পদ্ধতিতে কিংবা নিজ এলাকার জন্য নির্ধারিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সালাতুল জুমার সময় নির্ণয় করা যেতে পারে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সূর্য (পশ্চিম দিকে) হেলে যেতো তখন সালাতুল জুমআ আদায় করতেন।[৩২৫]

---

[৩২৪] সুনানুত তিরমিযি

[৩২৫] সহীহ বুখারী, হাদীস-৯০৪

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

জুমার সালাত মোট বার রাকাত। চার রাকাত সুন্নত। দুই রাকাত ফরয। দুই রাকাত সুন্নত। এরপর চার রাকাত সুন্নত।

সালাতুল জুমার ফযিলত:

সালাতুল জুমার অনেক ফযিলত রয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি ফযিলত আলোচনা করব।

১. জুমার দিনে মসজিদে প্রথম গমন করলে উট কুরবানীর সওয়াব:
২. তারপর যারা গমন করবে তাদের জন্য গাভী কুরবানীর সওয়াব:
৩. তারপর যারা গমন করবে তাদের জন্য দুম্বা কুরবানীর সওয়াব:
৪. তারপর যারা গমন করবে তাদের জন্য মুরগী কুরবানীর সওয়াব:
৫. তারপর যারা গমন করবে তাদের জন্য ডিম কুরবানীর সওয়াব:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমার জন্য উত্তম রূপে গোসল করে এবং মসজিদে গমন করে, সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে গমন করে, সে যেন গাভী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ে গমন করে, সে যেন দুম্বা কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ পর্যায়ে গমন করে, সে যেন মুরগী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি পঞ্চম পর্যায়ে গমন করে, সে যেন ডিম কুরবানী করল। তারপর ইমাম যখন (খুতবা প্রদানের

উদ্দেশ্যে) বের হন তখন ফিরিশতাগণ তাঁদের কার্যক্রম বন্ধ করে মনোযোগের সাথে খুতবা শুনতে থাকেন।[৩২৬]

৬. এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সমস্ত (ছোট-খাট) গুনাহ মাফ করা হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

হযরত সালমান ফারসী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য পবিত্রতা অর্জন করে। নিজের তেল থেকে ব্যবহার করে অথবা নিজের ঘর থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করে। এরপর মসজিদে গমন করে। অহেতুক কোনো কাজ না করে। তারপর নির্ধারিত সালাত আদায় করে। ইমাম সাহেব খুতবা প্রদানের সময় চুপ থাকে। তাহলে ঐ জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত (ছোট-খাট) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৩২৭]

৭. শুক্রবারের বিশেষ মুহূর্তে যে কোনো দুআ কবুল করা হয়:

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে এসেছে-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

[৩২৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৮১

[৩২৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৮৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার খুতবার সময় বললেন: এই দিনে এমন একটি মুহুর্ত রয়েছে, সে মুহুর্তে কোনো মুসলমান সালাতে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করবে, তিনি তাকে সেটা প্রদান করবেন। তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন, সেই মুহুর্তটি অতি অল্প সময়।[৩২৮]

৮. শুক্রবারের বিশেষ মুহূর্তে কল্যাণের দুআ কবুল করা হয়:

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ

নিশ্চয় শুক্রবারে একটি সময় আছে, যে সময়ে কোনো মুসলিম দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা প্রদান করবেন।[৩২৯]

শুক্রবারের বিশেষ মুহূর্তে আল্লাহ মুমিনের দুআ কবুল করবেন, সেই বিশেষ মুহূর্ত কোনটি? এ বিষয়ে সাহাবি ও তাবেয়ীগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। কোনো বিবরণে উল্লেখ আছে যে, খুতবা প্রদান করার সময়, বা দুই খুতবার মাঝখানে। এই সময়ে মুমিন দুআ করলে তা কবুল করা হয়। তবে অধিকাংশ আলিমই বলেছেন সেটা হচ্ছে শুক্রবার দিন সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত দুআ কবুলের সময়।

হাদীসে এসেছে-

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ

হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জুমার দিনে যেই মুহূর্তে দুআ কবূলের আশা করা যায়, তোমরা সেই মুহূর্তটিকে আসর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে তালাশ করো।[৩৩০]

[৩২৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৯৩৫

[৩২৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-৫২৯৪

[৩৩০] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৮৯

৯. সালাতুল জুমআ মধ্যবর্তী সময়ে সংঘঠিত গুনাহকে মুছে দেয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তাদের সমস্ত (ছগীরা অর্থাৎ ছোট-খাট) গুনাহকে মুছে দেয়। (যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং নিয়মিতভাবে জুমআ আদায় করেন।)[৩৩১]

১০. প্রতি কদমে এক বছর নফল ইবাদত করার সমান হবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنِ أَوْسِ بْنِ أَوْس الثَّقَفِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

হযরত আউস ইবনে আউস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন ভালোভাবে গোসল করবে অত:পর সকাল-সকাল প্রস্তুত হয়ে কোনো কিছুতে আরাহন হওয়া ব্যতীত (পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়ে) ইমামের নিকট বসবে এবং কোনো অনর্থক কাজ না করবে, তার প্রতি কদমে এক বছর নফল সালাত ও সিয়ামের (নামায-রোযার) সমান সওয়াব হবে।[৩৩২]

১১. সপ্তাহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন:

হাদীসে এসেছে-

أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ

[৩৩১] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৩

[৩৩২] আবু দাউদ, হাদীস-৩৪৫

مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ

আউস ইবনে আউস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। এই দিনে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনেই তাকে মৃত্যু দেওয়া হয়েছে। এই দিনেই শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং তাতে বিকট আওয়াজ হবে। সুতরাং তোমরা এই দিনে আমার উপর বেশি করে দরূদ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে অবশ্যই প্রেরণ করা হয়। তখন সাহাবিদের থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিভাবে আমাদের দরূদ আপনার উপর প্রেরণ করা হবে? অথচ আপনি অচিরেই মাটির সাথে একাকার (ইন্তিকাল) হয়ে যাবেন। তিনি বললেন: নিশ্চয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীদের দেহকে ভক্ষণ করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[৩৩৩]

১২. জুমার দিন মৃত্যুবরণকারীর কবরের শাস্তি ক্ষমা করা হবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন মুসলমান জুমার দিনে অথবা রাতে মৃত্যুবরণ করলে মহান আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।[৩৩৪]

[৩৩৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১০৪৯

[৩৩৪] সুনানুন তিরমিযি, হাদীস-১০৭৪

১৩. জুমার দিনটি মুসলমানের জন্য ঈদের দিন:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই (জুমার) দিনকে মুসলমানের জন্য ঈদের দিন নির্ধারণ করছেন। অতএব যে ব্যক্তি সালাতুল জুমআ আদায় করতে চায় সে যেন অবশ্যই গোসল করে নেয়। সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করে। মিসওয়াক করা অত্যাবশ্যক।[৩৩৫] (শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

সালাতুল জুমআ না পড়ার পরিণাম:

১. সালাতুল জুমআ না পড়লে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাবে:

হাদীসে এসেছে-

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন, তিনি তাঁর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছেন: সাবধান! লোকেরা যেন সালাতুল জুমআ পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে সিল মেরে দিবেন। তারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাবে।[৩৩৬]

[৩৩৫] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-১০৯৮

[৩৩৬] সহীহ মুসলিম হাদীস-২০৩৯

২. সালাতুল জুমআ না পড়লে অন্তরে সিল মেরে দেওয়া হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

হযরত আবুল জাদ আয-যামরী রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিন দিন জুমআ পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহ তার অন্তরে সিল মেরে দেন।[৩৩৭]

সালাতুল জুমআ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ:

নিম্নলিখিত শর্তগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে, শুধু তার উপর সালাতুল জুমআ ফরয। সুতরাং যার মধ্যে এই শর্তগুলো পাওয়া যাবে না, তার উপর সালাতুল জুমআ ফরয নয়।

১। পুরুষ হওয়া। পুরুষের উপর সালাতুল জুমআ ফরয। মহিলাদের উপর সালাতুল জুমআ ফরয নয়।

২। মুসাফির না হওয়া। কারণ, মুসাফিরের উপর সালাতুল জুমআ ফরয নয়।

৩। সুস্থ হওয়া। সুস্থ ব্যক্তির উপর সালাতুল জুমআ ফরয। অসুস্থ ব্যক্তির উপর সালাতুল জুমআ ফরয নয়।

৪। নিরাপদ হওয়া। অতএব জালেমের জুলুম থেকে যে আত্মগোপন করেছে, তার জন্য সালাতুল জুমআ ফরয নয়।

৫। দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া। অতএব, অন্ধের জন্য জুমআ ফরয নয়।

৬। চলতে সক্ষম হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি হাঁটতে সক্ষম নয় তার উপর সালাতুল জুমআ ফরয নয়।

যাদের জন্য জুমআ ওয়াজিব নয়, তারা যদি সালাতুল জুমআ আদায় করে নেয় তাহলে তাদের সালাত শুদ্ধ হবে। তখন তারা সালাতুয যোহর পড়তে হবে না।

[৩৩৭] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৫০০

জুমার সালাতের সুন্নত কিরাত:

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় প্রথম রাকআতে সূরা জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন। কখনো প্রথম রাকআতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া পাঠ করতেন। তবে এই সূরাগুলোকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বা বেশি প্রয়োজন মনে করা উচিত নয়। মাঝে মধ্যে ভিন্ন সূরাও পড়া যেতে পারে।

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . . . . . كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার সালাতে সূরা জুমআ সূরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন।[৩৩৮]

হাদীসে এসেছে-

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

হযরত নুমান ইবনে বশীর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় ঈদে এবং জুমার সালাতে সূরা আলা এবং সূরা গাশিয়া পাঠ করতেন। হাদীসটির বর্ণানাকারী বলেন, ঈদ ও জুমআ একই দিনে হলে তিনি উভয় সালাতে উল্লেখিত দুটি সূরা পাঠ করতেন।[৩৩৯]

[৩৩৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৬৮

[৩৩৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৬৫

চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব:

হাদীসে এসেছে-

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) আদায় করতেন। এর মধ্যে কোনো কিছুর মাধ্যমে পৃথক করতেন না। (সালাম ফেরাতেন না।)[৩৪০]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا

হযরত আবু আব্দুর রহমান আস-সুলাইমী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ আমাদেরকে জুমাআর ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে ফরয সালাতের পর আরও চার রাকাত সুন্নাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এমন সময় আমাদের কাছে হযরত আলী রাদি. এলেন। তিনি আমাদেরকে ফরয সালাতের পর প্রথমে দুই রাকাত তারপর চার রাকাত সুন্নাত সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৩৪১]

হাদীসে এসেছে-

كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا

তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) জুমার ফরয সালাতের আগে চার রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করতেন।[৩৪২]

চার রাকাত সুন্নত সালাতের ফযিলত:

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

[৩৪০] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-১১২৯

[৩৪১] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস-৫৫২৫

[৩৪২] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস-৫৪০৫

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

যে ব্যক্তি গোসল করে জুমার উদ্দেশ্যে আসে এবং যে পরিমাণ সালাত পড়ার সুযোগ হয় সে পরিমাণ সালাত পড়ে। ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে। ইমামের সাথে সালাত আদায় করে। ঐ ব্যক্তির দশ দিনের (ছোট-খাট) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৩৪৩]

দুই রাকাত ফরয সালাতের গুরুত্ব:

'সালাতের গুরুত্ব' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই রাকাত ফরয সালাতের ফযিলত:

'সালাতের সাধারণ ফযিলত' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

ফরযের পর দুই রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত:

সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার পর দুই রাকাত সালাত পড়তেন।[৩৪৪]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا

হযরত আবু আব্দুর রহমান আস-সুলাইমী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ আমাদেরকে জুমাআর ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত

[৩৪৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০২৪

[৩৪৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৭৮

আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে ফরয সালাতের পর আরও চার রাকাত সুন্নাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এমন সময় আমাদের কাছে হযরত আলী রাদি. এলেন। তিনি আমাদেরকে ফরয সালাতের পর প্রথমে দুই রাকাত তারপর চার রাকাত সুন্নাত সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৩৪৫]

ফরযের পর চার রাকাত সুন্নত সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে সালাতুল জুমআ পড়ল, সে যেন সালাতুল জুমার পরে চার রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।[৩৪৬]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমার (ফরয) সালাতের পরে সুন্নাত সালাত পড়বে সে যেন চার রাকাত সালাত আদায় করে।[৩৪৭]

সহীহ মুসলিম এবং সুনানুত তিরমিযির হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

[৩৪৫] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস-৫৫২৫

[৩৪৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৭৩

[৩৪৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৭৪

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যারা সালাতুল ফরয সালাতের পর সুন্নাত পড়বে, সে যেন চার রাকাত সালাত আদায় করে।[৩৪৮]

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مِرَارًا

ইবনু জারীর (রাহ.) বলেন, হযরত আতা (রাহ.) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি (আতা) ইবনে উমর রাদি. কে জুমার ফরয সালাতের পর সালাতের স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর আরেকটু সরে গিয়ে আরও চার রাকাত সালাত আদায় করলেন। ইবনু জারীর বলেন, আমি আতা (রাহ.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তাঁকে কতবার এমন করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, অনেকবার এমন করতে দেখেছি।[৩৪৯]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا

হযরত আবু আব্দুর রহমান আস-সুলাইমী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ আমাদেরকে জুমাআর ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে ফরয সালাতের পর আরও চার রাকাত সুন্নাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এমন সময় আমাদের কাছে হযরত আলী রাদি. এলেন। তিনি আমাদেরকে ফরয

[৩৪৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০৭৩; সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৫২৩

[৩৪৯] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১১৩৫

সালাতের পর প্রথমে দুই রাকাত তারপর চার রাকাত সুন্নাত সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৩৫০]

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: জুমার ফরয সালাতের পর কত রাকাত সুন্নত সালাত পড়বো? এ ব্যপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের আমল কী ছিল?

উত্তর: জুমার ফরয সালাতের পর মোট ছয় রাকাত সুন্নত সালাতের কথা হাদীস থেকে জানা যায়। ইতোপূর্বে আমরা জুমার ফরয সালাতের আলোচনার পর সুন্নত সালাতের যে বিবরণ উল্লেখ করেছি সেখানে পৃথকভাবে মোট ছয় রাকাত সুন্নত সালাতের আলোচনা করেছি।সুনানু আবু দাউদ-এর হাদীস থেকে ছয় রাকাত সুন্নত সালাতের কথা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। হাদীসটি হচ্ছে এই-

عَن عَطَاء أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مِرَارًا

হযরত আতা (রাহ.) বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. কে জুমার সালাত শেষ হওয়ার পর সালাতের বিছানা থেকে কিছুটা দূরে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে দেখেছেন, তিনি তাকে আরেকটু সরে গিয়ে আরও চার রাকাত সালাত আদায় করতে দেখেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আতা (রাহ.) কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. কে) কতবার এমন করতে দেখেছেন? হযরত আতা (রাহ.) বললেন, তাঁকে বহুবার এমন করতে দেখেছি।[৩৫১]

[৩৫০] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস-৫৫২৫

[৩৫১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১১৩৫

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সনদে এসেছে যে, তিনি জুমার পরে চার রাকাত পড়ার কথা বলেছেন। আর সাহাবায়ে কিরাম থেকে ছয় রাকাত পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।[৩৫২]

সালাতুল জানাযা

সালাতুল জানাযা ও কিছু জরুরী কথা:

পৃথিবীতে সকল মানুষের আয়ু সুনির্ধারিত। এ নির্ধারিত আয়ু একদিন শেষ হবে। সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে সবাইকে চলে যেতে হবে। তবুও প্রিয়জনের মৃত্যু মানুষকে ভারাক্রান্ত করে এবং তার কল্যাণের জন্য কিছু করার প্রেরণা জাগ্রত করে। এই বেদনার মুহূর্তেও ভুলে গেলে চলবে না যে, শুধু শরীয়তসম্মত পন্থাতেই মৃতের জন্য কিছু করা যেতে পারে। এর বাইরে বিভিন্ন বিদআতী কাজকর্ম কিংবা দেশীয় ও সামাজিক রীতি-প্রথা অনুগামী হয়ে শরীয়তের নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হলে সকল প্রচেষ্টাই নিল হবে। সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহর বোঝা বহন করতে হবে।

যখন অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, মৃত্যুর সময় সন্নিকটে তখন পরিবারের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হল, প্রিয়জনের কাছে বসে আস্তে আস্তে কালেমা পড়া। যেন তারও কালেমা পড়ার কথা স্মরণ হয় এবং স্বেচ্ছায় কালেমা পড়ে। এ কষ্টের সময় তাকে কালেমা পড়ার আদেশ করবে না। কেননা, এ সময় একদিকে শয়তান মানুষকে গোমরাহ করার পূর্ণ চেষ্টা করে, অন্যদিকে মুমূর্ষ ব্যক্তির শারীরিক কষ্ট হতে থাকে। তাই জ্ঞান-বুদ্ধি সুস্থির না থাকার কারণে কিংবা কষ্টের কারণে কালেমা পড়ার আদেশটি তার কাছে বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে। এ জন্য মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে একটু আওয়াজ করে শুধু কালেমা পড়া উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

[৩৫২] ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া; সূত্র: নবীজীর নামায, পৃ.-২৫৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে কালেমার আওয়াজ প্রদান করো।[৩৫৩]

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যার শেষ কথা হবে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৫৪]

মৃত ব্যক্তির চোখ খোলা থাকলে তা বন্ধ করে দেয়া। কাপড় দিয়ে চোয়াল বেঁধে দেয়া। এ সময় যেহেতু ফিরিস্তারা উপস্থিত থাকেন এবং দুআকারীদের দুআয় আমীন বলেন। তাই মৃতের প্রতি বা অন্য কারও প্রতি বদদুআ করা উচিত নয়। এ সময় বিলাপ করা থেকে এবং উচ্চ আওয়াজে ক্রন্দন করা থেকেও বিরত থাকবে। কেননা, এতে মৃতের কষ্ট হয়ে থাকে।

হযরত উম্মে সালমা রাদি. বলেন-

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

আবু সালামা মৃত্যু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন এবং তার চোখ বন্ধ করলেন। এরপর বললেন, যখন রূহ কবজ করা হয় তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করে। এ কথা শুনে পরিবারের লোকেরা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এখন শুধু কল্যাণের দুআ করবে। কেননা, ফিরিশতারা তোমাদের কথায় আমীন বলবেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআ করলেন-

[৩৫৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১৬৪

[৩৫৪] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৩১১৮

اللّٰهمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

ইয়া আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করুন। হিদায়াত প্রাপ্তদের মাঝে তার সম্মান সুউচ্চ করুন। তার পরিবারবর্গকে উত্তম প্রতিনিধি দান করুন। ইয়া রাব্বুল আলামীন! তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন। তার কবরে আলো ও প্রশস্ততা দান করুন।[৩৫৫]

হযরত ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়ে থাকে। অন্য বর্ণনায় এসেছে পরিবারের লোকদের ক্রন্দন-মাতমের কারণে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়ে থাকে।[৩৫৬]

যত দ্রুত সম্ভব মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে কাফন পড়াবে। এরপর জানাযা পড়বে।

সালাতুল জানাযার ফযিলত:

১. সালাতুল জানাযাতে এবং দাফনে অংশ গ্রহণ করলে দুই উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

[৩৫৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১৬৯

[৩৫৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১৮২

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় কোনো মুসলমানের জানাযাতে গিয়ে সালাত আদায় করে এবং দাফন কাজে অংশ গ্রহণ করে তাহলে দুই কিরাত সওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রত্যেক কিরাতের পরিমাণ হলো একটি উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযাতে গিয়ে সালাত আদায় করে দাফনের পূর্বেই ফিরে আসে সে এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।[৩৫৭]

২. মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে একশত মুসলিম সুপারিশ করলে তা কবূল করা হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে মৃত ব্যক্তির উপর একশত মুসলিম সালাতুল জানাযা আদায় করবে এবং তারা সবাই তার জন্য সুপারিশ করবে তাদের সুপারিশ কবূল করা হবে।[৩৫৮]

৩. মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে চল্লিশজন খাঁটি মুমিনের সুপারিশ কবূল করা হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ..... سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- যখন কোনো মুসলমানের ইন্তিকাল হয় এবং তার জানাযার সালাতে চল্লিশজন লোক

[৩৫৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৭

[৩৫৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৪১

অংশ গ্রহণ করেন যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করেন না, তখন মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুফারিশ কবূল করা হয়।[৩৫৯]

মৃতকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি:

মৃত ব্যক্তিকে একটি খাটের উপর রাখা। মৃত পুরুষকে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা। এরপর তার কাপড়গুলো খুলে ফেলা। এরপর সালাতের জন্য যেভাবে উযু করা হয় সেভাবে উযু করানো। তবে তাকে কুলি করাবে না এবং নাকেও পানি দিবে না। মুখ এবং নাকের মধ্যে কাপড়ের একটি ভিজা টুকরা দিয়ে মুছে দিবে। সাবান দ্বারা তার মাথা ও দাড়ি ধুয়ে দিবে। এরপর বাম পার্শ্ব করে শোয়াবে এবং পানি ঢালবে যেন পানি নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর ডান পার্শ্ব করে শোয়াবে এবং পানি ঢালবে যেন পানি নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এরপর ভর দিয়ে বসাবে এবং পেটের উপর দিয়ে আস্তে করে মাসাহ করাবে। পেসাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলে তা ধুয়ে ফেলবে। এর জন্য পুনরায় গোসল দিবে না। এরপর কাপড় শরীর মুছে দিবে। দাঁড়ি ও মাথার মধ্যে সুগন্ধি লাগাবে। সাজদা করতে গিয়ে যে স্থানগুলো মাটিতে লাগাতে হয় সেসব স্থানে কর্পূর লাগাবে।

মৃত ব্যক্তির নখ ও চুল কাটবে না। গোসল দেওয়ার মতো কোন পুরুষ না থাকলে স্ত্রী স্বামীকে গোসল করিয়ে দিবে। কিন্তু গোসল দেওয়ার মতো কোন মহিলা না থাকলে স্বামী তার স্ত্রীকে গোসল করিয়ে দিবে না। পুরুষের জন্য ছোট বালক-বালিকাকে গোসল করিয়ে দেওয়া জায়েয আছে। অনুরূপ মহিলাদের জন্যও ছোট বালক-বালিকাকে গোসল করিয়ে দেওয়াও জায়েয আছে।[৩৬০]

মৃতকে কাফন দেওয়ার পদ্ধতি:

মৃতকে কাফন দেওয়া মুসলমানদের জন্য ফরযে কিফায়া। যদি কেউ কাফন দেয়, তাহলে অন্যান্যদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। যদি কেউ কাফন না দেয়, তাহলে সকলের গুনাহ হবে।

[৩৫৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৪২

[৩৬০] আল-ফিকহুল মুয়াসসার

সর্বনিম্ন কাফন হচ্ছে যা দ্বারা মুসলমানদের দায়িত্ব থেকে ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে যায়। তা হচ্ছে, এমন কাফন যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির গোটা শরীর আচ্ছাদিত করা যায়।

মৃত ব্যক্তিকে তার প্রকৃত সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া হবে, যে সম্পদে অন্য কারো সম্পর্ক নেই। তার যদি সম্পদ না থাকে, তাহলে জীবিত থাকাকালে মৃত ব্যক্তির খরচের দায়িত্ব যে বহন করতো, তার জন্য কাফনের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। যদিও তার পক্ষ থেকেও কাফনের খরচ বহন করার মতো সম্পদ না থাকে, তাহলে কাফনের ব্যবস্থা বাইতুল মাল (সরকারী ফাণ্ড) থেকে করবে।

যদি মুসলমানের বাইতুল মাল না থাকে, তাহলে মুসলমানের মধ্যে যারা সামর্থবান ব্যক্তির উপর কাফনের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।

আর যদি মুসলমানের বাইতুল মাল থাকে, কিন্তু বাইতুল মাল থেকে কাফন দেওয়ার সুযোগ না থাকে, তাহলেও মুসলমানের মধ্যে যারা সামর্থবান ব্যক্তির উপর কাফনের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।[৩৬১]

কাফনের প্রকারভেদ:

কাফন তিন প্রকার: ১. সুন্নতী কাফন, ২. কিফায়া কাফন, ৩. জরুরী কাফন।

উত্তম হচ্ছে কাফন সাদা কাপড়ের হওয়া। পুরুষের জন্য সুন্নতী কাফন হচ্ছে- জামা, ইযার ও জুব্বা। পুরুষের জন্য কিফায়া কাফন হচ্ছে- ইযার ও জুব্বা। এর চেয়ে কম দেয়া মাকরূহ। পুরুষের জন্য জরুরী কাফন হচ্ছে- অভাব অবস্থায় যা পাওয়া যায়। যদিও তা সতর ঢাকা পরিমাণ হয়। জামা হবে গর্দান থেকে পা পর্যন্ত। জামার মধ্যে আস্তিন হবে না। ইযার হবে মাথার শুরু থেকে পা পর্যন্ত। জুব্বা হবে ইযার থেকে এক হাত লম্বা।[৩৬২]

[৩৬১] আল-ফিকহুল মুয়াসসার

[৩৬২] আল-ফিকহুল মুয়াসসার

পুরুষকে কাফন দেওয়ার নিয়মঃ

পুরুষকে কাফন দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে জুব্বা রাখবে। এর উপর ইযার রাখবে। ইযারের উপর জামা রাখবে। তারপর জামার উপর মৃত ব্যক্তিকে রাখবে। প্রথমে মৃতকে জামা পরিধান করাবে। এরপর ইযারের বাম দিক থেকে ইযার পরিধান করাবে, তারপর ইযারের ডান দিক থেকে পরিধান করাবে। এরপর ইযার পরিধান করানো নিয়মেই জুব্বা পরিধান করাবে। কাফন পরিধান শেষ করার পর কাফনের উভয় প্রান্তে গিঁট দিতে হবে। যেন খুলে না যায়।

মহিলাকে কাফন পরিধান করানোর নিয়মঃ

মহিলাদের জন্য কাফন দেওয়ার সুন্নত নিয়ম হচ্ছে- জুব্বা, ইযার, জামা, ওড়না ও নেকড়া।

মহিলাকে কাফন দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে জুব্বা রাখবে। এর উপর ইযার রাখবে। ইযারের উপর জামা রাখবে। জামা পরিধান করিয়ে চুলগুলো দুখোঁপা করে জামার উপর দিয়ে বুকে রাখবে। তারপর মাথায় ওড়না রাখা হবে। তবে ওড়নাকে মুড়িয়ে দিবে না এবং গিটও দিবে না। এরপর ইযারের বাম দিক থেকে ইযার পরিধান করাবে, তারপর ইযারের ডান দিক থেকে পরিধান করাবে। এরপর নেকড়া দিয়ে বুক বেধেঁ দিবে। এরপর জুব্বা পরিধান করাবে। কাফন পরিধান শেষ করার পর কাফনের উভয় প্রান্তে গিঁঠ দিতে হবে। যেন খুলে না যায়।

সালাতুল জানাযার নিয়মঃ

ইমাম সাহেব মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর দাঁড়াবে। সালাতুল জানাযাতে চার তাকবীর দিবে। প্রথম তাকবীরের পর হাত বেঁধে ছানা- সুবহানাকাল্লা হুম্মা. . . পড়বে। ছানা হিসেবে সূরা ফাতিহাও পড়া যায়। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পড়বে। তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করবে এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে।

হযরত সামূরা ইবনে জুনদুব রাদি. থেকে বর্ণিত-

صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আদায় করলাম, যে মহিলা প্রসূতি অবস্থায় ইন্তিকাল করেছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।[৩৬৩]

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত-

نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন। এরপর (তার সালাতুল জানাযার জন্য) সামনে অগ্রসর হলেন। সাহাবিরা তাঁর পিছনে কাতার করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে চার তাকবীর দিলেন।[৩৬৪]

প্রথম তাকবীরের পর হামদ ছানাঃ

জানাযার সালাতে মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ। এজন্য দুআর ভূমিকা স্বরূপ প্রথমে হামদ-ছানা ও দরূদ পড়া হয়। প্রথম তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলে হাত বাঁধা হয় এবং ছানা পড়া হয়। এ সময় ছানা হিসেবে সূরা ফাতিহাও পড়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. তা পড়েছেন। মনে রাখতে হবে যে, সালাতুল জানাযাতে কিরাত নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে তা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু দুআ আস্তে করা উত্তম তাই সালাতুল জানাযাতে ছানা ইত্যাদি আস্তে পড়া হয়।

হযরত সায়ীদ ইবনে আবু সায়ীদ মাকবুরী রাদি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكَ، أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ،

---

[৩৬৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৩৩১

[৩৬৪] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৩১৮

তিনি আবু হুরায়রা রাদি. কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কীভাবে সালাতুল জানাযা পড়ে থাকেন? আবু হুরায়রা রাদি. বললেন, আমি তোমাকে জানাচ্ছি। আমি মৃত ব্যক্তি ব্যক্তির ঘর থেকে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আসি। এরপর যখন খাটিয়া রাখা হয় তখন (সালাতুল জানাযার) তাকবীর দিয়ে হামদ-ছানা ও দরূদ পড়ি। এরপর এই দুআ পড়ি-

اللّٰهمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ،

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল জানাযাতে কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ কিরাত নির্ধারণ করেন নি।[৩৬৫]

দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ পড়া:

ছানা পড়ার পর দ্বিতীয় তাকবীর দিবে। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ পড়বে। এই তাকবীর এবং পরবর্তী দুই তাকবীরের মধ্যে ইমাম-মুক্তাদী কেউই হাত তুলবে না।

তৃতীয় তাকবীরের পর দুআ:

দরূদ পড়ার পর তৃতীয় তাকবীর দিবে। তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করবে।

আবু হুরায়রা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল জানাযাতে মৃত ব্যক্তির জন্য এই দুআ পড়তেন-

اللّٰهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا

اللّٰهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ

اللّٰهمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

[৩৬৫] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস-৫৩৫

আল্লাহুম্মাগ ফির লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা, ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উংছানা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, আল্লাহুম্মা মান আহ ইয়াই তাহু মিন্না ফা-আহ ইহি আলাল ঈমান, ওয়ামাং তাওয়াফ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ ফাহু আলাল ইসলাম, আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুদিল্লানা বায়দাহ।

হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদেরকে তুমি জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রেখো। আর যাদেরকে তুমি মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার সওয়াব হতে মাহরুম করোনা এবং তারপর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করোনা।[৩৬৬]

সালাতুল জানাযাতে মৃত ছেলে শিশুর জন্য দুআ:

اللّٰهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

আল্লাহুম্মাজ আল হুলানা ফারতাও, ওয়াজ আল হুলানা আজরাও ওয়া যুখরা, ওয়াজ আল হুলানা শা-ফিয়াও ওয়া মুশাফফয়া।

হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য ওসীলাস্বরূপ বানিয়ে দিন। এমন প্রতিদানস্বরূপ বানিয়ে দিন যাতে আমরা গর্ব করতে পারি। তাকে এমন সুপারিশকারী বানান যার সুপারিশ কবূল হয়।[৩৬৭]

সালাতুল জানাযাতে মৃত মেয়ের শিশুর জন্য দুআ:

اللّٰهمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

আল্লাহুম্মাজ আল হুলানা ফারাতাও, ওয়াজ আল হুলানা আজরাও ওয়া যুখরা, ওয়াজ আল হুলানা শা-ফিয়াও ওয়া মুশাফফয়া।

[৩৬৬] আবু দাউদ, হাদীস-৩২০৩

[৩৬৭] আওনুল মাবুদ শরহে সুনানে আবু দাউদ; তাফসীরে রুহুল বয়ান, (তাওবার ১০৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)

হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য ওসীলাস্বরূপ বানিয়ে দিন। এমন প্রতিদানস্বরূপ বানিয়ে দিন যাতে আমরা গর্ব করতে পারি। তাকে এমন সুপারিশকারী বানান যার সুপারিশ কবূল হয়।[৩৬৮]

চতুর্থ তাকবীরের পর সালামঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ سَمَّاهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ

নাজাশীর জন্য জানাযা পড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সালাতে রুকু-সাজদা নেই এবং কথা বলারও অনুমতি নেই। এতে রয়েছে তাকবীর ও তাসলীম (সালাম ফেরানো)।[৩৬৯]

হাত উঠানোঃ

প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোনো তাকবীরে হাত উঠানোর নিয়ম নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি.-এর আমল থেকে পাওয়া যায়-

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدَهُ وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا

তিনি প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতেন এরপর আর হাত উঠাতেন না। আর তিনি চার তাকবীর দিতেন।[৩৭০]

---

[৩৬৮] আওনুল মাবুদ শরহে সুনানে আবু দাউদ; তাফসীরে রুহুল বয়ান, (তাওবার ১০৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)

[৩৬৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৩২১

[৩৭০] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৬৩৬২

সালাতুল জানাযার বিধানঃ

মৃত ব্যক্তির উপর সালাতুল জানাযা পড়া মুসলমানদের জন্য ফরযে কিফায়া। কোন একজন মুসলমান মৃত ব্যক্তির উপর সালাতুল জানাযা পড়লে অন্যদের দায়িত্ব থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ সালাতুল জানাযা না পড়ে, তাহলে সবার গুনাহ হবে।

যার উপর দৈনিক ফরয সালাত আদায় করা ফরয, তার উপর সালাতুল জানাযা ওয়াজিব, যদি সে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারে।

আর যদি মৃত্যুও সংবাদ না জানে, তাহলে তার উপর সালাতুল জানাযা ওয়াজিব নয়।

সালাতুল জানাযার ফরয দুটি।

১. সালাতুল জানাযাতে চার তাকবীর বলা।

২. দাঁড়ানো। অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত পড়া। অকারণে বসে সালাত আদায় করলে তা আদায় হবে না।[৩৭১]

সালাতুল জানাযার সুন্নতঃ

সালাতুল জানাযাতে কয়েকটি সুন্নত রয়েছে।

১. ইমাম সাহেব মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর দাঁড়াবে। চাই মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা হোক।

২. প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়া।

৩. দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ প্রেরণ করা।

৪. মৃত ব্যক্তি যদি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা হয়, তাহলে তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করবে-

---

[৩৭১] আল-ফিকহুল মুয়াসসার

اللّٰهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
اللّٰهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ
اللّٰهمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

আল্লাহুম্মাগ ফির লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা, ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উংছানা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, আল্লাহুম্মা মান আহ ইয়াই তাহু মিন্না ফা-আহ ইহি আলাল ঈমান, ওয়ামাং তাওয়াফ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ ফাহু আলাল ইসলাম, আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুদিল্লানা বায়দাহ।

হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদেরকে তুমি জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রেখো। আর যাদেরকে তুমি মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার সওয়াব হতে মাহরুম করোনা এবং তারপর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করোনা।[৩৭২]

সালাতুল জানাযাতে মৃত ছেলে শিশুর জন্য দুআ:

উপরে উল্লেখ হয়েছে।

সালাতুল জানাযাতে মৃত মেয়ের শিশুর জন্য দুআঃ

উপরে উল্লেখ হয়েছে।

৭. চতুর্থ তাকবীরের পর পরই সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

৮. মুসল্লীদের কাতারকে বেজোড় করা মুস্তাহাব।[৩৭৩]

৯. লাশ বহন করবে চারজন পুরুষ। চারজনে বহন করা সুন্নত।

[৩৭২] আবু দাউদ, হাদীস-৩২০৩

[৩৭৩] আল-ফিকহুল মুয়াসসার

লাশ বহন করার নিয়মঃ

মৃত ব্যক্তির লাশ বহন করে কবস্থানে নিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ যদি কিছু মুসলমান এই দায়িত্ব পালন করে তাহলে সকল মুসলমান দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তাদের গুনাহ হবে না। আর যদি কেউ এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সবার গুনাহ হবে। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের উচিত হলো লাশ বহনে সচেষ্ট হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবি হযরত সাদ বিন মুয়ায রাদি. এর লাশ বহন করেছিলেন। লাশ বহন করবে চারজন পুরুষ। চারজনে বহন করা সুন্নত। লাশ নিয়ে চলার সময় একটু দ্রুত গতিতে চলা মুস্তাহাব। তবে এতো বেশি দ্রুত গতিতে চলবে না, যার কারণে লাশ নড়াচড়া করে।

লাশের সামনের চলার চেয়ে পিছনে চলা অধিক উত্তম। লাশ মাটিতে রাখার পূর্বে বসা মাকরূহ।[৩৭৪]

গায়েবানা জানাযার সালাতঃ

কোনো মুসলমান যদি এমন কোনো এলাকাতে মারা যায় যেখানে তার সালাতুল জানাযা পড়া হয় নি, তাহলে তার জন্য সালাতুল জানাযা পড়া সুন্নত। হাবশার (বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজাশী যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন যেহেতু সেখানে কোনো মুসলমান ছিল না এজন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য গায়েবানা জানাযার সালাত পড়েছিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বলেন-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ
إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

যে দিন নাজাশী মৃত্যু বরণ করলেন সেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিলেন। এরপর বাইরে এসে তাদেরকে কাতারবদ্ধ করলেন এবং চার তাকবীর দিয়ে সালাতুল জানাযা আদায় করলেন।

[৩৭৪] আল-ফিকহুল মুয়াসসার

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, যার জানাযার সালাত পড়া হয় নি, তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া যায়। আর যার জানাযা পড়া হয়েছে তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহয় পাওয়া যায় না তাই এটা পড়া যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক নিবেদিতপ্রাণ সাহাবি দূর-দূরান্তের অঞ্চলে মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু তাদের কারো জন্য গায়েবানা জানাযা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েন নি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই পরিষ্কার সুন্নাহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ সাধারণ অবস্থায়ও গায়েবানা জানাযা পড়ে থাকে। আর নাজাশীর উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। অথচ এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়।

১. আগেই বলা হয়েছে যে, নাজাশীর গায়েবানা জানাযা এজন্য পড়া হয়েছিল যে, তার মৃত্যুর পর সেখানে সালাতুল জানাযা পড়ার মতো কেউ ছিল না এবং তার জানাযা পড়া হয় নি। অতএব এই ঘটনা এমন মৃতদের প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা সঠিক নয়, যাদের অবস্থা ভিন্ন।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অবস্থায় যা করেছেন ওই অবস্থায় তা করাই হল সুন্নাহ। নাজাশীর বিশেষ প্রেক্ষাপট ছাড়া সাধারণ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো গায়েবানা সালাত পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। অত্রএব সাধারণ অবস্থায় গায়েবানা জানাযার সালাত হাদীস সম্মত নয়।

এ সিদ্ধান্ত জেনে রাখা ভালো যে, এ বিষয়ে মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া রাদি. সম্পর্কে যে কথা বর্ণনা করা হয় তা একবারেই সঠিক নয়। ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) অনুরূপ মন্তব্যই করছেন।

সালাতুল জানাযা ও কাফন-দাফন সম্পর্কিত দুআঃ

লাশ কবরে রাখার দুআ:

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

বিছমিল্লাহি ওয়ালা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।

(আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে এবং রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে রাখছি।[৩৭৫]

ভিন্ন হাদীসে মিল্লাতি শব্দের স্থলে সুন্নাতি শব্দ বর্ণিত হয়েছে। উভয় হাদীসই সহীহ।[৩৭৬]

মৃত ব্যক্তিকে কবরে মাটি দেওয়ার দুআ:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

মিনহা খালাক্বনা কুম, ওয়া ফীহা- নুয়িদুকুম, ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম, তা-রাতান উখরা।

এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে আনব এবং এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে আবার বের করব।[৩৭৭]

কবর যিয়ারতের দুআ: -১

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ! يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ

আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল ক্বুবুর, ইয়াগ ফিরুল্লাহু লানা-ওয়ালাকুম। আংতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছার।

তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী! আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী এবং আমরা তোমাদের পিছনে।[৩৭৮]

কবর যিয়ারতের দুআ: -২

السَّلامُ عَلَيْكُم دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

আস্‌সালামু আলাইকুম, দারা কাওমিম মুয়মিনীন, ওয়া ইন্না ইংশা আল্লাহু বিকুম লা-হিকুন।

---

[৩৭৫] বুলুগুল মারাম, হাদীস-৫৭৫
[৩৭৬] আবু দাউদ, হাদীস-৩২১৫
[৩৭৭] কানযুল উম্মাল, হাদীস-১৮৮১৩
[৩৭৮] তিরমিযি, হাদীস-১০৫৩; বুলুগুল মারাম, হাদীস-৫৯৬

তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মুমিন গৃহবাসী! আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব।[৩৭৯]

আপনার জিজ্ঞাসার জবাবঃ

প্রশ্নঃ আমাদের দেশে লাশকে সামনে রেখে আজ আমাদেরকে ছেড়ে অমুক চির বিদায় নিয়েছেন। তিনি কেমন ছিলেন? এমন কথা বলা এবং লোকদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে কিনা?

উত্তরঃ আমাদের দেশে লাশকে সামনে রেখে আজ অমুক আমাদেরকে ছেড়ে চির বিদায় নিয়েছেন। বলুন তো তিনি কেমন ছিলেন? এমন কথা বলা ঠিক নয় এবং এভাবে লোকদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করাও ঠিক নয়। কারণ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আমল যেভাবে করেছেন সেই আমল সেভাবে করাই সব চেয়ে উত্তম এবং বরকতময়। কারণ আমি আমার জ্ঞানের উপর বা অন্য কারো জ্ঞানের উপর এতোবেশি আস্থাশীল হতে পারিনা যত বেশি আস্থাশীল হতে পারি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণের উপর। এজন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণের হুবহু অনুস্বরণ এবং অনুকরণকেই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ মনে করি। একে পরকালীন নাজাতের পথ বলে বিশ্বাস করি।

লাশকে সামনে রেখে তিনি কেমন ছিলেন? এমন কথা বলা এবং লোকদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই। সাহাবিদের আমলের দ্বারাও তা প্রমাণিত নয়। সুতরাং লাশকে সামনে রেখে এধরণের মন্তব্য করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে হযরত আনাস রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে সাহাবায়ে কিরাম একটি মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ভালো অভিমত প্রদান করেছিলেন। একটু পর আরেকটি মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মন্দ অভিমত প্রদান করেছিলেন।

হযরত আনাস রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে-

[৩৭৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬০৭; আবু দাউদ, হাদীস-৩২৩৯

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الْأَرْضِ

হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সাহাবি একটি মৃত ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাঁরা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন। (তাদের থেকে প্রশংসার কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর তাঁরা অপর একটি মৃত ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাঁরা মৃত ব্যক্তির মন্দ বললেন। (তাদের থেকে মন্দের কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. জিজ্ঞাসা করলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) কী ওয়াজিব হয়েছে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা প্রথম ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশংসা করেছ। তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর তোমরা দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে মন্দ বলেছ। তাই তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা তো দুনিয়াতে আল্লাহর সাক্ষী।[৩৮০]

তাহলে সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে হযরত আনাস রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের আলোকে আমরা লাশকে সামনে রেখে তিনি কেমন লোক ছিলেন? অথবা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে লোকজন থেকে কেন অভিমত নিতে পারব না?

উত্তরঃ সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে হযরত আনাস রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের আলোকে লাশকে সামনে রেখে তিনি কেমন লোক ছিলেন? অথবা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে লোকজন থেকে কেন অভিমত নিতে পারব না, এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা-

[৩৮০] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৩৬৭, ২৬৪২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস-৯৪৯

(ক) সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে হযরত আনাস রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম ঐ লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাঁরা ঐ লাশকে সামনে রেখে অমুক কেমন ছিলেন একথা বলেন নি। তারা লাশকে সামনে রেখে ভালো-মন্দ মন্তব্য করেন নি। সুতরাং উল্লেখিত হাদীসটিকে দলিল বানিয়ে লাশকে সামনে রেখে এই ধরণের কথা বলা যাবে না।

(খ) সৃষ্টি জগতে নবী-রাসূলের পর সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি। তাঁদের ঈমান, আমল এবং তাকওয়ার দৃষ্টান্ত হতে পারে না। তারা কখনো কপটতা করতেন না। তারা যা সত্য মনে করতেন সেটাই বলতেন। দুনিয়ার কাউকে খুশি করার জন্য কিছু বলতেন না। আর বর্তমানে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। আমরা কপটতা করে থাকি। মানুষকে খুশি করার জন্য মিথ্যা বলে থাকি। এমনকি লাশকে সামনে রেখে যদি বলা হয় অমুক কেমন ছিলেন? তখন লোকটি খারাপ হওয়া সত্বেও আমরা তার ব্যপারে বলে থাকি হ্যাঁ অমুক খুব ভালো লোক ছিলেন। অথচ সেই লোকটি চোর, ডাকাত, বাটপার, মিথ্যুক, খুনি, অবৈধভাবে জায়গা দখলকারী, অন্যের সম্পদ হরণকারী। যার এসব খারাপ চরিত্রের কথা সমাজের প্রায় সকল লোকই জানে। এমন ব্যক্তির ব্যপারেও আমরা লাশকে সামনে রেখে আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে সার্টিফিকেট দিয়ে ফেলি। যা সম্পূর্ণ অন্যায়। সুতরাং এখানে সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা আর আমাদের অবস্থাকে এক পাল্লায় মাপা যায় না। অতএব লাশকে সামনে রেখে অমুক কেমন ছিলেন বলে উপস্থিত লোকজন থেকে সাক্ষ্য গ্রহণের সুযোগ নেই।

(গ) সুনানু আবু দাউদ-এর হাদীসে উল্লেখ আছে যে তোমরা মৃত ব্যক্তিদের ভালো গুণের কথা আলোচনা কর। তাদের মন্দ বিষয়কে আলোচনা করা থেকে বিরত থাক। সুতরাং কোনো মৃত ব্যক্তির মন্দ আলোচনা করা যাবে না। তবে সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে হযরত আনাস রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম একটি মৃত ব্যক্তির ব্যপারে মন্দ মন্তব্য করেছিলেন। এর কারণ কী কারণ ছিল? এর কারণ ছিল, যে লোকটির ব্যপারে সাহাবায়ে কিরাম মন্দ বলেছিলেন, সেই লোকটি সামাজের প্রায় সকলের কাছেই মুনাফিক বলে পরিচিত ছিল। আর যার

ব্যপারে প্রায় সকলেই জানে যে অমুক ব্যক্তির মধ্যে চুরি, ডাকাতি কিংবা অন্যের সম্পদ দখল করার মন্দ স্বভাব ছিল, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পরও তার সমালোচনা করা যাবে। যেন জীবিত লোক সমালোচনার ভয়ে সকল মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকিত পথে চলতে উৎসাহিত হয়।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে কারও মৃত্যুর পর কেউ তার ভালো গুণের কথা আলোচনা করে। আবার কিছু মানুষ তার মন্দ কর্মের সমালোচনা করে। এখন জানার বিষয় হচ্ছে, কারও মৃত্যুর পর তার ভালো-মন্দ আলোচনা সমালোচনা করা যাবে কিনা? এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর: কারও মৃত্যুর পর তার মন্দ দিক বা সমালোচনা করা যাবে না। মৃত ব্যক্তির সমালোচনা করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। বরং হাদীসে একথা বলা হয়েছে তোমরা মৃত ব্যক্তিদের ভালো গুণের কথা আলোচনা কর। তাদের মন্দ বিষয়কে আলোচনা করা থেকে বিরত থাক।

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ

হযরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা মৃত ব্যক্তিদের ভালো গুণের কথা আলোচনা কর। তাদের মন্দ বিষয়কে আলোচনা করা থেকে বিরত থাক।[৩৮১]

আমাদের করণীয়: আমাদের করণীয় হচ্ছে, কেউ মৃত্যু বরণ করলে তার ভালো গুণের কথা আলোচনা করা। সত্যিই যা তার মধ্যে ছিল। আর মন্দ বিষয় গুলোকে নিয়ে সমালোচনা না করা। যা আমরা উপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে জানতে পারলাম।

প্রশ্ন: কেউ যদি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে কিংবা কাউকে জুলুম করে মৃত্যু বরণ করে তাহলে কি অন্যায়কারীর কিংবা জালিমের

[৩৮১] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৪৯০২

সওয়াব থেকে মাজলুমকে সওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে? আর যদি জালিমের জীবনে কোনো সওয়াব না থাকে তাহলে কীভাবে মিমাংসা হবে?

উত্তর: কেউ যদি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে কিংবা কাউকে জুলুম করার পর তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে তাহলে তার বিচার কেমন হবে তা হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। আমরা হাদীসটি উল্লেখ করছি। হাদীস থেকে খুব সহজেই এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

হাদীসটি হচ্ছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ
لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ
مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের উপর অন্যায় করেছে, সে যেন পরকালে তার সওয়াব কেটে নেওয়ার আগেই তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কেননা সেখানে (পরকালে) কোনো দীনার ও দিরহাম (অর্থাৎ মুদ্রা বা টাকা-পয়সা) নেই। যদি তার কাছে সওয়াব না থাকে, তাহলে মাজলুমের গুনাহকে জালিমের উপর ছুড়ে মারা হবে।[৩৮২]

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা:

ইসলাম মুসলমানদের জন্য দুটি ঈদ নির্ধারণ করেছে। একটি ঈদুল ফিতর। অপরটি ঈদুল আযহা। রমযান মাস শেষ হওয়ার পর শাওয়াল মাস শুরু হয়। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে পালিত হয় ঈদুল ফিতর। আর ঈদুল আযহা পালিত হয় যিলহজ্ব মাসের দশ তারিখে। এর বাইরে মুসলমানদের

[৩৮২] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৫৩৪

আর কোনো ঈদ নেই। পাকিস্তান, ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে হাতেগোনা কিছু মানুষ তৃতীয় আরেকটা ঈদ পালন করে থাকে। তারা রবিউল মাসের ১২ তারিখেও ঈদ পালন করেন। এর পক্ষে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। তারা খোঁড়া যুক্তিতে তৃতীয় ঈদ পালনের চেষ্টা করেছেন। এমন খোঁড়া যুক্তির আশ্রয়ে তারা তৃতীয় ঈদ পালন করা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পূর্ণ দৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ। কারণ, তখন তৃতীয় ঈদ পালনের মর্মই হলো ইসলামের নির্ধারীত দুই ঈদের বিধানের প্রতি তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঈদ পালন পদ্ধতিতে নারাজ।

ঈদের ইতিহাস:

হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থাকাকালিন সময়ে কোনো ঈদের সালাত পড়েন নি। তিনি মদীনাতে যাবার পূর্ব থেকেই তারা নাইরূজ এবং মেহেরজান নামে দুটি উৎসব পালন করত। মদীনাবাসীরা ঐ দুটি দিনে খেলাধূলা ও গান-বাজনা করত। এভাবেই তাদের উৎসব পালন চলতে থাকে। তিনি মদীনাতে যাবার কিছু দিন পর বললেন: মহান আল্লাহ তোমাদেরকে এই দুটি দিনের পরিবর্তে আরও উত্তম দিনের ব্যবস্থা করেছেন। এর কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঈদের সালাত পড়েছেন।

হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত-

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ
مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন মদীনাবাসীর দুটি উৎসবের দিন ছিল। তারা এই দিনগুলোতে ক্রীড়া ও কৌতুকের মাধ্যমে কাটাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উৎসব সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল জাহেলী যুগ থেকে আমরা এ দিনে আনন্দ উৎসব করতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে এই দুই দিনের পরিবর্তে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। তা হচ্ছে ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর।[৩৮৩]

ঈদের উদ্দেশ্য:

আমরা একাকী ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সামনে সাজদাবনত হই। তাঁর অসীম অনুগ্রহের কথা স্বীকার করি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। প্রতিনিয়ত তাঁরই স্মরণের প্রতিজ্ঞা করি। মহান রবের নিয়ামতের স্বীকার করি সামাজিকভাবেও। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে ঘোষনা করি আমরা আপনারই ইবাদত করি। এরপর শুক্রবারে আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে সামাজিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই কথাগুলোকে দ্বীপ্তকণ্ঠে ঘোষনা করি। কিন্তু এসব কথাগুলো একটি দেয়ালের ভেতরে আবদ্ধভাবে ঘোষিত হয়। কথাগুলো বাইরে তেমন একটা যায় না। যার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় যে, কথাগুলোকে একটি খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত মাঠে ঘোষনা করার। যেই মাঠে দাঁড়িয়ে ঘোষনা হবে মহান রবের অসংখ্য নিয়ামতের কথা। সেখানে প্রতিজ্ঞা হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কুরআনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ব্যক্তি স্বার্থের টান পিছনে ফেলে ইসলামের দাওয়াতের পতাকা হাতে নিয়ে সর্বত্র আল্লাহর দ্বীনকে ছড়িয়ে দেয়ার কথা। এক এলাকার সকল মসজিদের সকল মুসল্লী এক মাঠে একত্রিত হয়ে একথার প্রমাণ দিতে হবে যে মুসলিম জাতি মৌলিক এবং জাতীয় বিষয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ আছে এবং থাকবে। সুতরাং কোনো জাতি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে এর ফলাফল কখনো শুভ হবে না।

অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আজ গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে পড়েছে মুসলিম উম্মাহর ঈদের সালাত। যেভাবে মাঠে পড়ার কথা ছিল, তা মাঠে না হয়ে শহরের মসজিদে ঈদের সালাত হচ্ছে। আজ আমরা লক্ষ্য করছি যে সারা দেশে বিনোদনের পার্ক আছে। খেলার জন্য মাঠ আছে সরকারীভাবে। সু পরিচালনার জন্য লোক নিয়োগ করা আছে। কিন্তু জীবনের শেষ সালাত হচ্ছে সালাতুল জানাযা। সেই জানাযার সালাত আদায়ের জন্য শহরে মাঠের ব্যবস্থা তেমন একটা নেই বললেই চলে।

[৩৮৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১১৩৬

আর যা আছে তাতে ময়লা এবং নাপাকী পড়ে আছে। কোথাও মাঠ আছে। কিন্তু ইহুদী ষড়যন্ত্রের কারণে ঈদের সালাত মাঠে না হয়ে তা আদায় হচ্ছে মসজিদে। আবার কোথাও ধর্মীয় এবং সামাজিক দলাদলির চোরাবালিতে ঈদের সালাতকে মাঠে পড়া হচ্ছে না। মাঠ থেকে সুস্থ দেশ, জাতি এবং ধর্মের সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়ার কথা ছিল। ঈদের সালাত মাঠে না হওয়ার কারণে সেই দিক নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে না। তারা ঈদের সালাতের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আজ তাদের জন্য বড়ই আফসোস!।

সালাতুল ঈদের সময়:

ঈদের সালাত পড়তে হয় সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর থেকে। এর আনুমানিক সময় হলো, সূর্য উদয় হওয়ার আধা ঘন্টা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর। তা পড়তে হবে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে।

সালাতুল ঈদের পদ্ধতি:

ঈদের সালাতের পদ্ধতি অন্যান্য সালাতের মতোই। তবে আযান ইকামত দিতে হয় না। কিন্তু এতে অতিরিক্ত আরো ছয় তাকবীর দিতে হয়।

এই সালাত আদায়ের বিস্তারিত নিয়ম হলো এই, প্রথম তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধা। এরপর ছানা পড়া। ছানা পড়া শেষ করে তিন তাকবীর দেয়া। এই তিন তাকবীরের মধ্যে প্রথম দুই তাকবীরের সময় হাতকে কান পর্যন্ত তুলে হাত ছেড়ে দেয়া। আর তৃতীয় তাকবীরের সময় হাত কান পর্যন্ত তুলে হাত ছেড়ে দিবে না। বরং হাত বাঁধতে হবে। ঈদের সালাতে ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করবেন। এরপর যথারীতি রুকু-সাজদার পর দ্বিতীয় রাকাত আরম্ভ করা। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং কিরাত পাঠ করার পর রুকুতে যাবার পূর্বেই অতিরিক্ত আরও তিন তাকবীর দিতে হবে। এখানে তিন তাকবীর দেওয়ার সময় হাত কান পর্যন্ত তুলে ছেড়ে দিতে হবে। চতুর্থ তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। এরপর সালাতের অবশিষ্ট কাজ অন্যান্য সালাতের মতোই সম্পন্ন করতে হবে।

এ সালাতের তাকবীরগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে মোট তাকবীর সংখ্যা চার। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা এবং অতিরিক্ত তিন তাকবীর। দ্বিতীয় রাকাতের কিরাতের পরে মোট তাকবীর সংখ্যা চার। অতিরিক্ত তিন তাকবীর এবং রুকুর তাকবীর। তাহলে প্রথম রাকআতে তাহরীমার তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর তাকবীর ব্যতীত অতিরিক্ত তাকবীর সংখ্যা হচ্ছে মোট ছয়টি।

হাদীসে এসেছে-

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ

(ইমাম আবু দাউদ রাহ. বর্ণনা করেন যে,) সায়ীদ ইবনুল আস হযরত আবু মুসা আশআরী রাদি. ও হযরত হুযাইফা রাদি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাতে কতটি তাকবীর দিতেন? আবু মুসা আশআরী রাদি. বললেন, চার তাকবীর দিতেন যেভাবে জানাযার সালাতে চার তাকবীর দেওয়া হতো। হুযাইফা রাদি. তাঁর কথা সমর্থন করলেন। আবু মুসা রাদি. আরও বললেন, আমি যখন বসরার শাসনকর্তা ছিলাম তখন এভাবেই তাকবীর দিয়েছি। [৩৮৪]

উল্লেখিত হাদীসে যেই চার তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, তা প্রত্যেক রাকআতে তাকবীরের সংখ্যা বলা হয়েছে। আর চার তাকবীরের ব্যাখ্যা হলো, প্রথম তাকবীরটি তাকবীরে তাহরীমা আর অবশিষ্ট তিনটি তাকবীর হলো অতিরিক্ত। আর দ্বিতীয় রাকআতে চার তাকবীরের ব্যাখ্যা হলো, প্রথম তিনটি তাকবীর অতিরিক্ত তাকবীর। আর চতুর্থ তাকবীর হলো দ্বিতীয় রাকাতের রুকুতে যাওয়ার তাকবীর। (সংকলক)

[৩৮৪] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১১৩৬

দুই ঈদের খুতবাঃ

ঈদের সালাতের পর দুটি খুতবা প্রদান করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত। খুতবাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াজ-নসীহত করতেন। দুই খুতবার মধ্যে কিছু সময় বসতেন।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদি. থেকে বর্ণিত-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ম ছিল, তিনি ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন। প্রথমে ঈদের সালাত আদায় করতেন। এরপর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। সবাই কাতারবদ্ধভাবে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকেতন। তিনি ওয়াজ-নসীহত করতেন। বিধান জারি করতেন। কোথাও বাহিনী প্রেরণ করতেন। কোনো আদেশ জারি করতে হলে তা জারি করতেন। এরপর ঈদগাহ থেকে তিনি ফিরতেন।[৩৮৫]

ঈদুল ফিতরের দিনে সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলঃ

ঈদুল ফিতরের দিনে সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমল রয়েছে। আমলগুলো করতে পারলে অনেক সওয়াব রয়েছে।

১। ঈদের দিন ঘুম থেকে ভোরে জাগ্রত হওয়া।

২। ফজরের সালাত মহল্লার মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা।

৩। ওযূ ও গোসলের পূর্বে মিসওয়াক করা।

৪। উত্তমভাবে গোসল করা।

৫। যথাসাধ্য সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করা।

[৩৮৫] সহীহ বুখারী

৬। সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে এ্যালকোহল মিশ্রিত সেন্ট ব্যবহার করা যাবে না। যদি এ্যালকোহল না থাকে তাহলে সেন্ট ব্যবহার করা যাবে।

৭। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের মাঠে যাবার পূর্বে মিষ্টি জাতীয় কিছু খেয়ে যাওয়া।

৮। ঈদুল আযহার দিন ঈদের মাঠে যাবার পূর্বে কোনো কিছু না খেয়ে যাওয়া।

৯। ঈদুল ফিতরের দিন চুপিসারে তাকবীর বলে ঈদগাহের দিকে যাওয়া। ঈদগাহে গিয়ে তাকবীর বন্ধ করবে। তাকবীর-

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

১০। সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়ে থাকলে তা আদায় করা।

১১। ঈদুল আযহার দিন উচ্চ আওয়াজে তাকবীর বলে ঈদগাহের দিকে যাওয়া। ঈদগাহে গিয়ে তাকবীর বন্ধ করবে।

১২। শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রকাশ করা।

১৩। পায়ে হেঁটে ঈদের মাঠে যাওয়া।

১৪। এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে আসা।

১৫। ঈদের সালাত ঈদের মাঠে আদায় করা। অকারণে মসজিদে না পড়া।

১৬। সাধ্যমতো দান করা।[৩৮৬]

ঈদের খুতবার সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ:

১। ঈদের সালাতের পরে খুতবা প্রদান করা সুন্নাত।

২। তাকবীর দ্বারা খুতবা আরম্ভ করা সুন্নাত।

৩। এরপর আল্লাহর প্রশংসা এবং নবীর উপর দরূদ প্রেরণ করা।

৪। দুটি খুতবা পাঠ করা।

৫। মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা।

৬। দুই খুতবার মাঝে সামান্য সময় বসা।

৭। ঈদুল ফিতরের খুতবায় সাদকাতুল ফিতর বিধান আলোচনা করা।

---

[৩৮৬] (আল-ফিকহুল মুয়াসসার)

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: ইমাম সাহেব ঈদের সালাতে তাকবীরগুলো বলে সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করেছে কিংবা সূরা ফাতিহাও পাঠ করা শেষ করেছে। এমন সময় যদি কেউ ঈদের সালাতে অংশ গ্রহণ করে তাহলে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতে হবে কিনা এবং কখন বলবে?

উত্তর: ইমাম সাহেব ঈদের সালাতে তাকবীরগুলো বলে সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করেছে কিংবা সূরা ফাতিহাও পাঠ করা শেষ করেছে। এমন সময় যদি কেউ ঈদের সালাতে অংশ গ্রহণ করে তাহলে সে প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাধঁবে। এরপর সে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলবে।[৩৮৭]

প্রশ্ন: ইমাম সাহেব রুকুতে যাবার পর যদি কেউ ঈদের সালাতে অংশ গ্রহণ করে তাহলে কি করবে?

উত্তর: ইমাম সাহেব রুকুতে যাবার পর যদি কেউ ঈদের সালাতে অংশ গ্রহণ করে তাহলে আগন্তুক ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, তাকবীরে তাহরীমার পর অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলার পরও ইমাম সাহেবকে রুকুতে পাবেন তাহলে তাকবীরে তাহরীমা এবং অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলেই রুকুতে যাবেন। আর যদি মনে করেন যে, তাকবীরে তাহরীমার পর অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলার পর ইমাম সাহেবকে রুকুতে পাবেন না, তাহলে শুধু তাকবীরে তাহরীমা বলে রুকুতে চলে যাবেন। রুকুতে থাকা অবস্থায় রুকুর তাসবীহ পাঠ না করে প্রথমে সেই অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলবে। তবে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাবে না। কারণ হল, রুকুর তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত। আর অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলা ওয়াজিব। অতিরিক্ত তাকবীর বলার পূর্বেই যদি ইমাম সাহেব রুকু থেকে উঠে যান তাহলে সে ব্যক্তি অতিরিক্ত তাকবীর না বলেই ইমামের সাথে উঠে যাবেন। অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে না।[৩৮৮]

প্রশ্ন: ঈদের সালাতে ইমাম সাহেব এক রাকাত সম্পূর্ণ করার পর কেউ যদি অংশ গ্রহণ করে তাহলে সে কি করবে?

---

[৩৮৭] ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-৩/৭৪ এবং আহসানুল ফাতাওয়া-৪/১১৬

[৩৮৮] ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-৩/৭৪ এবং আহসানুল ফাতাওয়া-৪/১১৬

উত্তর: ঈদের সালাতে ইমাম সাহেব এক রাকাত সম্পূর্ণ করার পর কেউ যদি অংশ গ্রহণ করে তাহলে সে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর উঠে দাঁড়াবে। এরপর সূরা ফাতিহা এবং কিরাত পাঠ করার পর রুকুতে যাবার পূর্বেই অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলবে। তারপর যথানিয়মে সালাত সম্পূর্ণ করবে।[৩৮৯]

সালাতুত তারাবীর আলোচনা

১. সালাতুত তারাবী ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা:

তারাবী আরবি শব্দ। আরবিতে (**تراويح**) এভাবে লিখা হয়। শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) লিখেছেন-

والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام وسميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين

تراويح শব্দটি **ترويحة** এর বহুবচন। এর অর্থ একবার বিশ্রাম গ্রহণ করা। যেমন **تسليمة** অর্থ একবার সালাম দেয়া। রমযান মাসের বরকতময় রজনীতে জামাতের সঙ্গে যে সালাত পড়া হয় তাকে তারাবী বলা হয়। এই নামে নামকরণের কারণ হচ্ছে, যখন থেকে সাহাবায়ে কিরাম তারাবীর সালাতকে সম্মিলিতভাবে আদায় করতে আরম্ভ করলেন তখন থেকেই তাঁরা প্রতি দুসালামের পর (অর্থাৎ চার রাকাতের পর) বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।[৩৯০]

[৩৮৯] ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-৩/৭৪ এবং আহসানুল ফাতাওয়া-৪/১১৬

[৩৯০] ফাতহুল বারী

২. সালাতুত তারাবীর সময়:

ইশার ফরয ও সুন্নাত সালাতের পর তারাবী সালাতের সময় শুরু হয়। সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময় বাকী থাকে। অর্থাৎ ইশার সালাতের সময় যতক্ষণ সময় পর্যন্ত পড়া যায়, তারাবীর সালাতও ততক্ষণ সময় পর্যন্ত পড়া যায়।

৩. সালাতুত তারাবীরর হুকুম/বিধান:

সালাতুত তারাবী সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয হয়েছে, তাদের জন্য তারাবী আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আদায় করা জরুরী। অকারণে তারাবী না পড়লে গুনাহ হবে। সালাতুত তারাবী সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি অনেক হাদীস থেকে প্রমাণিত। এখানে আমরা কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক রাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে তারাবীর সালাত আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবিগণও সালাত আদায় করলেন।[৩৯১]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. বলেন-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ.

[৩৯১] সহীহ বুখারী, হাদীস-৯২৪

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের এক রাতে মসজিদে তারাবী পড়লেন। সাহাবিগণও তাঁর সঙ্গে সালাতে অংশ গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় রাতে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীর জন্য মসজিদে গেলেন না। সকালে সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের আগ্রহ এবং উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি কিন্তু এ সালাত তোমাদের ফরয হয়ে যাবে এই ভয়ে আমি (তারাবীর সালাতের জন্য) মসজিদে যাই নি।[৩৯২]

সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুর রহমান আল-কারী (রাহ.) থেকে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে-

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ

আমি)হযরত আব্দুর রহমান আল-কারী(রমযান মাসে হযরত ওমর রাদি. এর সঙ্গে মসজিদে গেলাম। দেখলাম লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভিক্ত হয়ে সালাতুত তারাবী পড়ছেন। কেউ একা পড়ছেন। আবার কেউ দুচারজন সঙ্গে নিয়ে সালাত পড়ছেন। তখন হযরত ওমর রাদি. বললেন এদের সকলকে যদি এক ইমামের পিছনে জামাতবদ্ধ করে দেই তাহলে মনে হচ্ছে উত্তম হবে। এরপর তিনি তাদেরকে হযরত উবাই ইবনে কাব রাদি. এর পিছনে জামাতবদ্ধ করে দিলেন। হযরত আব্দুর রহমান আল-কারী বলেন, আরেক রাতে আমরা বের হলাম। লোকেরা এক ইমামের পিছনে সালাতুত তারাবী পড়ছিল। হযরত ওমর রাদি. বললেন এই নিয়ম কত ভালো। তবে রাতের যে অংশে তোমরা সালাতে দাঁড়াও তা থেকে রাতের ওই অংশ

[৩৯২] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১২৯

উত্তম যে রাতের যে অংশে তোমরা ঘুমিয়ে থাকো। অর্থাৎ শেষ রাত। বর্ণনাকারী বলেন, তখন প্রথম রাতেই সালাত পড়া হতো।[৩৯৩]

সহীহ বুখারীর অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে রাত্র জাগরণের জন্য উৎসাহ দিতেন। তবে তা অপরিহার্যভাবে পালনের জন্য নির্দেশ করেন নি। তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় সালাতুত তারাবী পড়েন তাঁর পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত বিষয়টি এমনই ছিল। (অর্থাৎ সালাতুত তারাবী পড়া হতো।) এরপর হযরত আবু বকর রাদি. এর খিলাফতকালেও এমনই ছিল। এমনিভাবে হযরত উমর রাদি.-এর খিলাফতের প্রথম যুগেও একই অবস্থা বিদ্যমান ছিল।[৩৯৪]

সুনানুন নাসাঈর হাদীসে এসেছে-

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

(একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন) রমযান মাস এমন একটি মাস, মহান আল্লাহ তোমাদের উপর এর সিয়ামকে ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্য

[৩৯৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-২০১০

[৩৯৪] সহহী মুসলিম, হাদীস-১৮১৬

রমযানের তারাবীকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশা নিয়ে রমযানের সিয়াম পালন করবে এবং তারাবী সালাত আদায় করবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হবে যেন তার মা আজ তাকে জন্ম দিয়েছে।[৩৯৫]

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! আমরা উপরে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীস থেকে একথা পরিষ্কারভাবে জানতে পেরেছি যে, সালাতুত তারাবী সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম সালাতুত তারাবী পড়েছেন। তবে উম্মতের উপর তারাবী ফরয হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মধ্যে জামাত পরিত্যাগ করেছেন। তবে পুরুষের জন্য জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নাত। কেননা হযরত উমর রাদি.-এর খিলাফতের সময়ে এই বিষয়টির ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪. সালাতুত তারাবীর গুরুত্ব:

সালাতুত তারাবীর অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামে রমযানের (সালাতুত তারাবীর) প্রতি উৎসাহিত করতেন। তবে তিনি তা অপরিহার্য করেন নি।[৩৯৬]

৫. সালাতুত তারাবীর ফযিলত:

সালাতুত তারাবীর অনেক ফযিলত রয়েছে।

১. সওয়াবের আশায় তারাবী পড়লে পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়:

[৩৯৫] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-২২১০

[৩৯৬] সহীহ মুসলিম

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় সালাতুত তারাবী পড়েন তাঁর পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৩৯৭]

২. সওয়াবের আশায় তারাবী পড়লে সদ্যভূমিষ্ট সন্তানের ন্যায় গুনাহ মুক্ত হওয়া যায়:

হাদীসে এসেছে-

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

(একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন) রমযান মাস এমন একটি মাস, মহান আল্লাহ তোমাদের উপর এর সিয়ামকে ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্য রমযানের তারাবীকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশা নিয়ে রমযানের সিয়াম পালন করবে এবং তারাবী সালাত আদায় করবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হবে যেন তার মা আজ তাকে জন্ম দিয়েছে।[৩৯৮]

৬. ইসলামে সালাতুত তারাবীর রাকাত সংখ্যা:

সালাতুত তারাবী-এর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনাকে একটু সহজে এবং বিস্তারীতভাবে উপস্থান করার ইচ্ছা রইলো।

[৩৯৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৭ এবং ২০০৯

[৩৯৮] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-২২১০

আমরা তারাবী সম্পর্কিত হাদীসকে সামনে রেখে একটু লক্ষ্য করলে সহজেই ইসলামের সোনালি যুগের তারাবীর ইতিহাস আমাদের সামনে চলে আসে। যেমন, নবী-যুগের তারাবী, হযরত আবু বকর রাদি. এর যুগের তারাবী, হযরত ওমর রাদি. এর যুগের তারাবী এবং হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদি. এর যুগের তারাবী এবং হযরত আলী রাদি. এর যুগের তারাবীর ইতিহাস আমাদের সামনে আসে। এরপর হযরত সুফিয়ান ছাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ী (রাহ.)-এর তারাবী সম্পর্কিত অভিমত।

নবী সা. -এর যুগে সালাতুত তারাবীঃ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. বলেন-

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের এক রাতে মসজিদে তারাবী পড়লেন। সাহাবিগণও তাঁর সঙ্গে সালাতে অংশ গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় রাতে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীর জন্য মসজিদে গেলেন না। সকালে সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের আগ্রহ এবং উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি কিন্তু এ সালাত তোমাদের ফরয হয়ে যাবে এই ভয়ে আমি (তারাবীর সালাতের জন্য) মসজিদে যাই নি।[৩৯৯]

উক্ত হাদীস থেকে বিশেষভাবে দুটি কথা জানা যায়। যেমন-

[৩৯৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১২৯

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তিনবার অথবা চারবার মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে তারাবী পড়েছেন।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীর সালাতের জন্য রাকাত সংখ্যা নির্ধারন করেন নি।

এজন্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) বলেন-

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنِ النَّبِيِّ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ

যে মনে করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীর সালাতের রাকাত সংখ্যা নির্ধারন করেছেন, যা থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না, তার ধারণা ভুল।[৪০০]

হযরত আবু বকর রাদি. এর যুগে সালাতুত তারাবীঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. এর যুগে সবাই নিজেদের মতো তারাবী পড়তেন।

হাদীসে এসেছে-

وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে সালাতুত তারাবীর রাকাত সংখ্যা নির্ধারন ছাড়া চলতে থাকল। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. এর খিলাফতকালেও এভাবেই রয়ে গেল।[৪০১]

হযরত ওমর রাদি. এর যুগে সালাতুত তারাবীঃ

রমযানের প্রতি রাতে ইশার ফরয সালাতের পর বিতর সালাতের আগে জামাতের সঙ্গে তারাবীর সালাত পড়ার এবং তাতে কুরআন খতম করার ধারাবাহিকতা হযরত ওমর রাদি. এর খিলাফতকালে আরম্ভ হয়েছিল। সে

[৪০০] ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া

[৪০১] সহীহ বুখারী, হাদীস-২০০৯

সময় তারাবীর সালাত বিশ রাকাত পড়া হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম বিশ রাকাত সালাত উপরোক্ত নিয়মেই আদায় করেছেন এবং এ বিষয়ে কারো দ্বিমত ছিল না। সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী এবং ফুকাহা ও মুহাদ্দিসগণের আমলও এরূপ ছিল। আজ পর্যন্ত হারামাইন শরীফাইনে এই ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন: ইতোপূর্বে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সালাতুত তারাবী শিরোনামে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. বর্ণিত হাদীসে থেকে জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীর সালাতের রাকাত সংখ্যা নির্ধারন করে দেন নি। এবং তারাবীর জন্য নিয়মিত রূপ দিয়ে যান নি। তাহলে হযরত ওমর রাদি. তারাবীর সালাতের রাকাত সংখ্যা নির্ধারন করলেন কেন এবং এর নিয়মিত রূপ দিলেন কেন?

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারাবীর সালাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। কিন্তু ফরয হওয়ার আশংকায় এর রূপ দিয়ে যান নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিরোধানের পর ওহী আসার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন ওহীর মাধ্যমে সালাতুত তারাবী ফরয হওয়ার আশংকা নেই। এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রুচি ও ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত তাঁর খলিফা হযরত ওমর রাদি. আনসার ও মুহাজির সাহাবিগনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সালাতুত তারাবীকে নিয়মিত রূপ দান করেন এবং এর রাকাত সংখ্যা নির্ধারন করেন।

হযরত ওমর রাদি. কর্তৃক এমন সিদ্ধান্তের বিবরণ সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুর রহমান আল-কারী (রাহ.) থেকে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে-

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ

قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ

আমি)হযরত আব্দুর রহমান আল-কারী(রমযান মাসে হযরত ওমর রাদি. এর সঙ্গে মসজিদে গেলাম। দেখলাম লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভিক্ত হয়ে সালাতুত তারাবী পড়ছেন। কেউ একা পড়ছেন। আবার কেউ দুচারজন সঙ্গে নিয়ে সালাত পড়ছেন। তখন হযরত ওমর (রাাদি.) বললেন এদের সকলকে যদি এক ইমামের পিছনে জামাতবদ্ধ করে দেই তাহলে মনে হচ্ছে উত্তম হবে। এরপর তিনি তাদেরকে হযরত উবাই ইবনে কাব রাদি. এর পিছনে জামাতবদ্ধ করে দিলেন। হযরত আব্দুর রহমান আল-কারী বলেন, আরেক রাতে আমরা বের হলাম। লোকেরা এক ইমামের পিছনে সালাতুত তারাবী পড়ছিল। হযরত ওমর রাদি. বললেন এই নিয়ম কত ভালো। তবে রাতের যে অংশে তোমরা সালাতে দাঁড়াও তা থেকে রাতের ওই অংশ উত্তম যে রাতের যে অংশে তোমরা ঘুমিয়ে থাকো। অর্থাৎ শেষ রাত। বর্ণনাকারী বলেন, তখন প্রথম রাতেই সালাত পড়া হতো।[৪০২]

হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান বলেন-

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً

হযরত ওমর রাদি. এর যুগে রমযান মাসে সাহাবায়ে কিরাম তেইশ রাকাত সালাত আদায় করতেন।[৪০৩]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) বলেন-

فَلَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

যখন হযরত ওমর রাদি. লোকদেরকে উবাই ইবনে কাব রাদি. এর পিছনে একত্র করে দিলেন, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত তারাবী পড়তেন। এরপর বিতর পড়তেন।[৪০৪]

---

[৪০২] সহীহ বুখারী, হাদীস-২০১০

[৪০৩] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস-৩৮০

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) আরো বলেন-

فلما كان عمر رضى الله عنه جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب الذى جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وعمر رضى الله عنه هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ يعنى الأضراس لأنها أعظم فى القوة وهذا الذى فعله هو سنة

হযরত ওমর রাদি. উপস্থিত সকল সাহাবিকে হযরত উবাই ইবনে কাব রাদি. এর পিছনে এক জামাতে একত্র করেছেন। বলাবাহুল্য, হযরত ওমর রাদি. খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম ছিলেন। যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার সুন্নাহ ও আমার খলীফাগণের সুন্নাহকে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরবে। মাড়ির দাঁতের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জন্য বলেছেন যে, এভাবে ধারন করলে তা শক্তভাবে হয়ে থাকে। তারাবী বিষয়ে হযরত ওমর রাদি. এর এই কাজ সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।[৪০৫]

হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদি. এর যুগে সালাতুত তারাবীঃ

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদি.-এর খিলাফত-কালেও তারাবীর সালাত বিশ রাকাত পড়া হতো।

সাইব ইবনে ইয়াযিদ বলেন-

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً قَالَ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

[৪০৪] ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া

[৪০৫] ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া

হযরত ওমর রাদি.-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম তারাবীর সালাত বিশ রাকাত পড়তেন এবং শতাধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন। হযরত ওসমান রাদি. এর সময়ে সুদীর্ঘ সময় সালাতে দাঁড়ানোর কারণে তাঁরা লাঠিতে ভর দিতেন।'[৪০৬]

হযরত আলী রাদি. এর যুগে সালাতুত তারাবীঃ

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদি.। তিঁনি তাঁর খিলাফতের সময়ে তারাবীর সালাত বিশ রাকাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু আব্দুর রহমান আস্-সুলামী বলেন-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً. قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ.

হযরত আলী রাদি. রমযান মাসে কারীদেরকে ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন, তারা যেন লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত তারাবী পড়েন। আর আলী রাদি. নিজেই তাদেরকে সালাতুল বিতর পড়াতেন।[৪০৭]

অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে-

عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ.

হযরত আলী রাদি. এর একজন শিষ্য শুতাইর ইবনে শাক্‌ল রমযান মাসে বিশ রাকাত তারাবী এবং তিন রাকাত বিতর পড়াতেন।[৪০৮]

[৪০৬] সুনানুল বাইহাকী, হাদীস-৪৮০১

[৪০৭] সুনানুল বাইহাকী, হাদীস-৪৮০৪

[৪০৮] সুনানুল বাইহাকী, হাদীস-৪৮০৩

তারাবী সম্পর্কে সুফিয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ী (রাহ.)-এর অভিমত:

তিরমিযিতে উল্লেখ আছে-

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا رُوِىَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

(তারাবীর রাকাত সংখ্যা বিষয়ে) অধিকাংশ মনীষী ওই মতই পোষন করেন যা হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদি. এবং অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ রাকাত। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ী (রাহ.)-এর সিদ্ধান্তও এমনই। ইমাম শাফেয়ী (রাহ.) বলেন, আমি মক্কাবাসীকে বিশ রাকাত তারাবী পড়তে দেখেছি।[৪০৯]

উল্লেখিত সকল বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের তারাবী আট রাকাতের বেশি হতো। অন্যান্য বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা বিশ রাকাত তারাবী পড়তেন। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের আলোকে এবং সাহাবায়ে কিরামের সম্মিলিত আমলের অনুস্মরণে আমাদেরও বিশ রাকাতই পড়া উচিত। তাবেয়ীন ও পূর্ববর্তী ফুকাহা মুজতাহিদীনের কর্মপন্থাও এমনই ছিল।

৭. অপ্রাসঙ্গিক এবং ভিত্তিহীন বর্ণনার পর্যালোচনা:

হাদীসের আলোকে এতোক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা একথা জানতে পেরেছি যে, সাহাবায়ে কিরাম পুরো রমযান মাসে ইশার সালাতের পর বিশ রাকাত তারাবী জামাতের সঙ্গে আদায় করেছেন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরো জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম থেকে নিয়ে সুদীর্ঘ এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মক্কা-মদীনাতে সালাতুত তারাবী বিশ রাকাত পড়া হয়েছে।

[৪০৯] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৮০৬

তারপরও বর্তমানে কিছু মানুষ এমনও আছেন যারা দাবী করেন সালাতুত তারাবী আট রাকাত। তারা তাদের পক্ষে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেবার জন্য আপ্রান চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তারা কখনো সফল হয় নি এবং হতেও পারবে না। কারণ যেই সহীহ হাদীসের দ্বারা আট রাকাত প্রমানের চেষ্টা করেছেন সেই হাদীসগুলো অপ্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ সেই হাদীসগুলো তারাবী বিষয়ক নয়, বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কিত। আবার কখনো এমন কিছু হাদীস দ্বারা আট রাকাত প্রমানের চেষ্টা করা হয়, যা ভিত্তিহীন বা আমলের অযোগ্য। এবার আমরা আপনাদের সামনে কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক এবং ভিত্তিহীন বর্ণনার পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ।

পর্যালোচনা - ১

হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত-

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত কেমন হতো? তিনি বললেন, (শুধু রমযান মাসে কেন?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে এবং অন্যান্য মাসেও এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাকাত পড়তেন। এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলব! এরপর তিনি আবার চার রাকাত পড়তেন। এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্যতা বর্ণনাতীত। এরপর তিনি তিন রাকাত (বিতর) পড়তেন। হযরত আয়েশা রাদি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হে আয়েশা! আমার চোখ নিদ্রিত হয়, কিন্তু অন্তর সজাগ থাকে।[৪১০]

[৪১০] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৪৭

উল্লেখিত হাদীস থেকে আট রাকাত সালাতুত তারাবীর ভিত্তি খোঁজা হয়। অথচ কয়েকটি কারণে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, হাদীসটি সালাতুত তাহাজ্জুদ বিষয়ক, এটি সালাতুত তারাবী বিষয়ক নয়।

কারণ:

(ক) হাদীসটি সালাতুত তাহাজ্জুদ বিষয়ক, এটি সালাতুত তারাবী বিষয়ক নয়:

উল্লেখিত হাদীসটিতে এমন সালাতের কথা বলা হয়েছে, যা রমযান এবং অন্য মাসেও পড়া হতো। আর আমরা জানি যে, সালাতুত তারাবী শুধু রমযান মাসেই পড়া হয়। অন্য মাসে পড়া যায় না। তাহলে হাদীসে রমযান এবং অন্য মাসে যে সালাত পড়ার কথা বলা হয়েছে তা সালাতুত তারাবী নয় বরং তা হচ্ছে সালাতুত তাহাজ্জুদ। কেননা, সালাতুত তাহাজ্জুদ রমযান মাসেসহ অন্যান্য মাসেও পড়া যায়।

(খ) তাহলে হযরত ওমর অন্যান্য সাহাবি ও তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন কেন বিশ রাকাত তারাবী পড়লেন?

আমরা ইতোপূর্বে সালাতুত তারাবীর রাকাত সংখ্যা শিরোনামে এবিষয়ে আলোচনা করেছি যে, হযরত ওমর রাদি. এবং অন্যান্য প্রায় সকল সাহাবি, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন বিশ রাকাত সালাতুত তারাবী পড়তেন। এই হাদীসের আলোকে সালাতুত তারাবী যদি আট রাকাতই হতো তাহেল খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী রাদি. এবং অন্যান্য সাহাবি ও তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন কেন বিশ রাকাত তারাবী পড়লেন? তাঁরা কি এই হাদীসের অর্থ ও মর্ম কম বুঝতেন।?

আমরা বিশ্বাস করি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা ও কাজ সাহাবায়ে কিরামই সবচেয়ে বেশি জানতেন এবং বুঝতেন। তাঁরা এই হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাহাজ্জুদ সালাতের আমল জানতেন, বুঝতেন এবং আমল জানতেন। তাঁরা এই হাদীসের আলোকে কখনো সালাতুত তারাবীকে আট রাকাত আমল করতেন না।

(গ) হাদীসে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের কথা নেই কেন?

হাদীসে এমন সালাতের কথা বলা হয়েছে যা একা আদায় করা হয়। কেননা উল্লেখিত হাদীসের কোথাও জামাতের সাথে সালাত আদায়ের কথা বলা হয় নি। সুতরাং একাকী যে সালাত আদায় করা হয় তা হচ্ছে সালাতুত তাহাজ্জুদ। এই হাদীসে যদি সালাতুত তারাবীর কথা করা হতো তাহলে জামাতের কথাও উল্লেখ করা হতো।

(ঘ) এই হাদীসের আলোকে যারা আট রাকাতের কথা বলেন, তারা নিজেরাই তো এই হাদীস মানেন না:

আমরা এই হাদীসের আলোকে যদিও মেনে নেই যে, সালাতুত তারাবী আট রাকাত। তবে এই হাদীসের মধ্যে সালাতুল বিতর-এর রাকাত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল তিন রাকাত। সুতরাং যারা বলেন সালাতুত তারাবী আট রাকাত তারা কি এই হাদীসের আলোকে সালাতুল বিতরকে তিন রাকাত মানবেন? তা তো আপনারা মানবেন না। তাহলে হাদীসের এক অংশ মানবেন, আবার অন্য অংশ মানবেন না, এটা আবার কেমন কথা!। সুতরাং বুঝা গেল আপনারা নিজেরাই তো উল্লেখিত সহীহ হাদীস মানেন না। অথচ আমরা পুরোপুরি মেনে চলি। কারণ এখানে আমরা এ কথা বলি যে হাদীসটি সালাতুত তাহাজ্জুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতএব যা নিজেরা মানেন না তা অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার অহেতুক চেষ্টা করবেন না।

একটি মজার ব্যাপার:

যে সব বন্ধুরা এই হাদীসের আলোকে সালাতুত তারাবী আট রাকাত প্রমানের চেষ্টা করেন, তারা কি এই হাদীসের আলোকে সালাতুল বিতরের রাকাত সংখ্যা নিয়েও ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিবেন। এই হাদীসে তো সালাতুল বিতর এর রাকাত সংখ্যা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সালাতুল বিতরের রাকাত সংখ্যা হচ্ছে তিন।

আরো মজার ব্যাপার হলো যে সালাতুত তারাবী সম্পর্কে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক. সালাতুত তারাবী আদায়ের নিয়ম বা পদ্ধতি। দুই. সালাতুত তারাবীর রাকাত সংখ্যা। হাদীস অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুত তারাবী

কিভাবে আদায় করতেন সেটা জানা যায় না। বাধ্য হয়ে সাহাবায়ে কিরামের পদ্ধতিকেই মেনে নিতে হয়। অথচ এর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের আমলকে মেনে নিতে তারা অনিহা বোধ করেন।

তারা সালাতুত তারাবীর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলকে দলিল বানিয়ে আমল করেন। এর রহস্য হলো ইবাদতে ফাকিবাজি করা। কারণ সালাতুত তারাবীর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের আমলকে দলিল বানিয়ে আমল করলে বিশ রাকাত তারাবী পড়তে হয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলকে দলিল বানিয়ে আমল করলে আট রাকাত পড়া যায়। সুতরাং এখানে বিশ রাকাত তারাবীকে ফাকি দিয়ে আট রাকাত তারাবী পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলকে দলিল বানানো হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট রাকাত সালাতে এতো দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফোলে যেত। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সালাতুত তারাবী আট রাকাতের প্রবক্তরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত আদায়ের এই পদ্ধতিকে দলিল বানিয়ে আমল করতে অনিহা এবং নারাজ। এর রহস্য হলো যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই পদ্ধতিকে দলিল বানিয়ে আমল করতে হয় তাহলে দীর্ঘ সময় ইবাদত করতে হবে। এই জন্য তারা ইবাদতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের পদ্ধতিকে অনুস্মরণ করেন। অথচ তারা সালাতুত তারাবীর রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের আমলকে দলিল বানিয়ে বিশ রাকাত তারাবী পড়তে নারাজ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত পড়তেও অনিহা প্রকাশ করেন।

পর্যালোচনা - ২

যারা সালাতুত তারাবী আট রাকাতের প্রবক্তা তাদের দাবীর পক্ষে আরেকটি দলিল হচ্ছে যা হযরত জাবির রাদি. থেকে বর্ণনা করা হয়। আমরা আগে বর্ণনাটি উল্লেখ করবো। তারপর তা পর্যালোচনা করবো। বর্ণনাটি হচ্ছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ

হযরত জাবির রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে আট রাকাত সালাত পড়তেন।[৪১১]

এই বর্ণনাটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বর্ণনাটির সনদেও মধ্যে ঈসা ইবনে জারিয়া নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তিনি অত্যন্ত দূর্বল। যার কারণে এমন ব্যক্তির বর্ণনা থেকে শরীয়তের বিধান প্রমাণিত করা যায় না।

ইমাম আবু দাউদ (রাহ.) বলেন, ঈসা ইবনে জারিয়া এর কাছে মুনকার কথা রয়েছে। আরও অনেকে তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন।

অতএব এমন বর্ণনাকারী বর্ণনা দিয়ে সালাতুত তারাবী আট রাকাত প্রমাণ করার সুযোগ নেই।

৮. সালাতুত তারাবীর শিক্ষা:

আমরা রমযান মাসে ইশার সালাতের পর বিশ রাকাত তারাবী আদায় করি। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত বিশ রাকাত সালাত আদায় করতে করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ি। এই অভ্যাসকে রমযানের পরেও কাজে লাগানো উচিত। বিশ রাকাত সালাত আদায় করতে না পারলে কিছু হলেও পড়া উচিত। বিশ রাকাত তারাবী আদায় করতে কখনো কুরআন খতম করা হয়। এভাবে একমাসে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করি নতুবা শুনি। রমযানের পরেও এই অভ্যাসকে ধরে রাখতে হবে। প্রতিদিন একপারা তিলাওয়াতের অভ্যাস করতে হবে। যদি একপারা তিলাওয়াত করা সম্ভব না হয়, তাহলে এর অর্ধেক হলেও তিলাওয়াত করা উচিত।

৯. আপনাদের কাছে আমাদের প্রস্তাব:

আমাদের এতোক্ষণের দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে সালাতুত তারাবীহ বিশ রাকাত। সাহাবাদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মক্কা-মদীনাতে বিশ

[৪১১] ইবনে হিব্বান, হাদীস-২৩১৫

রাকাত করেই পড়া হচ্ছে। সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক এবং ভিত্তিহীন বর্ণনার উপর নির্ভর করে বিশ রাকাতের কমের পক্ষে নতুন মতবাদ চালু করা শুভবুদ্ধির পরিচয় মনে করা যায় না। কেউ যদি আট রাকাত আদায় করতে চায় তাহলে সে আট রাকাত আদায় করুক। এতে সমস্যা নেই। তবে সমস্যা হলো, যারা বিশ রাকাত তারাবী আদায় করেন তাদেরকে বিদআতী বলা। এখানে মনে রাখতে সালাতুত তারাবী ফরয নয় এবং ওয়াজিবও নয়। এটি সুন্নত সালাত। সুতরাং এই সুন্নত সালাত নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করা মোটেও ঠিক হবে না। আমাদের দেশে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যে গুলো নিয়ে আলোচনা করা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যেমন- সুদ, ঘুষ, চুরির বিচার, ইভটিজিং, যৌতুক, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি।

১০. আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: আমাদের সমাজের কিছু মানুষের মুখে শোনা যায় যে, সালাতুত তারাবী না পড়লে সিয়াম (রোযা) হবে না। এ কথাটি কতটুকু সত্য?

উত্তর: আপনার শোনা কথাটি সত্য নয়। তবে সালাতুত তারাবী আদায় না করলে অনেক অনেক সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এ জন্য সালাতুত তারাবী পড়া উচিত।

সালাতুল কাযা

সালাতুল কাযা ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:

সালাতুল কাযা দুটি আরবি শব্দ। সালাত একটি পারিভাষিক শব্দ। সাধারণত আমাদের দেশে সালাতকে নামাযের অর্থে ব্যবহার করা হয়। কাযা শব্দের অর্থ সময়ে আদায় করার আমলকে নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে পরবর্তী সময়ে আদায় করা। সুতরাং সালাতুল কাযা এর অর্থ হচ্ছে এমন সালাত যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় না করে পরবর্তী সময়ে আদায় করা।

সালাতুল কাযার অপর নাম- صلاة الفائتة (সালাতুল ফা-ইতাহ)। এর অর্থ হল ছুটে যাওয়া সালাত। অনেকে একে قضاء الفائتة (কাযাউল ফা-ইতাহ) বলে। এর অর্থ হল ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা আদায় করা।

এছাড়া আমাদের দেশে এই সালাতকে উমরী কাযা বলা হয়ে থাকে। এই নামের চেয়ে উপরে উল্লেখিত নামে বলাটা উত্তম। কারণ হচ্ছে শরীয়তে বা ফিকহের কিতাবে উমরী কাযা নামে কোনো সালাত নেই। যদিও আমাদের দেশে কোনো কোনো অগ্রহণযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য কিছু পুস্তিকার মধ্যে সালাতুল কাযাকে উমরী কাযা নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উমরী কাযা বলার পরিবর্তে সালাতুল কাযা বলা উত্তম। কেননা এই নামটি হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং ফিকহের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

সালাতুল কাযার গুরুত্ব:

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের পর গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে সালাত। মহান আল্লাহ্ কুরআনের প্রায় একশ আয়াতে সালাতের আলোচনা করেছেন। তিনি তার বান্দাদেরকে বিভিন্নভাবে সালাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সালাতের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষমা, জিবিকার নিশ্চয়তা, জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা সালাত ত্যাগ করবে বা আদায় করতে অবহেলা করবে তাদের ব্যপারে অত্যান্ত কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রথমে সালাত ত্যাগ করার পরিণাম সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করব। সেসব হাদীস থেকে একথা পরিস্কার জানা যায় যে, সালাত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব তা নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে পড়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

সালাত আদায় না করার পরিণাম

১. সালাত না পড়লে অপমান ও অপদস্তের শাস্তি ভোগ করতে হবে:

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ () خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ()

এ আয়াতের সারকথা হলো, কিয়ামতের দিবসের কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার একটি আলোকবর্তিকা প্রকাশ পাবে। সবাইকে সাজদাবনত হতে বলা হবে। তখন কেবল তারাই সাজদাবনত হতে পারবে যারা দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য সাজদা করত, অর্থাৎ সালাত আদায় করত। কিন্তু সুস্থ-সবল থাকা থাকা সত্ত্বেও যারা সালাত পড়ত না, যারা সালাতের জন্য আহবান করত তাদের কথা শুনত না, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেদিন সাজদা করতে পারবে না। তাদের কোমরকে শক্ত করে দেয়া হবে। তখন তারা অপমান ও অপদস্তের শাস্তি ভোগ করবে। তাদের দৃষ্টি মাটির দিকে অবনত থাকবে।[৪১২]

২. সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে, শয়তান কানে পেশাব করে দেয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ
فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

হযরত আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হলো, যে ব্যক্তি সারারাত এমনকি সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলো। সে সালাতও পড়ে নি। তখন তিনি বললেন, সে এমন ব্যক্তি যার কানে শয়তান পেশাব করেছে।[৪১৩]

৩. সালাত ত্যাগ করা কুফুর ও শিরকের দিকে ধাবিত করে:

হযরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

ব্যক্তি ও কুফুর-শিরকের মাঝে (সম্পর্কের) সুত্র হচ্ছে সালাত ত্যাগ করা।[৪১৪]

[৪১২] সূরা আল-কলম, আয়াত- ৪২ এবং ৪৩
[৪১৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-৩২৭০
[৪১৪] সহীহ্ মুসলিম, হাদীস- ২৫৬

৪. স্বেচ্ছায় সালাত ত্যাগ করলে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়:

হযরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করবে না। কারণ যে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।[৪১৫]

৫. আযান শুনেও সালাতে উপস্থিত না হওয়া অবশ্যই জুলুম:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ একেবারে জুলুম, কুফুর ও মুনাফিকী, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর (মুয়াযযিনের) ডাক শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয় না।[৪১৬]

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস সমূহ থেকে সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা ভালোভাবে জানতে পেরেছি, সালাতের ব্যপারে অবহেলা করা যে কত বড় অপরাধ তাও বুঝতে পেরেছি।

সালাতের কাযা আদায়ের নীতিমালা:

কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে আহরিত মূলনীতি হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করা অত্যাবশ্যক, নির্ধারিত সময় পার হলেও ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এই মূলনীতি মানুষের ঋনের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনিভাবে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সালাত নির্ধারিত সময় আদায় করা ফরজ। নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে না পারলে তা ঋন হিসেবে গন্য হবে। অবশ্যই এই ঋন আদায় করতে হবে। রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল একথা প্রমাণ করে যে, সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে না পারলে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি:

[৪১৫] সুনানে ইবেন মাজাহ, হাদীস-৪০৩৪
[৪১৬] (তারগীব)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ রাদি. থেকে বর্ণিত-

سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى

এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। দলের কেউ কেউ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এই শেষ প্রহরে আমাদেরকে নিয়ে যদি একটু বিশ্রাম করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার ভয় হচ্ছে সালাতের সময়েও তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে। হযরত বিলাল রাদি. বললেন, আমি আপনাদেরকে জাগিয়ে দেব। তাই সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে বিলাল রাদি. তাঁর বাহনের গায়ে হেলান দিলেন। এতে তাঁর দুচোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসল। তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য কেবল উঠতে শুরু করেছে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত হলেন এবং হযরত বিলালকে ডেকে বললেন, হে বিলাল! তোমার কথা গেল কোথায়? বিলাল রাদি. বললেন আমার এতো অধিক ঘুম আর কখনো পায় নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা করেছেন, তখন তোমাদের রুহ কবজ করে নিয়েছেন। আবার যখন ইচ্ছা করেছেন তখন ফিরিয়ে দিয়েছেন। হে বিলাল! ওঠো। লোকদের জন্য সালাতের আযান দাও। তারপর তিনি ওযূ করলেন এবং সূর্য যখন উপরে উঠল এবং উজ্জল হলো তখন তিনি দাড়াঁলেন এবং সালাত আদায় করলেন। হাদীসের কিতাবে এই রাতটি لَيْلَةُ التَّعْرِيسِ (যাত্রা বিরতির রাত) নামে পরিচিত। প্রায় সকল হাদীসের কিতাবে বিভিন্ন সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।[৪১৭]

[৪১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৫৯৫

২। হযরত জাবির রাদি. থেকে বর্ণিত-

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের হিফাজতের জন্য পরামর্শ করে মদীনার বাইরে খাল খনন করলেন। একে খন্দক যুদ্ধ বলা হয়।) খন্দকের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. এসে কুরাইশ গোত্রের কাফিরদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখনো আসরের সালাত আদায় করতে পারি নি, এমন কি সূর্য অস্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ! আমিও তা আদায় করতে পারি নি। অতপর আমরা উঠে বুতহানের দিকে গেলাম। সেখানে তিনি সালাতের জন্য ওযূ করলেন। আমরাও ওযূ করলাম। তারপর সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।[৪১৮]

৩। খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন-

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় না পৌছে সালাতুল আসর পড়বে না। (বনী কুরায়যায় গিয়ে সালাতুল আসর পড়বে।)[৪১৯]

সাহাবায়ে কেরাম বনু কুরইযার দিকে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে সালাতুল আসরের সময় হল। তারা সামনের দিকে চলতে লাগলেন। সালাতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কিছু সাহাবি পথেই সালাতুল

[৪১৮] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৫৯৬

[৪১৯] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৫৪৬

আসর আদায় করলেন। আর অন্যান্য সাহাবিগণ বনী কুরইযায় পৌছলেন। তখন আসরের সালাত আদায়ের সময় শেষ হয়ে গিয়ে ছিল। তবুও তারা সালাত আদায় করলেন না। তারা সালাত কাযা হিসেবে পড়লেন। সাহাবিদের এমন সিদ্ধান্তের ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থাপন করা হল। তিনি তাদের থেকে ঘটনা শোনলেন। তিনি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সালাত আদায়কারীদেরকে লক্ষ্য করে একথা বলেন নি, সালাত শুধু নির্ধারিত সময়ে পড়া যায়, সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা পড়া যায় না। বুঝা গেল সময় অতিবাহিত হলেও সালাত পড়তে হবে।

৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদি. থেকে বর্ণিত-

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ {وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন) কেউ যদি সালাতের কথা ভুলে যায়, (সালাত ছুটে যায়) তাহলে যখনই স্বরণ হবে, তখনই আদায় করে নিবে। এই পদ্ধতি ছাড়া সালাতের অন্য কোনো পদ্ধতিতে কাফফারা নেই। (মহান আল্লাহ বলেন আমার স্বরণের উদ্দেশ্যেই সালাত কায়েম করো।)[৪২০]

৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদি. থেকে বর্ণিত-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতরের সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল কিংবা তা ভুলে গেল সে যেন স্বরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেয়।[৪২১]

প্রিয় পাঠক! আমরা উপরে উল্লেখিত পাঁচটি হাদীস থেকে পরিস্কারভাবে জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম বিশেষ কারণে সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও তাঁরা সালাত আদায় করতেন। যা সময় মতো আদায় করতে পারতেন না, তা পরবর্তীতে পড়ে নিতেন। হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের ঘটনা এবং

[৪২০] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৫৯৭

[৪২১] আবু দাউদ, হাদীস- ১৪৩৩

তাদের আমল থেকে তেমন উল্লেখ যোগ্য বর্ননাও পাওয়া যায় না, যেখানে বলা হয়েছে সময় মতো সালাত আদায় করতে না পারলে সেই সালাত আর পড়তে হবে না, কিংবা এর জন্য শুধু ক্ষমা চেয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে। সুতরাং কেউ যদি বলে যে, সালাত সময় মতো পড়তে না পারলে পরে আর পড়তে হবে না, তাদের কথা সঠিক নয়। সালাত পড়তে না পারলে পরে পড়তে হবে, একথাই সঠিক।

কাযা নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান:

কাযা হয়ে যাওয়া সালাত আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিছু অসাধু মানুষ তা আদায় না করার জন্য হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহন করে থাকে। তারা এ বিয়য়ে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলমানের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ায়। কেউ যেন এ বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে এবং সহজ সরল কোনো মুমিন যেন তাদের বিভ্রান্তিতে না পড়ে এ জন্য এই বিষয়ে পরিষ্কার ও পূর্ন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা সাধারণ পাঠক/পাঠিকাদের কথা বিবেচনা করে বিষয়টিকে এতোক্ষণ আলোচনা করার পরও এখানে প্রশ্নোত্তরে উপস্থাপন করছি। যেন এই বিষয়ে খুব সহজে জ্ঞান অর্জন হয় এবং বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১. প্রশ্ন: কেউ যদি সময় মতো সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে তা আদায় করা কী অত্যাবশ্যক।

উত্তর: হ্যাঁ, কেউ যদি সময় মতো সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে তা আদায় করা অত্যাবশ্যক।

২. প্রশ্ন: সময় মতো সালাত আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে তা আদায় করার ব্যপারে কোনো সহীহ্ হাদীস আছে কী? থাকলে সেটি কোন কিতাবের কত নাম্বার হাদীস তা উল্লেখ করলে উপকৃত হবো।

উত্তর: সময় মতো সালাত আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ ব্যপারে কয়েকটি সহীহ হাদীস রয়েছে। আমরা সালাতের কাযা আদায়ের নীতিমালা শিরোনামে পাঁচটি হাদীস রেফারেন্সসহ উল্লেখ করেছি। সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

৩. প্রশ্ন: উপরে সালাতের কাযা আদায়ের নীতিমালা শিরোনামে বর্ণিত ৫ নং হাদীস থেকে জানা যায় যে, দুটি কারনে সালাত আদায় করতে না পারলে তা পরবর্তীতে আদায় করতে হবে। প্রথম কারণ; সালাতের কথা ভুলে গেলে। দ্বিতীয় কারণ; ঘুমিয়ে থাকার কারনে সালাত আদায় করতে না পারলে। সুতরাং কেউ যদি অবহেলা করে স্বেচ্ছায় সালাত আদায় না করে তাহলেও কী কাযা আদায় করতে হবে?

উত্তর: হ্যাঁ। কেউ যদি অবহেলা করে স্বেচ্ছায় সালাত আদায় না করে তাহলেও সালাতকে কাযা আদায় করতে হবে।

৪. প্রশ্ন: হাদীসে দুটি কারণে সালাতের কাযা আদায় করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অবহেলা করে স্বেচ্ছায় কেউ সালাত আদায় না করলেও তা আদায় করতে হবে এমন কথা হাদীসে বলা হয় নি। সুতরাং তা পরবর্তীতে কাযা আদায় করতে হবে কেন?

উত্তর: অবহেলা করে স্বেচ্ছায় কেউ সালাত আদায় না করলেও তা আদায় করতে হবে। এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি।

(ক) যেই হাদীসে সালাতের কাযা আদায়ের দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, সেই হাদীসের একটি শব্দের মধ্যেই একথা বলা হয়েছে যে, কেউ যদি সময় মতো সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। হাদীসে বর্ণিত نَسِيَ (নাছিয়া) শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভুলে যায়/গেছে। এখানে نَسِيَ (নাছিয়া) শব্দটির মূল শব্দ হল نِسْيَانٌ । এর অর্থ ভুলে যাওয়া। কিন্তু এই শব্দটি ভুলে যাওয়া অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর আরো অর্থ রয়েছে।

কেননা نِسْيَانٌ শব্দটি ভুলে যাওয়া অর্থের পাশাপাশি ত্যাগ করা বা বিরত থাকার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কুরআনের মধ্যে। কুরআনের সূরা তাওবার ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে- نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।

এখানে نَسُوا শব্দটির মূল শব্দ হলা نِسْيَانٌ । যার অর্থ হচ্ছে ভুলে যাওয়া। কিন্তু আয়াতে نسيان এর অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা। ফলে

আয়াতের মর্মার্থ হল তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বিরত থেকেছে, আল্লাহও তাদের প্রতি করুনা করা থেকে বিরত থেকেছেন।

আমরা এতোক্ষনে পরিস্কারভাবে জানতে পারলাম যে نسيان শব্দটি ভুলে যাওয়ার অর্থের পাশাপাশি ত্যাগ করা এবং বিরত থাকার অর্থও প্রকাশ করে। সুতরাং সে হিসেবে আলোচ্য হাদীসের অর্থ হবে সালাতকে সময়মতো পড়া থেকে বিরত থাকলে কিংবা ঘুমিয়ে থাকলে যখনই সালাতের কথা মনে পড়বে তখনই আদায় করে নিবে। অতএব কেউ সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে কিংবা ঘুমিয়ে থাকলে যেমনভাবে সালাতের কাযা আদায় করা অত্যাবশ্যক, ঠিক তেমনিভাবে সালাত আদায় করতে স্বেচ্ছায় বিরত থাকলেও পরবর্তীতে সেই সালাতের কাযা আদায় করা অত্যাবশ্যক।

(খ) কুরআন বুঝার মূলনীতি সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞান আছে তাদের যে কেউ আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে পারবেন। যেমন, কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ১৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না।

এখানে কেউ যদি বলে আয়াতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে, অল্প হারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয় নি। তাই অল্প অল্প করে সুদ খাওয়া যাবে। তার কথা যেমন সঠিক নয়, ঠিক তেমনিভাবে কেউ যদি বলে হাদীসে দুটি কারনে সালাতের কাযা আদায়ের কথা বলা হয়েছে। স্বেচ্ছায় সালাত ছেড়ে দিলে তা পরবর্তীতে কাযা আদায়ের কথা বলা হয় নি। তাই স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়া সালাতের কাযা আদায় করতে হবে না, তাদের এমন কথাও সঠিক নয়।

(গ) আমরা বলেছি কেউ যদি সময় মতো সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে সে অবশ্যই সালাত কাযা আদায় করবে। চাই সে সালাতকে ভুলে ছেড়ে দিয়ে থাকুক কিংবা সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকুক অথবা ইচ্ছা করেই সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকুক অথবা গাফেল হয়ে থাকুক।

আমরা আমাদের দাবীর পক্ষে এতক্ষন বুঝাতে চেষ্টা করেছি। এখন আমাদের দাবীর পক্ষেই সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

যখন তোমাদের কেউ সালাত ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে বা সালাত থেকে গাফেল হয় তখন সে যেন স্মরন হওয়ার পর তা আদায় করে।[৪২২]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে:-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ لِيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে অথবা সালাত থেকে গাফেল (উদাসীন) হয়ে থাকে। এর কাফফারা হলো, যখন সালাতের কথা স্মরন হবে তখন আদায় করে নিবে।[৪২৩]

৫. **প্রশ্ন:** আমাদের এলাকার এক লোক বলল ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তি তার কাযাকৃত সালাত আদায় করা অনর্থক। এতে কোনো ফায়দা নেই। আমি জানতে চাই যে, তার কথা সঠিক নাকি ভুল?

উত্তর: ঐ ব্যক্তির কথা সঠিক নয়। তার কথা অবশ্যই ভুল। এমন কথা নি:সন্দেহে সহীহ হাদীস এবং শরীয়তের মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এছাড়া যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করেছেন সে বিষয়টিকে অনর্থক বলা অনেক বড় ধরণের অন্যায় এবং ভ্রষ্টতা।

৬. **প্রশ্ন:** কোন কোন এলাকাতে লোক মুখে প্রচলিত আছে যে, জুমাতুল বিদায় বা রমযান মাসের শেষ জুমাআতে একটি সালাত পড়লে তা সত্তর বছরের কাযা সালাতের জন্য যথেষ্ট হবে। কেউ কেউ বলে যে, এটি নাকি হাদীস? এ ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

[৪২২] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১৬০১

[৪২৩] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস- ৬১৪; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস- ৯৯১; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদীস- ১৩২৬২

উত্তর: আপনার প্রশ্নের মধ্যে দুইটি অংশ রয়েছে।

প্রথম অংশ: জুমাতুল বিদায়। ইসলামে জুমাতুল বিদায় বলতে কিছু নেই। মূলত হাজ্জাতুল বিদায় বা বিদায়ী হজ্জের সাথে তুলনা করে জুমাতুল বিদায় পরিভাষাটি তৈরী করা হয়েছে। হাজ্জাতুল বিদায় মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ হজ্ব। এরপর তাঁর আর হজ্ব নেই। কিন্তু এর উপর অনুমান করে কোনো মুমিনের জন্য জুমাতুল বিদায় হতে পারে না। কারণ কোনো মুমিন নিশ্চিত করে বলতে পারে না ঐ জুমাটি তার জীবনের শেষ জুমআ। হয় তো এরপরও সে আরো জুমার সালাত (যেমন, রমযান মাসের পরবর্তী মাসের জুমআ) পড়ার তাওফিক লাভ করতে পারে। যদি সে পরবর্তীতে আরো জুমার সালাত পড়ার সুযোগ পায় তাহলে ঐ জুমআটি (রমযান মাসের শেষ জুমআটি) তার জন্য জুমাতুল বিদায় বা শেষ জুমআ হয় নি। তাহলে কোনো মুমিনের জন্য রমযানের শেষ জুমআকে জুমাতুল বিদায় বা শেষ জুমআ বলা মোটেও ঠিক না।

দ্বিতীয় অংশ: রমযান মাসের শেষ জুমআতে একটি সালাত পড়লে তা সত্তর বছরের কাযা সালাতের জন্য যথেষ্ট হবে। এটি হাদীস নয়। হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেছেন বর্ননাটি মওযু। হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী রাহিমাহুল্লাহ তার রচিত প্রসিদ্ধ কিতাবে লিখেছেন-

حديث: مَنْ قَضٰى صَلَاةً مِنَ الْفَرَائِضِ فِيْ آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَالِكَ جَابِرًا لِكُلِّ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فِيْ عُمُرِهِ إِلٰى سَبْعِيْنَ سَنَةً . بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلٰى أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا يَقُوْمُ مَقَامَ فَائِتَةٍ سَنَوَاتٍ

যে ব্যক্তি রমযান মাসের শেষ জুমআতে একটি ফরয সালাত আদায় করবে সেটা তার জীবনের সত্তর বছরের কাযা সালাতের জন্য যথেষ্ট হবে। এই বিবরণটি নিঃসন্দেহে বাতিল। কেননা এ বিষয়ে উম্মাহের ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে যে, কোনো একটি ইবাদত কয়েক বছরের ছুটে যাওয়া সালাতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।[৪২৪]

[৪২৪] (আল মাওযুআতুল কতবুরা, পৃ.- ৩৫৬; আল-মাসনূয় ফি মারিফাতিল হাদীসিল মারফূয়, হাদীস- ৩৫৮)

সুতরাং এমন ভিত্তিহীন বিবরণের উপর নির্ভর করে ছুটে যাওয়া সালাতকে বাদ দেয়ার কোনো ধরণের অবকাশ নেই। তাই পাঠক/পাঠিকাদের প্রতি অনুরোধ করছি কেউ এই ভিত্তিহীন বিবরণের উপর আমল করে প্রতারিত হবেন না। ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

সালাতুল মারিয বা অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

সালাতুল মারিয ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:

মারিয মানে অসুস্থ ব্যক্তি। সালাতুল মারিয মানে অসুস্থ ব্যক্তির সালাত। সুস্থ মানুষের উপর যেভাবে সালাত আদায় করা ফরয, তেমনিভাবে অসুস্থ অবস্থায়ও সালাত আদায় করা ফরয। কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে সে দাড়িয়ে সালাত আদায় করার চেষ্টা করবে। যদি দাঁড়াতে না পারে তাহলে সে কীভাবে সালাত আদায় করবে, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হবে।

সালাতুল মারিযের বিধান বা হুকুম:

একজন সুস্থ ব্যক্তি আর অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের বিধানের মধ্যে মৌলিক কোনো ধরণের পার্থক্য নেই। সুতরাং সুস্থ ব্যক্তির জন্য সালাতের মধ্যে যা ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নত রয়েছে, একজন অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও তা ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নত হিসেবে পালনীয়।

সালাতুল মারিযের সময়:

একজন সুস্থ ব্যক্তি আর অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের সময়ের মধ্যে কোনো ধরণের মৌলিক পার্থক্য নেই। সুতরাং সুস্থ ব্যক্তি যে সব সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করতে পারবে, একজন অসুস্থ ব্যক্তিও সে সব সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করতে পারতে পারবে।

সালাতুল মারিযের রাকাত সংখ্যা:

একজন সুস্থ ব্যক্তি আর অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের রাকাত সংখ্যার মধ্যেও কোনো ধরণের বিশেষ পার্থক্য নেই। সুতরাং সুস্থর ব্যক্তি জন্য যে

সময় যত রাকাত আদায় করার অনুমতি আছে, একজন অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও সে সময় তত রাকাত সালাত আদায় করার অনুমতি আছে।

সালাতুল মারিয আদায়ের নিয়ম:

একজন সুস্থ ব্যক্তি আর অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়মের মধ্যেও কোনো ধরণের পার্থক্য নেই। সুতরাং সুস্থ ব্যক্তি যে নিয়মে সালাত আদায় করবে, একজন অসুস্থ ব্যক্তিও একই নিয়মে সালাত আদায় করবে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে তার জন্য ইসলামের পক্ষ থেকে কিছুটা শিতিলতা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো কারণে দাঁড়িয়ে সালাত করতে অক্ষম হলে বসে সালাত আদায় করবে। যদি বসেও সালাত আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে। তবুও সালাত পরিত্যগ করবে না।

সালাতুল মারিযের নিয়ত:

একজন সুস্থ ব্যক্তি আর অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়তের মধ্যে কোনো ধরণের পার্থক্য নেই। সুতরাং সুস্থ ব্যক্তি যেভাবে নিয়ত করবে, একজন অসুস্থ ব্যক্তিও সেভাবেই সালাত আদায়ের নিয়ত করবে। আমরা নিয়ত সম্পর্কে বিস্তারীত আলোচনা করেছি। অত্র বইয়ের সূচী থেকে নিয়ত সম্পর্কে শিরোনামের আলোচনা দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সালাতুল মারিযের গুরুত্ব:

একজন সুস্থ ব্যক্তি আর অসুস্থ ব্যক্তির সালাত গুরুত্বের মধ্যে কোনো ধরণের পার্থক্য নেই। সুতরাং একজন সুস্থ ব্যক্তির জন্য যে সব সালাত আদায় করা ফরয, একজন অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও সে সব সালাত আদায় করা ফরয। একজন সুস্থ ব্যক্তির জন্য যে সব সালাত আদায় করা ওয়াজিব, একজন অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও সে সব সালাত আদায় করা ওয়াজিব। একজন সুস্থ ব্যক্তির জন্য যে সব সালাত আদায় করা সুন্নত, একজন অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও সে সব সালাত আদায় করা সুন্নত।

সালাতুল মারিযের ফযিলত:

একজন সুস্থ ব্যক্তি আর অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের ফযিলতের মধ্যে কোনো ধরণের মৌলিক পার্থক্য নেই। সুতরাং একজন সুস্থ ব্যক্তির জন্য সালাত আদায়ের মধ্যে যে সব ফযিলত রয়েছে, একজন অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও সালাত আদায়ের মধ্যে সে সব ফযিলত রয়েছে। তবে একজন অসুস্থ ব্যক্তি সালাত আদায়রে জন্য অসুস্থ থাকার পরও সে যে কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং অনেক ঝুকি বহন করেছে এর জন্য সে অতিরিক্ত সওয়াব পাবে।

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে সাজদা করতে না পারলে কীভাবে সাজদা করবে?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে সাজদা করতে না পারলে সে বসে সালাত আদায় করবে এবং মাথা ঝুকিয়ে ইশারার মাধ্যমে সাজদা করবে। তবে রুকুতে যে পরিমাণ মাথা ঝুকাবে এর চেয়ে সাজদাতে একটু বেশি পরিমাণে মাথা ঝুকাবে।

প্রশ্ন: কেউ কেউ বলে সাজদা দেওয়ার জন্য সাজদার স্থানে বালিশ কিংবা উঁচু জাতীয় কিছু একটা রেখে দেওয়ার জন্য। এখন প্রশ্ন হল সাজদার স্থানে বালিশ কিংবা এ ধরণের কিছু রেখে দেওয়ার প্রয়োজন আছে কী?

উত্তর: সাজদা দেওয়ার জন্য সাজদার স্থানে বালিশ কিংবা উঁচু জাতীয় কিছু একটা রেখে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং সাজদার সময় মাথা ঝুকালেই যথেষ্ট।

প্রশ্ন: সালাতের পূর্ণ সময় দাঁড়াতে পারে না, কিছু সময় দাঁড়াতে পারে এমন ব্যক্তির কী করণীয়?

উত্তর: যে ব্যক্তি সালাতের পূর্ণ সময় দাঁড়াতে পারে না, কিছু সময় দাঁড়াতে পারে এমন ব্যক্তির করণীয় হচ্ছে, সে প্রথমে যতটুকু সময় সালাতে দাঁড়াতে পারে সে ততটুকু সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে থাকবে। যখন দাঁড়াতে অক্ষম হবে বা দাঁড়িয়ে থাকতে না পারবে তখন সে বসে অবশিষ্ট সালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন: কেউ যদি বসেও সালাত আদায় করতে না পারে, তাহলে সে কীভাবে সালাত আদায় করবে এবং সালাত আদায় করার পদ্ধতি কী?

উত্তর: কেউ যদি বসেও সালাত আদায় করতে না পারে, তাহলে সে শুয়ে সালাত আদায় করবে। শুয়ে সালাত আদায় করার পদ্ধতি তিনটি।

প্রথম পদ্ধতি: অসুস্থ ব্যক্তি মাথা পূর্ব দিকে এবং পা পশ্চিম দিকে দিয়ে চিত হয়ে শুইবে। মাথার নিচে বালিশ কিংবা অন্য কিছু দিয়ে মাথাকে একটু উঁচু করে রাখবে। তারপর ইশারা করে সালাত আদায় করবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: অসুস্থ ব্যক্তি মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ দিকে দিয়ে কাত হয়ে শুইবে। মাথার নিচে বালিশ কিংবা অন্য কিছু দিয়ে মাথাকে একটু উঁচু করে রাখবে। চেহারা এবং বুক কিবলার দিকে রাখবে। তারপর মুখ কিবলার দিকে করে ইশারার মাধ্যমে সালাত আদায় করবে।

তৃতীয় পদ্ধতি: অসুস্থ ব্যক্তি মাথা দক্ষিণ দিকে এবং পা উত্তর দিকে দিয়ে কাত হয়ে শুইবে। মাথার নিচে বালিশ কিংবা অন্য কিছু দিয়ে মাথাকে একটু উঁচু করে রাখবে। চেহারা এবং বুক কিবলার দিকে রাখবে। তারপর মুখ কিবলার দিকে করে ইশারার মাধ্যমে সালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন: সুস্থ ব্যক্তিরা কোন কোন সালাত বসে আদায় করতে পারবে এবং কোন কোন সালাত বসে আদায় করতে পারবে না?

উত্তর: দাঁড়াতে সক্ষম হলে ফরয সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে হবে। বসে আদায় করলে তা আদায় হবে না। তেমনিভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হলে ওয়াজিব সালাতও দাঁড়িয়ে আদায় করতে হবে। বসে আদায় করলে তা আদায় হবে না। দাঁড়াতে সক্ষম হয়েও সুন্নত এবং নফল সালাত বসে আদায় করলে তা আদায় হবে তবে দাঁড়াতে সক্ষম থাকার পরও সুন্নত এবং নফল সালাত বসে বসে আদায় করলে তাকে অর্ধেক সওয়াব দেওয়া হবে। অর্থাৎ কোনো সুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সুন্নত এবং নফল সালাত আদায় করলে যে পরিমাণ সওয়াব পাবে সুস্থ ব্যক্তি সুন্নত এবং নফল সালাত বসে বসে আদায় করলে সেই পরিমাণ সওয়াব পাবে না। বরং বসে বসে সুন্নত এবং নফল সালাত আদায়কারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সুন্নত এবং নফল সালাত আদায়কারী ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে সুন্নত এবং নফল সালাত বসে বসে আদায় করলেও তাকে দন্ডায়মান ব্যক্তির সমান সমান সওয়াব দেওয়া হবে।

প্রশ্ন: দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারলে কীভাবে সালাত আদায় করবে?

উত্তর: দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারলে বসে সালাত আদায় করবে। যদি বসেও সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে সে শুয়ে সালাত আদায় করবে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন আমার অর্শরোগ ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো। যদি দাঁড়িয়ে আদায় করতে না পারো তাহলে বসে সালাত আদায় করো। যদি বসেও সালাত আদায় করতে না পারো তাহলে শুয়ে সালাত আদায় করো।[৪২৫]

প্রশ্ন: মাযূর কাকে বলে?

উত্তর: মাযূর বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যার পেশাব কিংবা রক্ত এমনভাবে ঝরতে থাকে যে, সে ব্যক্তি ওযূ করার পর সুন্দভাবে ফরয সালাত আদায় করার সময় পায় না, এর আগেই তার পেশাব কিংবা রক্ত ঝরতে শুরু করে। এমনিভাবে যার পেছন দিক থেকে এত ঘন ঘন বাতাস বের হয় যে, সে ব্যক্তি ওযূ করার পর সুন্দভাবে ফরয সালাত আদায় করার সময় পায় না, বরং এর আগেই তার পেছন দিক থেকে বাতাস বের হয়ে যায়, সে ব্যক্তিও মাযূর হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন: যে মাযূর ব্যক্তি ওযূ করার পর ফরয সালাত আদায় করার সময় পায় না, এর আগেই তার ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। সে মাযূর ব্যক্তি কীভাবে সালাত আদায় করবে?

[৪২৫] সহীহ বুখারী, হাদীস- ১১১৭

উত্তর: যে মাযূর ব্যক্তি ওযূ করার পর ফরয সালাত আদায় করার সময় পায় না, এর আগেই তার ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, সে মাযূর ব্যক্তি সালাতের সময় হলে ওযূ করবে। এই ওযূ দ্বারা সে যত ফরয, ওয়াজিব এবং নফল সালাত পড়তে চায় পড়তে পারবে। নতুন ওয়াক্ত আসার আগে তার পেশাব এবং রক্ত ঝরলেও ওযূ নষ্ট হবে না। তার ওযূ ঠিক থাকবে। পেছন দিক থেকে বাতাস বের হলেও তার ওযূ নষ্ট হবে না। তার ওযূ ঠিক থাকবে। তবে এই সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে আর কোনো সালাত পড়তে পারবে না। বরং নতুন ওয়াক্ত আসার পর তার তার ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। আবার নতুন করে ওযূ করতে হবে।

প্রশ্ন: মাযূর ব্যক্তি একবার ওযূ করার পর তার ওযূ কতটুকু সময় বহাল থাকে?

উত্তর: মাযূর ব্যক্তি একবার ওযূ করার পর তার ওযূ অন্য সালাতের সময় আসার পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকে। তবে যে কারণে সে মাযূর বলে গণ্য হয়েছে সে কারণ ছাড়া ওযূ ভঙ্গের অন্য কারণে ওযূ ভঙ্গ হলে আবার ওযূ করতে হবে।

সালাতুল মুসাফির

মুসাফিরের সালাত ও কিছু কথা:

মুসাফিরের সালাত বিষয়ক আলোচনার শুরুতে এ বিষয়ের কিছু পরিভাষা জেনে রাখা ভালো। তাহলে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সহজ হবে।

সফর: সফর আরবি শব্দ। এর অর্থ হল ভ্রমন করা। ইসলামি পরিভাষায় সফর বলা হয় এই পরিমাণ দুরত্বে ভ্রমন করা যেখানে স্বাভাবিকভাবে হেটে পৌছতে তিন দিন সময় লাগে। বর্তমান সময়ে আধুনিক হিসেব অনুযায়ী এর পরিমাণ হলো সাড়ে সাতাত্তর (৭৭.৫) কিলোমিটার। কেউ যদি এই পরিমাণ দূরত্বে ভ্রমণ করে তাহলে সেটা সফর বলে গণ্য ববে।

মুসাফির: এটিও আরবি শব্দ। এর অর্থ ভ্রমনকারী। ইসলামি পরিভাষায় মুসাফির বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে সাড়ে সাতাত্তর (৭৭.৫) কিলোমিটার দূরত্বে সফর বা ভ্রমন করে।

কসরঃ এই শব্দটিও আরবি শব্দ। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কমানো, কম করা, খাট করা, ছোট করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কসর বলা হয় চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাতকে দুই রাকাত আদায় করা।

ফরয সালাতে কসর করার বিধানঃ

যে সব ফরয সালাত চার রাকাত বিশিষ্ট, সে সব সালাতের ক্ষেত্রে কসর করতে হবে। অর্থাৎ চার রাকাত পড়বে না, বরং দুই রাকাত পড়বে। সেই সালাতগুলো হচ্ছে যোহর, আসর এবং ইশা। আর যে সব ফরয সালাত তিন রাকাত বা দুই রাকাত, সে সব সালাতের ক্ষেত্রে কোনো কসর নেই। অর্থাৎ সে সব সালাতকে পুরোপুরি পড়তে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন সালাতে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেরেরা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।[৪২৬]

হাদীসে এসেছে-

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ

আবদুল্লাহ রাদি. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি সফর অবস্থায় যখন ব্যস্ত হতেন, তখন তিনি মাগরিবের সালাতকে একটু বিলম্ব করে আদায় করতেন। তিনি মাগরিবের সালাতকে তিন রাকাতই আদায় করতেন। (তিন রাকাতের মধ্যে কোন কসর করতেন না।) মাগরিবের সালাত শেষে করার পর কিছুটা বিলম্ব করে

[৪২৬] সূরা নিসা, আয়াত-১০১

ইশার সালাতের ইকামত দেওয়া হতো। তখন তিনি ইশার দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন।[৪২৭]

ওয়াজিব এবং অন্যান্য সুন্নত ও নফল সালাতে কসর করার বিধানঃ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, শুধু চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাতের মধ্যে কসর করা যায়। এছাড়া ওয়াজিব এবং অন্যান্য সুন্নত ও নফল সালাতের মধ্যে কসর করা যায় না। এ সব সালাতকে পুরোপুরি পড়তে হবে। তবে বাড়ী অবস্থানের সময় সুন্নাত সালাত আদায় করা যতটা জরুরী, সফর অবস্থায় সুন্নাত সালাত পড়া ততটা জরুরী নয়।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ. قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

হযরত ঈসা ইবনে হাফস ইবনে আসিম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি মক্কার রাস্তায় ইবনে ওমরের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে যোহরের দুই রাকাত সালাত পড়লেন। তারপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন। আমরাও তার সাথে সামনে অগ্রসর হলাম। তারপর তিনি আরোহনের স্থানে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর সাথে এসে বসলাম। এরপর তিনি সালাত আদায়ের স্থানে

[৪২৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-১০৯২

কিছু লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারা ওখানে কী করছে? আমি বললাম, তারা ওখানে নফল সালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, আমি যদি নফল সালাত আদায় করতাম তাহলে আমি তো আমার ফরয সালাতকে পরিপূর্ণ আদায় করতাম। হে ভ্রাতুষ্পুত্র (ভাতিজা)! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফর করেছি। কিন্তু তিনি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত সফরে দুরাকাতের বেশি পড়েন নি। আমি ওমরের সাথে সফর করেছি, তিনিও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত সফরে দুরাকাতের বেশি পড়েন নি। আমি ওসমানের সাথে সফর করেছি, তিনিও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত সফরে দুরাকাতের বেশি পড়েন নি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।[৪২৮]

অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

হযরত হাফস ইবনে আসিম রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। হযরত ইবনে ওমর রাদি. আমাকে দেখতে এলেন। আমি তাঁকে মুসাফির অবস্থায় সুন্নাত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: আমি (ইবনে ওমর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফর করেছি। কিন্তু তাঁকে সুন্নাত সালাত আদায় করতে দেখি নি। যদি সুন্নাত পড়তাম তবে তো ফরয সালাত পূর্ণ আদায় করতাম। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।[৪২৯]

---

[৪২৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৬১১

[৪২৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৬১২

মুসাফিরের সালাতের নিয়্যত:

নিয়্যত সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বিস্তরীত আলোচনা করেছি। তারপরও এখানে মুসাফির তার সালাতের নিয়্যত কীভাবে করবে। তা উল্লেখ করছি। মুসাফিরের সালাতের নিয়ত হল, যখন সে সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন সে যেই সালাত পড়তে চাবে তখন সে মনে মনে এভাবে সিদ্ধান্ত নিবে যে ‘আমি অমুক দুই রাকাত ফরয আদায় করছি’ আল্লাহু আকবার। আর কিছু বলতে হবে না। এরপর অন্যান্য সালাতের মতো বাকী কাজ সম্পন্ন করবে। আরও জানতে হলে আমাদের এই বইয়ের সালাতের নিয়্যত সম্পর্কিত আলোচনা দেখে নিতে পারেন।

মুসাফিরের সালাত আদায়ের নিয়ম:

মুসাফির শুধু যোহর, আসর এবং ইশার ফরয সালাতের মধ্যে কসর করতে পারবে। অর্থাৎ চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়বে। অন্যান্য দুই রাকাত ফরয সালাত যেভাবে পড়তে হয় সেভাবে এই সালাতও পড়বে। এর জন্য ভিন্ন কোনো সূরা, কিরাত এবং আলাদা দুআ করতে হয় না। অন্য কোন সালাতের মধ্যে কসর করতে পারবে না।

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: মুসাফির অবস্থায় সালাত আদায় করলেও কী আযান ও ইকামত দিতে হবে?

উত্তর: আযান ও ইকামত দিয়ে সালাত আদায় করবে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরিছ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: দুই ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ যখন তোমরা সফরে বের হবে তখন তোমরা আযান দিবে। তারপর ইকামত দিবে। তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।[৪৩০]

প্রশ্নঃ কখন থেকে কসর আরম্ভ হয়? অর্থাৎ সফরের নিয়ত করা হয়েছে, তবে এখনো বাড়ি থেকে বের হয় নি। তাহলে বাড়িতে কসর করবে নাকি বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর?

উত্তরঃ নিজ এলাকার বসতি অতিক্রম করার পর কসর আরম্ভ করতে হবে। এর আগে নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে সফরের ইচ্ছা করলেন, তখন মদীনার বাইরে যুলহুলায়ফা নামক স্থানে সালাতকে কসর করে পড়েছিলেন।

প্রশ্নঃ সূরা নিসার ১০১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন সালাতে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেরেরা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। এখন আমার প্রশ্ন হল, আমাদের কারো সফরে অমুসলিদের থেকে কোন ধরণের ক্ষতি বা উত্যক্ত হবার আশঙ্কা না হলেও সালাতের কসর করতে পারব কিনা?

উত্তরঃ অমুসলিমদের থেকে মুসলিমদের উপর ক্ষতির বা উত্যক্ত হবার আশঙ্কা না থাকলেও সালাতকে কসর করা যাবে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি.- জিজ্ঞাসা করলাম, কুরআনে

[৪৩০] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৬৩০

উল্লেখ করা হয়েছে 'যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, অমুসলিমরা তোমাদেরকে উত্যক্ত বা ক্ষতি করবে। তাহলে তোমরা সালাতকে কসর করতে পারো।' তাহলে প্রশ্ন হল, এখন তো অমুসলিমদের থেকে এই ধরণের আশঙ্কা নেই। তাহলে কি আমরা সালাতকে কসর করতে পারব। তিনি বললেন, তোমার এই প্রশ্নটি আমারও ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই প্রশ্নটি করেছিলাম। তিনি বলেছেনঃ এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ। সুতরাং এটা গ্রহণ কর।[৪৩১]

প্রশ্নঃ ইমাম সাহেব মুসাফির হলে আর মুক্তাদীগণ মুসাফির না হলে, তখন কী করণীয়?

উত্তরঃ ইমাম সাহেব মুসাফির হলে আর মুক্তাদীগণ মুসাফির না হলে, তখন করণীয় হচ্ছে, তাহলে ইমাম সাহেব দুই রাকাত সালাত শেষ করে সালাম ফিরাবেন। সালাম ফিরানো শেষ হলে সকল মুক্তাদী দাঁড়াবে। এরপর সালাতের অবশিষ্ট অংশ নিজে নিজে পড়ে নিবে।

প্রশ্নঃ ইমাম এবং মুক্তাদী সবাই মুসাফির। তখন কীভাবে সালাত পড়বে? অর্থাৎ কসর করতে হবে? নাকি পূর্ণ সালাত পড়তে হবে?

উত্তরঃ ইমাম এবং মুক্তাদী সবাই মুসাফির। তখন সবাই কসর করতে হবে। পূর্ণ সালাত পড়তে হবে না।

প্রশ্নঃ মুসাফির ব্যক্তি সুন্নাত সালাতও পড়তে হবে কিনা?

উত্তরঃ মুসাফির ব্যক্তি সুন্নাত সালাতও পড়তে হবে। অনেকে মনে করে যে, মুসাফির ব্যক্তির জন্য ফরয সালাত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সুন্নাত সালাত পড়তে হবে না। তাদের এমন ধারণা সঠিক নয়। বরং মুসাফির ব্যক্তিও সুন্নাত সালাত পড়তে হবে।

প্রশ্নঃ মুসাফির ব্যক্তি এমন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়িয়েছে যিনি মুসাফির নন। তাহলে এমন ইমামের পিছনে মুসাফির ব্যক্তি সালাত আদায় করলে কসর করবে নাকি পূর্ণ সালাত পড়তে হবে?

উত্তরঃ তাহলে এমন ইমামের পিছনে মুসাফির ব্যক্তি সালাত আদায় করলে পূর্ণ সালাত পড়তে হবে। কসর করতে পারবে না। কারণ, ইমামের পিছনে দাঁড়ালে তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব।

[৪৩১] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৬০৫; সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১২০১

প্রশ্ন: মুসাফির হয়েও কসর না করে পূর্ণ সালাত পড়লে কোন অসুবিধা হবে নাকি:

উত্তর: মুসাফির অবস্থায় একাকী সালাত আদায় করার সময় সালাতকে কসর করা ওয়াজিব। অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাতকে দুই রাকাত পড়া ওয়াজিব। তবে ইমামের সাথে বা জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে পূর্ণ সালাত আদায় করতে হবে। যদি কেউ পূর্ণ চার রাকাত আদায় করে তাহলে গুনাহ হবে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওসমান ইবনে আফফান রাদি. একবার আমাদেরকে নিয়ে মিনায় চার রাকাত সালাত আদায় করলেন। তারপর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি.-কে জানানো হয়েছে। তিনি প্রথমে ইন্নালিল্লাহ পড়লেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মিনায় দুই রাকাত পড়েছি। হযরত আবু বকর রাদি.-এর সঙ্গেও মিনায় দুই রাকাত পড়েছি। এরপর হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি.-এর সঙ্গেও মিনায় দুই রাকাত পড়েছি। কতই না ভালো হতো যদি চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত মাকবূল সালাত পড়া হতো।[৪৩২]

প্রশ্ন: মুসাফির অবস্থায় সালাত কাযা হয়েছে। সফর থেকে বাড়ীতে আসার পর ঐ কাযা সালাত পড়তে চাইলে সালাতকে কসর করে পড়বে? নাকি পূর্ণ সালাত পড়তে হবে?

[৪৩২] সহীহ বুখারী, হাদীস-১০৮৪

উত্তর: মুসাফির অবস্থায় সালাত কাযা হয়েছে। সফর থেকে বাড়ীতে আসার পর ঐ কাযা সালাত পড়তে চাইলে সালাতকে কসর করে পড়বে। পূর্ণ সালাত পড়তে হবে না।

প্রশ্ন: বাড়ীতে থাকা অবস্থায় সালাত কাযা হয়েছে। মুসাফির অবস্থায় ঐ কাযা সালাত পড়তে চাইলে সালাতকে কসর করে পড়বে? নাকি পূর্ণ সালাত পড়তে হবে?

উত্তর: পূর্ণ সালাত পড়তে হবে?

প্রশ্ন: কতটুকু দূরত্বের সফরে বের হলে কসর করবে এবং কতদিন কসর করতে পারবে?:

উত্তর: কেউ যদি নিজ এলাকা থেকে ৪৮ মাইল, যার বর্তমান আধুনিক কিলোমিটারের হিসাব অনুযায়ী সাড়ে সাতাত্তর (৭৭.৫) কিলোমিটার দূরত্বে সফর বা ভ্রমন করে আর সেখানে গিয়ে পনের দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করে, তাহলে সে সালাতকে কসর করবে। সে নিজ এলাকাতে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কসর করতে হবে। আর যদি কোনো স্থানে পনের দিনের বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করে তাহলে কসর করতে পারবে না। সে পূর্ণ সালাত আদায় করতে হবে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করল সে পূর্ণ সালাত আদায় করবে।[৪৩৩]

প্রশ্ন: জামাতা তার শ্বশুর বাড়িতে পুরো নামায আদায় করবে নাকি কসর করবে?

উত্তর: জামাতা যদি শ্বশুর বাড়িতে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাহলে সেখানে সে পূর্ণ নামায পড়বে। অন্যথায় কসর করবে, যদি সে মুসাফির হয়।[৪৩৪]

[৪৩৩] তিরমিযি, হাদীস-৫৪৮

[৪৩৪] ফাতওয়া মাহমূদিয়- ১৪/২২৮; সূত্র: সমকালীন জরুরী মাসায়েল, পৃ.- ৫৪

প্রশ্ন: বিবাহিতা মহিলা পিত্রালয়ে গেলে পুরো নামায পড়বে নাকি কসর করবে? এমনিভাবে সে মহিলার সন্তানেরা তাদের নানার বাড়িতে পুরো নামায পড়বে নাকি কসর করবে?

উত্তর: স্বামীর বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যখন কোনো মহিলা ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য পিত্রালয়ে যাবে তখন সে পিত্রালয়ে কসর করবে। তেমনিভাবে তার সন্তানেরা তাদের নানার বাড়িতে নামায কসর করবে, যদি তারা শরীয়ত সম্মতভাবে মুসাফির হয়।[৪৩৫]

সালাতুত তাহাজ্জুদ

সালাতুত তাহাজ্জুদ ও কিছু কথা:

তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব এবং ফযিলত অনেক বেশি। কুরআন-হাদীসে এতো বেশি গুরুত্ব এবং ফযিলত আর কোনো নফল সালাতের ব্যপারে বলা হয় নি। এতো গুরুত্ব এবং ফযিলত থাকা সত্ত্বেও আমরা বিষয়টিকে অবহেলা করছি প্রতিনিয়ত। হয়তো কেউ বলবেন তাহাজ্জুদ সালাত পড়া খুবই কষ্টকর বিষয়। আমি বলব তাহাজ্জুদ সালাত পড়া কষ্টকর হলেও রমযান মাসে তা কষ্টকর হওয়ার কথা না। কারণ কেউ সাহরী খাওয়ার জন্য যখন উঠবে তখন তার জন্য কয়েক রাকাত সালাত পড়া খুবই সহজ একটা ব্যাপার। শুধু একটু সদিচ্ছা থাকলেই হয়। এছাড়া অর্থাৎ রমযান মাস ছাড়াও তাহাজ্জুদ সালাত পড়ার ইচ্ছা থাকলেই পড়া যায়।

সালাতের সময়:

ইশার সালাতের পর শেষ রাতে যে সালাত পড়া হয় তা সালাতুত তাহাজ্জুদ। এর সর্বোত্তম সময় হলো রাতের শেষ তৃতীয় অংশ।

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত-

[৪৩৫] ফাতওয়া মাহমূদিয়- ১৬/৪২৮; সূত্র: সমকালীন জরুরী মাসায়েল, পৃ.- ৫৪

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাদের প্রভু প্রতি রাতের শেষ তৃতীয় অংশে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলেন, কোনো দুআকারী আছে কি? আমি তার দুআ কবুল করব। কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তার প্রার্থিত বস্তু দান করব। কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব।[৪৩৬]

আর যেহেতু তাহাজ্জুদ সালাত রাত্রের এক তৃতীয়াংশ হওয়ার পরই পড়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এখন যদি রাত শুরু হয় ছয়টা থেকে, আর ভোর হয় ছয়টার সময়। তাহলে রাতের পরিমাণ হল মোট বার ঘন্টা। এই বার ঘন্টার এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে মাত্র চার ঘন্টা। তাই সন্ধা ছয়টা থেকে হিসাব করলে দেখা যায় রাত ১০ টায় রাত্রের এক তৃতীয়াংশ শেষ। সুতরাং যেহেতু রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাজ্জুদ সালাত পড়া যায় তাই এই হিসাবে রাত ১০ টার পরও তাহাজ্জুদ পড়া যাবে। মোট কথা হচ্ছে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাজ্জুদ সালাত পড়া যায়। এই সুযোগ হলো তাদের জন্য যারা অসুস্থ বা অক্ষম। অন্যরা পড়লেও সওয়াব পাবে। সে হিসাবে আমরা সকলেই তাহাজ্জুদ সালাত পড়তে পারি খুবই সহজে। কারণ সাধারণত আমরা রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার আগে কেউই ঘুমাই না। তাহলে আমরা অবশ্যই তাহাজ্জুদ সালাত পড়ব। তবে এর জন্য সর্বোত্তম সময় হল ভোর রাত। যদি অসুবিধা মনে হয় তাহলে মাঝে-মধ্যে রাতের প্রথম অংশে পড়ে নেয়া যায়।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

তাহাজ্জুদ সালাতের রাকাত সংখ্যা হলো দুই রাকাত থেকে বার রাকাত পর্যন্ত। কেউ যদি আরও বেশি পড়তে চায় তাহলে পড়তে পারবে। তবে

[৪৩৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৪৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত বেশিরভাগ সময় আট রাকাত পড়তেন। শেষরাত্রে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম।

হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত-

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত কেমন হতো? তিনি বললেন, (শুধু রমযান মাসে কেন?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ও অন্যান্য মাসেও এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাকাত পড়তেন। এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলব! এরপর তিনি আবার চার রাকাত পড়তেন। এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্যতা বর্ণনাতীত। এরপর তিনি তিন রাকাত (বিতর) পড়তেন।[৪৩৭]

তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের নিয়মঃ

তাহাজ্জুদ সালাত পড়ার নিয়ম হলো অন্যান্য নফল সালাত পড়ার নিয়মেই পড়তে হয়। আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন এ রাতে অমুক সূরা এতবার আর অমুক সূরা এতবার পড়তে হয়। আসলে কুরআন-হাদীসে এসব নেই। আমাদের দেশে মকসুদুল মুমিন বা বাজারে আরো কিছু ছোট ছোট বইয়ে তাহাজ্জুদ সালাতের কিছু নিয়ম লেখা আছে। যেমন, এক সাথে চার রাকাত পড়ার নিয়ত করতে হয়। এভাবে মোট বার রাকাত পড়তে হয়। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর দশবার, বা বিশবার সূরা কদর পড়তে হয়। দ্বিতীয় রাকআতে দশবার সূরা মাউন পড়তে হয়। তৃতীয় রাকআতে দশবার সূরা ইখলাস এবং চতুর্থ রাকআতে দশবার সূরা নাস পড়তে হয়। মকসুদুল মুমিন বা বাজারের ছোট-খাট বইয়ের এসব

---

[৪৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৪৭

কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট কথা। কারণ এসব কুরআন-হাদীসে নেই। তবে রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে নিয়ম হলো, যে যতটুকু পড়তে চায় সে ততটুকু পড়বে। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার রাকাত থেকে নিয়ে বার রাকাত পর্যন্ত পড়তেন। অন্যান্য সুন্নত বা নফল সালাত যেভাবে পড়া হয় সেভাবে পড়তে হয়। এটাই আসল নিয়ম। এর আলাদা কোনো নিয়ম-নীতি নেই। সুনির্দিষ্ট সূরাও নেই।

তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্বঃ

১. তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ()

রাতের কিছু অংশেও তাঁর সামনে সাজদা কর এবং রাতের দীর্ঘসময় তাঁর তাসবীহ পালনে রত থাক।[৪৩৮]

২. মহা মানবের প্রতি সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশঃ

মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ () قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا () نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا () أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا () إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ()

হে চাদরাবৃত (চাদরে জড়ানো নবী!)। রাতের কিছু অংশ ছাড়া বাকি রাত ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। রাতের অর্ধাংশ অথবা অর্ধাংশ থেকে কিছু কমাও। অথবা তা থেকে কিছু বাড়িয়ে নাও। ধীর-স্থিরভাবে স্পষ্টরূপে কুরআন তিলাওয়াত কর। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি এক গুরুভার বাণী।[৪৩৯]

৩. রাসূলুল্লাহ ও সাহাবিগণ সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়তেনঃ

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ

---

[৪৩৮] সূরা ইনসান/দাহর, আয়াত- ২৬

[৪৩৯] সূরা মুয্‌যাম্মিল, আয়াত ১-৫

(হে রাসূল!) আপনার প্রতিপালক জানেন, আপনি রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশে, কখনো অর্ধ রাতে এবং কখনো রাতের এক তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য) জাগরণ করেন। আপনার সঙ্গীদের মধ্যেও একটি দল (এ রকম করেন।)[৪৪০]

৪. রাসূলুল্লাহ ও সাহাবিগণ তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য ঘুমকে কমিয়ে দিতেন:

কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ () آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ () كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ () وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ()

নিশ্চয় মুত্তাকীগণ জান্নাত ও প্রসবণসমূহের ভেতরে থাকবে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দেবেন, তারা তা উপভোগ করতে থাকবে। তারা তো এর আগেই সৎকর্মশীল ছিল। তারা রাতে কমই ঘুমাত। তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফার করত।[৪৪১]

তারা রাতে কমই ঘুমাত। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রাদি. রাতে সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়তেন।

৫. মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে হলে সালাতুত তাহাজ্জুদ অত্যাবশ্যক:

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত-

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

[৪৪০] সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত-২০

[৪৪১] সূরা যারিয়াত, আয়াত- ১৫-১৮

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এতো দীর্ঘ সময় সালাতে দণ্ডায়মান থাকতেন যে, তাঁর পা ফোলে যেত। এ অবস্থা দেখে উম্মুল মুমিনীন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত পরিশ্রম করছেন কেন? অথচ মহান আল্লাহ আপনার বিগত-আগত সব কিছুই ক্ষমা করে দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে কি আমি কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না।[৪৪২]

৬. তাহাজ্জুদ সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত:

তিরমিযির হাদীসে এসেছে-

عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّه دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيْرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمُطْرِدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ

হযরত বিলাল রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয়ে যত্নবান হও। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী পূন্যবান মানুষের অভ্যাস। আর তা হচ্ছে তোমাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায়। মন্দকাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং গুনাহ মোচনকারী। শরীর থেকে রোগ দূরীভূতকারী। [৪৪৩]

তাহাজ্জুদ সালাতের ফযিলত:

কুরআন-হাদীসে তাহাজ্জুদ সালাতের অনেক ফযিলতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আমরা সংক্ষেপে কিছু ফযিলতের কথা আলোচনা করব।

১. সালাতুত তাহাজ্জুদ সম্মানের সর্বোচ্চ স্থানে পৌছার সোপান:

মহান আল্লাহ বলেন-

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

[৪৪২] সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৮৩৭

[৪৪৩] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৩৫৪৯

(হে নবী!) আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করুন। এটা আপনার জন্য নফল (অতিরিক্ত)। মহান রাব্বুল আলামীন আপনাকে মাকামে মাহমুদে (সম্মানের সর্বোচ্চ স্থানে) পৌছে দিবেন।[৪৪৪]

২. সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়কারীরা আল্লাহর প্রিয় বান্দাঃ

কুরআনে বলা হয়েছে-

عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে সালাম। আর যারা রাত্রি জাগরণ করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সাজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে।[৪৪৫]

৩. সালাতুত তাহাজ্জুদ মনের কুপ্রবৃত্তি দলনের সর্বোত্তম পদ্ধতিঃ

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

অবশ্যই রাত্রিকালের জাগরণ এমনই কর্ম যা দ্বারা কঠিনভাবে প্রবৃত্তির দলন (দমন) হয় এবং কথাও বলা হয় উত্তমভাবে।[৪৪৬]

রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাতের পড়তে অভ্যস্ত হলে নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। আর রাতের বেলা যেহেতু পরিবেশ শান্ত থাকে, চারদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করে তাই তখন তিলাওয়াত ও দুআ সুন্দর এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায়। রাতের বেলায় পূর্ণমাত্রায় মনোযোগও দেওয়া যায়। দিনের বেলায় এ সুবিধা কম থাকে। (আল্লামা তাকী ওসমানী দা.বা. কর্তৃক সংকলিত তাওযীহুল কুরআন।)

---

[৪৪৪] সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত-৭৯

[৪৪৫] সূরা ফুরকান, আয়াত- ৬৩-৬৪

[৪৪৬] সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত-৬

৪. সালাতুত তাহাজ্জুদ সকল বৈধ কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূরণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত-

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাদের প্রভু প্রতি রাতের শেষ তৃতীয় অংশে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলেন, কোনো দুআকারী আছে কি? আমি তার দুআ কবুল করব। কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তার প্রার্থিত বস্তু দান করব। কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব।[৪৪৭]

৫. সালাতুত তাহাজ্জুদ মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয়ঃ

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতো বেশি রাত্র জাগরণ (সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়) করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। তখন আয়েশা রাদি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহান আল্লাহ আপনার আগে-পিছনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? (তাহলে কেন এতো কষ্ট করছেন?) তিনি বললেন, আমি কি মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না। (অর্থাৎ আমি সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার জন্য পছন্দ করি।)[৪৪৮]

---

[৪৪৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৪৫

[৪৪৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৮৩৭

৬. তাহজ্জুদ পড়লে আপনার জন্য জান্নাতের লোভনীয় অট্টালিকা বরাদ্দঃ

তিরমিযিতে এসেছে-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

হযরত আলী রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতে এমন অট্টালিকা রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরে দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভেতরে দেখা যাবে। এক সাহাবি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব অট্টালিকা কাদের জন্য? তিনি বললেন, এসব অট্টালিকা তাদের, যারা অন্যের সাথে বিনম্রভাষায় কথা বলে। ক্ষুধার্তকে খাবার দান করে। নিয়মিত সিয়াম পালন করে। যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে তখন সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়ে।[৪৪৯]

সামান্য ব্যবধানে তিরমিযিতে আরেকটি হাদীসে এসেছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

হে লোক সকল! তোমরা সালামের প্রচলন কর। অনাহারীকে খাবার দাও। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ। আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় কর। তাহলে নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে।[৪৫০]

৭. সালাতুত তাহাজ্জুদ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়ঃ

৮. সালাতুত তাহাজ্জুদ মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারীঃ

৯. সালাতুত তাহাজ্জুদ গুনাহ মোচনকারীঃ

১০. সালাতুত তাহাজ্জুদ শরীর থেকে রোগ দূরীভূতকারীঃ

---

[৪৪৯] তিরমিযি, হাদীস-১৯৮৪

[৪৫০] তিরমিযি, হাদীস-২৪৮৫; বুলুগুল মারাম, হাদীস- ১৫৩১

তিরমিযির হাদীসে এসেছে-

عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّه دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيْرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمُطْرِدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ

হযরত বিলাল রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয়ে যত্নবান হও। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী পূন্যবান মানুষের অভ্যাস। আর তা হচ্ছে তোমাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায়। মন্দকাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং গুনাহ মোচনকারী। শরীর থেকে রোগ দূরীভূতকারী।[৪৫১]

১১. সালাতুত তাহাজ্জুদ সকল নফল সালাতের মধ্যে সর্বোত্তমঃ

সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত কোনটি এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম কোনটি? তখন তিনি বললেন, ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাত্রের সালাত (তাহাজ্জুদ সালাত)। রমযান মাসের ফরয সিয়ামের পর নফল সিয়ামের মধ্যে সর্বোত্তম সিয়াম হল মুহাররাম মাসের সিয়াম।[৪৫২]

---

[৪৫১] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৩৫৪৯

[৪৫২] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮১৩

১২. সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়কারীদেরকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন:

তিরমিযির হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثةٌ يُحِبُّهُمُ الله وثلاثةٌ يُبْغِضُهُمُ الله فأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فسأَلَهُمْ باللهِ ولَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بأَعْقابِهِمْ فأَعْطاهُ سِراً لا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إلا الله والّذي أَعْطاهُ وَقَوْمٌ ساروا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إذا كان النَّوْمُ أَحَبَّ إلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ فَوَضَعُوا رُؤوسَهُمْ فَقامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلو آياتي وَرَجُلٌ كانَ في سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ العَدُوَّ فَهُزِمُوا فأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ والثَّلاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ الله الشَّيْخُ الزَّانِي والفَقِيرُ المُخْتالُ والغَنِيُّ الظَّلُومُ

হযরত আবু যার রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন প্রকার লোককে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। আর তিন প্রকার লোককে মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন।

মহান আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন তারা হলো-

১. ঐ ব্যক্তি যে কোনো সম্প্রদায়ের নিকট এসে ধরণের আত্মীয়তার সম্পর্কের দাবী ব্যতীত শুধু মহান আল্লাহর নামে কিছু প্রার্থনা করে। কিন্তু তারা প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেয়। তখন তাদের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি তাদেরকে পেছনে ফেলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সে প্রার্থীকে এতো গোপনে দান করে, মহান আল্লাহ এবং গ্রহীতা ছাড়া আর কেউ জানে না।

২. ঐ সম্প্রদায় যারা রাত্রের বেলায় চলেছে। নিদ্রা তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে যায়। আর তারা তাদের মাথা রেখে দেয় (বালিশে)। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে, কুরআন তিলাওয়াত করে।

৩. ঐ ব্যক্তি যিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। শত্রুর সম্মুখীন হন। হয়তো শাহাদাত নতুবা বিজয় লাভ না হওয়া পর্যন্ত বুক টান করে (রণাঙ্গণের সামনের দিকে) অগ্রসর হতে থাকেন।

মহান আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন।

১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী। ২. অহঙ্কারী ভিক্ষুক। ৩. অত্যাচারী ধনী।[৪৫৩]

১৩. সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়কারীর প্রতি মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন:

সুনানে আবু দাউদ- এর হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করুন, যে রাতে (ঘুম থেকে) জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে। এরপর স্ত্রীকে জাগিয়ে তুলে। স্ত্রী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে তার চেহারাতে সামান্য পানি ছিটিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহমত বর্ষণ করুন, যে রাতে (ঘুম থেকে) জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে। এরপর স্বামীকে জাগিয়ে তুলে। স্বামী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে তার চেহারাতে সামান্য পানি ছিটিয়ে দেয়।[৪৫৪]

১৪. সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়কারী শ্রেষ্ঠ উম্মত:

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشْرافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وأَصْحابُ اللَّيْلِ

---

[৪৫৩] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-২৫৬৮

[৪৫৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস-১৩১০

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল তারা, যারা কুরআনের বাহক এবং রাত্র জাগরণকারী অর্থাৎ সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়কারী।[৪৫৫]

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: আমি রাতে ঘুম থেকে উঠে সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়ার ইচ্ছা করি কিন্তু উঠতে পারি না। আমি এই সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারি? আমার জন্য করণীয় কী?

উত্তর: প্রতিটি মুমিনের জন্য উচিত সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়া। এই পূর্ববর্তী পূন্যবানদের অভ্যাস। নবীদের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। মহান আল্লাহর রহমত পাবার অন্যতম মাধ্যম। তাঁর মুহাব্বত লাভের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। এই সালাত সকল নফল সালাতের মধ্যে সর্বোত্তম। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। এর দ্বারা গুনাহ ক্ষমা করা হয়। সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করলে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে সহজ হয়। শরীরের রোগ দূর হয়। সম্মানের উচ্চ আসনে পৌছতে এই সালাতের বিকল্প নেই। কাঙ্ক্ষিত সকল বৈধ বাসনা পূরণ হয় এই সালাতের মাধ্যমে। সুতরাং এই সালাত পড়তে না পারলে তা বড় দু:খজনক বিষয়।

তবে অনেক মুমিন এমন আছেন যারা এই সালাত পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রচন্ড ঘুমের কারণে কিংবা অলসতার কারণে ঘুম থেকে জেগে সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন না। তাদের প্রতি আমাদের কিছু পরামর্শ এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি এর দ্বারা মুমিনের কিছু উপকার হবে। ইনশাআল্লাহ।

১. শয়তানকে পরাজিত করার জন্য হৃদয়ে সর্বদা চেতনা লালন করুন:

শয়তান মুমিনকে সব সময় ধোকা দিতে থাকে। এই জন্য মুমিনের উচিত হচ্ছে সব সময় শয়তানকে পরাজিত করার জন্য হৃদয়ে চেতনা লালন

[৪৫৫] তাবরানী, হাদীস-১২৬৬২; ইমাম বাইহাকীর সংকলিত শুয়াবুল ঈমান হাদীস-২৭০৩; নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন হাদীসটি সহীহ। দেখুন সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস-৬২৮। অবশ্য তিনি অন্য কিতাবে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

করা। যেন শয়তানের প্ররোচনায় সুন্নাহ নির্দেশিত কোনো আমল ছুটে না যায়। আমলে যেন কোনো বিদআত অনুপ্রবেশ না করে। শয়তানকে পরাজিত করার জন্য আমাদের হৃদয়ে চেতনা সঠিকভাবে লালন করতে পারলে আমরা শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে থাকতে পারব। তখন সুন্নাহ নির্দেশিত সকল আমল করা আমাদের জন্য সহজ হবে। এই জন্য শয়তানের প্ররোচনা এবং চক্রান্তের পদ্ধতি কী? এবং মুমিন তা থেকে কীভাবে বেঁচে থাকবে তার পদ্ধতিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসেও এসেছে। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবায় তিনটি গিট দেয়। প্রতিটি গিট দেওয়ার সময় ফুঁ দিয়ে একথা বলে এখনও অনেক রাত আছে, সুতরাং তুমি আরও ঘুমাও। তারপর সে যদি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করে (অর্থাৎ ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর সুন্নাহ নির্দেশিত দুআ পড়ে) তাহলে তার গ্রীবা থেকে একটি গিট খুলে যায়। এরপর ওযূ করলে আরেকটি গিট খুলে যায়। অত:পর যখন সে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে তখন শেষ গিটও খুলে যায়। তখন সে আনন্দিত ও প্রফুল্ল মন নিয়ে সকাল করে। অন্যথায় অলস ও অপবিত্র মন নিয়ে তার দিনের সূচনা হয়।[৪৫৬]

২. ঘুম থেকে জাগ্রত হবার দুআ ও আমল করে ঘুমানো:

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল, আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সালাত পড়ার ইচ্ছা করি, কিন্তু প্রচণ্ড ঘুমের কারণে পারি না। তিনি বললেন, তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহফের শেষ দুটি

[৪৫৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৪২

আয়াত পড়ে ঘুমাবে। তুমি যখন ঘুম জেগে উঠার ইচ্ছা করবে, মহান আল্লাহ তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।[৪৫৭]

৩. এলার্ম সেট করে রাখুন:

বর্তমানে আমাদের দেশে উন্নতমানের এলার্ম ঘড়ি পাওয়া যায়। আপনি যদি এলার্ম ঘড়ি সেট করে রাখেন তাহলেও ঘুম থেকে সহজে উঠতে পারবেন। তবে খুব কাছে রাখবেন না। কারণ যখন আপনার এলার্ম ঘড়ি বাজতে থাকবে তখন ঘড়িটি কাছে থাকলে শয়তানের প্ররোচনায় তা হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে ফেলবেন। আর যদি একটু দূরে রাখেন তাহলে অসহনীয় বিরক্তির কারণে অবশ্যই ঘুম থেকে উঠে বন্ধ করতে চাইবেন। তখন উঠার কারণেই আপনার ঘুম কিছুটা হলেও দূর হবে। তখন আপনি ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর সুন্নাহ নির্দেশিত দুআ পড়লে আপনার আরও দূরে চলে যাবে। তখনই আপনি তাহাজ্জুদ সালাত পড়তে পারবেন।

সালাতুদ দোহা (চাশত ও ইশরাক)

কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:

ইশরাক-চাশত ফার্সী ভাষার দুটি শব্দ। আমাদের দেশে অনেকে ইশরাক বলতে সূর্যোদয়ের নামায আর চাশত বলতে সূর্যোদয়ের পরের নামাযকে বুঝে থাকেন। হাদীসে এই নামাযকে সালাতুদ দোহা বলা হয়েছে। এ ছাড়া হাদীসে ইশরাক ও চাশতের নামাযের সময়কে কোনো পার্থক্য করা হয় নি। সুতরাং সূর্যোদয়ের কিছু সময় পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নফল নামায সালাতুদ দোহা বলে গণ্য হবে। ইশরাক-চাশত বলার পরিবর্তে সালাতুদ দোহা বলা উত্তম এবং বরকতময়। কারণ সালাতুদ দোহা শব্দটি আল্লাহর হাবীব এবং আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত শব্দ। এমনিভাবে নামায, রোযা ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে সালাত, সাওম বলা উত্তম ও বরকতময়।

[৪৫৭] তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনূদিত: খণ্ড ৫, পৃষ্টা-৬৬০

সালাতের সময়:

সূর্য উদয়ের সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। সুতরাং সূর্য পরিপূর্ণ রূপে উদিত হওয়ার পর সালাতুদ দোহা আদায় করা যায়। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর এ সালাতের সময় শুরু হয়। এ সময় থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব (যোহরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ৪/৫ মিনিট আগ) পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই সালাত আদায় করা যায়। তবে ফজরের সালাত আদায় করে সালাতের স্থানে বসে থাকা উত্তম। তারপর সময় হলে সালাতুদ দোহা আদায় সবচেয়ে বরকত ও উত্তম আমল হিসেবে গণ্য হবে।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

সালাতুদ দোহা নামাযের রাকাত সংখ্যা হচ্ছে দুই রাকাত থেকে নিয়ে বার রাকাত পর্যন্ত। অন্যান্য নফল সালাতের মতো পড়তে হয়। দুই রাকাতের নিয়ত করে পড়া উত্তম। কোনো সূরা নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং যে কোনো সূরা দিয়ে এই সালাত পড়া যায়।

নবীজী কখনো চার রাকাত বা তার চেয়ে বেশিও পড়তেন:

সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে-

حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَمْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى قَالَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ

হযরত মুয়াযাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা রাদি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুদ দোহা কত রাকাত পড়তেন? তিনি বললেন, অধিকাংশ সময় চার রাকাত পড়তেন। তবে মাঝে-মধ্যে বেশিও পড়তেন।[৪৫৮]

[৪৫৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৬৯৬

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো দুই রাকাত পড়তেন:

তিরমিযির হাদীসে এসেছে-

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

হযরত আনাস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করার পর সূর্যোদয় (১২/১৩ মিনিট সময়) পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিকির করবে এবং এরপর দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরা পালনের সমান সওয়াব পাবে।[৪৫৯]

সালাতের গুরুত্ব:

১. সালাতুদ দোহা পরিত্যাগ না করার নির্দেশ:

হযরত আবু হুরাইরা রাদি. বলেন, আমার বন্ধু আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন; মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত আমি সেগুলো পরিত্যাগ করব না। তা হচ্ছে-

صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

ক. প্রতিমাসে তিন দিন সিয়াম (রোযা) পালন করা। খ. সালাতুদ দোহা (ইশরাক ও চাশতের নামায)। গ. সালাতুল বিত্‌র (বিত্‌রের নামায) আদায় করে ঘুমানো।[৪৬০]

২. সালাতুদ দোহা বিভিন্ন আমল ও বস্তুর সাদকা:

আবু যর গিফারী রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

[৪৫৯] তিরমিযি, হাদীস-৫৮৬

[৪৬০] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৭৮

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

প্রতি সকালে তোমাদের শরীরের প্রতি জোড়ার উপর সাদকা করা ওয়াজিব। সুবহানাল্লাহ বলা সাদকা। আল-হামদুলিল্লাহ বলা সাদকা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সাদকা। আল্লাহু আকবার বলা সাদকা। সৎ কাজের আদেশ করা সাদকা। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও সাদকা। আর দুই রাকাত সালাতুদ দোহা এ সব কিছুর সাদকা আদায়ের জন্য যথেষ্ট।[৪৬১]

৩. মৃত পিতা-মাতাকে পেলেও সালাতুদ দোহা ছাড়ব না:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি আট রাকাত সালাতুদ দোহা পড়তেন। এরপর তিনি বলতেন, যদি আমার পিতা-মাতাকে এ সময়ে আমার জন্যে জীবিত করে দেওয়া হয় তবুও আমি এই সালাতকে ছাড়ব না।[৪৬২]

সালাতুদ দোহার ফযিলত:

১. একটি হজ্জ ও একটি ওমরা পালনের সমান সওয়াব:

তিরমিযির হাদীসে হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

[৪৬১] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭০৪

[৪৬২] মুয়াত্তা মালিক, হাদীস-৫২০

হযরত আনাস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করার পর সূর্যোদয় (১২/১৩ মিনিট সময়) পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিকির করবে এবং এরপর দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরা পালনের সমান সওয়াব পাবে।[৪৬৩]

আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ

হযরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি ঘর থেকে উত্তমভাবে ওযূ করে বের হয়ে ফরয সালাতের জন্য মসজিদে গমন করে তার বিনিময় হলো ইহরাম বেঁধে হজ্জে গমন করার সমান সওয়াব। আর যে ব্যক্তি সালাতুদ দোহা আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয় তার বিনিময় হল ওমরা আদায় করার সমান সওয়াব।[৪৬৪]

২. দেহের ৩৬০ জোড়ার জন্য সদকাস্বরূপ:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ الله قَالَ النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ

আবু বুরাইদা রাদি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন: মানুষের দেহে ৩৬০ টি জোড়া

[৪৬৩] তিরমিযি, হাদীস-৫৮৬

[৪৬৪] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫৫৮

রয়েছে। প্রতিটি মানুষের উচিত প্রত্যেক জোড়ার পরিবর্তে কিছু সাদাকা করা। তখন সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন করতে কে সক্ষম হবে? তিনি বললেন: মসজিদ থেকে থুথু পরিষ্কার করা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া সাদকাস্বরূপ। আর যদি এমন করতে না পার তাহলে দুই রাকাত সালাতুদ দোহা আদায় করলে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[৪৬৫]

৩. সালাতুদ দোহা পড়লে সমূদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহও ক্ষমা হয়ে যায়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحَى لاَ يَقُولُ إِلاَّ خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ

হযরত সাহল ইবনে মুয়ায বিন আনাস রাদি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ফজরের সালাত শেষ করার পর সালাতুদ দোহা পর্যন্ত সালাতের স্থানে বসে থাকে এবং ভালো কথা ব্যতীত অন্য কোনো কথা না বলে, তার সকল (ছোট-খাট) গুনাহ ক্ষমা করা হবে। যদিও তা সমূদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হয়।[৪৬৬]

৪. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেও বেশি সওয়াব:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমির রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা খুব দ্রুত যুদ্ধলব্ধ অনেক মালামাল নিয়ে ফিরে এলেন। লোকজন খুশি হয়ে এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও নিকটবর্তী এবং বেশি সম্পদলাভ ও দ্রুত প্রত্যাবর্তনের অভিযানের কথা বলব না? (শোনো) যে

[৪৬৫] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৫২৪৪

[৪৬৬] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১২৮৯

ব্যক্তি ওযূ করল, এরপর সালাতুদ দোহা আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করল, সে ব্যক্তির অভিযান অধিকতর নিকটবর্তী, প্রাপ্ত সম্পদ অনেক বেশি এবং ফিরেও এলো তাড়াতাড়ি।[৪৬৭]

৫. মহান আল্লাহর তার দায়িত্ব বহন করবেন:

ওকবা ইবনে আমির রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন;

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ

হযরত আবু দারদা এবং আবু যার রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমভাগে চার রাকাত সালাত আমাকে প্রদান কর, দিনের শেষভাগ পর্যন্ত তোমার জন্য আমি যথেষ্ট থাকব।[৪৬৮]

৬. উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ওলী হওয়ার পথ:

আবু দারদা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى الضُّحى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كَفَى ذٰلِكَ الْيَوْمُ وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি দুই রাকাত সালাতুদ দোহা আদায় করবে সে অমনোযোগী বলে গণ্য হবে না। আর যে চার রাকাত আদায় করবে সে বেশি বেশি ইবাদতকারী বলে গণ্য হবে। আর যে ছয় রাকাত আদায় করবে ঐ দিন তার জন্য আর কিছু দরকার হবে না। আর যে ব্যক্তি আট রাকাত আদায়

[৪৬৭] মুসনাদে আহমদ

[৪৬৮] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৭৫

করবে তাকে আল্লাহ তায়ালা কানিতীন (উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ওলী) বান্দাদের মধ্যে লিখে নিবেন। আর যে ব্যক্তি ১২ রাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি বানিয়ে রাখবেন।[৪৬৯]

নোট: সকল সুন্নত সালাত (নামায) ঘরে আদায় করা উত্তম। তবে সালাতুদ দোহা ব্যতিক্রম, তা ঘরে আদায় করার চেয়ে মসজিদে আদায় করা বেশী উত্তম।

সালাতুল আওয়াবীনের আলোচনা

সালাতের সময়:

মাগরিবের পর থেকে ইশার ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত যে সালাত পড়া হয় তা সালাতুল আওয়াবীন বলে গণ্য হবে। অনেকে মনে করেন, মাগরিবের সালাতের পরপরই এই সালাত পড়তে হয়, আধা ঘন্টা দেরী হলে পড়া যায় না। তাদের এমন ধারণা মোটেও ঠিক নয়। আমরা একটু পরই সাহাবি হযরত আনাস রাদি. এর বক্তব্য থেকে জানতে পারব যে, সাহাবায়ে কিরাম ইশার সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সালাত পড়তেন। সুতরাং মাগরিবের পর থেকে ইশা পর্যন্ত সময়ে এই সালাত পড়া যায়। এই সময়ের মধ্যে যে কোনো নফল সালাত পড়া হবে তা সালাতুল আওয়াবীন বলে গণ্য হবে।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ صَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ

যে ব্যক্তি মাগরিবের (ফরয সালাত আদায়ের) পর থেকে ইশার সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করবে তা সালাতুল আওয়াবীন বলে গণ্য হবে।[৪৭০]

[৪৬৯] মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদীস-৩৪১৯

[৪৭০] কানযুল উম্মাল, হাদীস-১৯৪২৯

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

সালাতুল আওয়াবীন এর রাকাত সংখ্যার ব্যপারে কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায়। সবগুলো বিবরণকে সামনে রাখলে একথা বুঝা যায় যে, সালাতুল আওয়াবীন দুই রাকাত থেকে যত রাকাত পড়া সম্ভব হয় তত রাকাত পড়া যাবে। তিরমিযির হাদীস থেকে জানা যায় যে আওয়াবীন সর্বোচ্চ বিশ রাকাত। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত সালাতুল আওয়াবীন ছয় রাকাত পড়তেন।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْتُ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةٍ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মাগরিবের (ফরয এবং সুন্নাত সালাতের) পর অহেতুক কথাবার্তা না বলে ছয় রাকাত সালাত আদায় করবে তার জন্য **১২** বছর নফল ইবাদত করার সময় সওয়াব দেওয়া হবে।[৪৭১]

সালাতের গুরুত্ব:

মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টি অতি মূল্যবান। তাই এ সময় কিছু সালাত আদায় করা উচিত অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এই সময়ে সালাত আদায়কারীর প্রশংসা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। বলা হয়েছে-

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

রাতের বেলায় তাদের পাজর বিছানা থেকে আলাদা থাকে (তারা সালাত আদায় করে)। তারা প্রতিপালককে ভয় ও আশার সাথে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎ কাজে) ব্যয় করে।[৪৭২]

[৪৭১] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৩৫

[৪৭২] সূরা সাজদা, আয়াত-১৬

উল্লেখিত আয়াতটির চারটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর প্রথম ব্যাখ্যা হলো এই আয়াতে রাতের বেলায় সালাত আদায়কারী বলতে তাহাজ্জুদ আদায়কারীকে বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, এই আয়াতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত আদায়কারীকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি করেছেন হযরত আনাস রাদি.।

তিনি বলেন-

والثاني: أنها نزلت في ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. قاله انس بن مالك. (زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزي)

এই আয়াত ওই সব সাহাবি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা মাগরিব থেকে ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত পড়তেন।

সালাতের ফযিলত:

১. সালাতুল আওয়াবীন পড়লে চোখ জোড়ানো সামগ্রী বরাদ্ধ:

সূরা সাজদার ষোল নাম্বার আয়াতটির চারটি ব্যাখ্যা থেকে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সাহাবি হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাই তার ব্যাখ্যা মতে উল্লেখিত আয়াতের পরের আয়াতে যে ফযিলত বলা হয়েছে সে ফযিলত তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা ওই সময়ে সালাত আদায় করবে। পরের আয়াতটিতে সালাত আদায়কারীদের ফযিলত এভাবে বলা হয়েছে-

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

কোনো ব্যক্তি জানে না, এমন লোকদের জন্য তাদের কর্মফল হিসেবে চোখ জোড়ানো কত কিছু উপকরণ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[৪৭৩]

২. বার বছর নফল ইবাদত করার সমান সওয়াব অর্জন:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْتُ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةٍ

[৪৭৩] সূরা সাজদা, আয়াত-১৭

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মাগরিবের (ফরয এবং সুন্নাত সালাতের) পর অহেতুক কথাবার্তা না বলে ছয় রাকাত সালাত আদায় করবে তার জন্য **১২** বছর নফল ইবাদত করার সময় সওয়াব দেওয়া হবে।[৪৭৪]

৩. সালাতুল আওয়াবীনকে ইল্লিয়্যিনে উঠানো হয়:

হাদীসে এসেছে-

وَعَنْ مَكْحُوْلٍ يَبْلُغُ بِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ رُفِعَتْ صَلَاتُه فِيْ عِلِّيِّيْنَ

হযরত মাকহুল রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মাগরিবের (ফরয এবং সুন্নাত সালাতের) পর পার্থিব কথাবার্তা না বলে দুই রাকাত সালাতুল আওয়াবীন পড়বে তার সালাতকে ইল্লিয়্যিনে উঠানো হবে। কোনো বর্ণনায় চার রাকাতের কথা উল্লেখ আছে।[৪৭৫]

৪. যে সালাতুল আওয়াবীন পড়বে তার জন্য জান্নাতে বাড়ী বরাদ্ধ:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাত (নফল) সালাত আদায় করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ী নির্মাণ করবেন।[৪৭৬]

---

[৪৭৪] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৩৫

[৪৭৫] মিশকাত, হাদীস-১১৮৪

[৪৭৬] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৩৫

তাহিয়্যাতুল ওযূ

তাহিয়্যাতুল ওযূর পরিচয় ও বিধান:

তাহিয়্যাতুল ওযূ হচ্ছে কারো সাথে কথা না বলে ওযূর অঙ্গসমূহ শুকানোর পূর্বে দুই রাকাত সালাত আদায় করা। ইসলামি পরিভাষায় এই সালাতকে তাহিয়্যাতুল ওযূ বলা হয়। তাহিয়্যাতুল ওযূ একটি মুস্তাহাব আমল। এর অনেক ফযিলত রয়েছে। পড়লে অনেক সওয়াব। না পড়লে কোনো গুনাহ নেই।

তাহিয়্যাতুল ওযূর সময়:

তাহিয়্যাতুল ওযূ যে কোনো সময় পড়া যায়। তবে সালাত আদায়ের তিনটি নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত। সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ কিছু সময় রয়েছে। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয, ওয়াজিব এবং নফলসহ কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়। সালাতুল ফজরের সময় ফজরের সুন্নাত এবং ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত পড়া মাকরূহ। সুতরাং ফজরের সময়েও তাহিয়্যাতুল ওযূ পড়া ঠিক নয়।[৪৭৭] তিনটি নিষিদ্ধ সময়ের কথা অন্যান্য আলোচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়্যত:

সালাতের নিয়্যত সম্পর্কে আমাদের বইয়ের মধ্যে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়ম:

তাহিয়্যাতুল ওযূ অন্যান্য নফল সালাত পড়ার নিয়মেই পড়তে হয়। আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন এই সালাত পড়তে অমুক সূরা এতবার আর অমুক

---

[৪৭৭] আহসানুল ফাতাওয়া- ৩/৪৮১

সূরা এতবার পড়তে হয়। আসলে কুরআন-হাদীসে এসব নেই। আমরা নফল সালাতের নিয়ম সম্পর্কে বিভিন্ন সালাতের শিরোনামে আলোচনা করেছি। সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

তাহিয়্যাতুল ওযূর ফযিলত:

১. তাহিয়্যাতুল ওযূর দ্বারা সকল ছগীরা গুনাহ ক্ষমা করা হয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদি.-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি দেখলেন ওসমান রাদি. কারো মাধ্যমে ওযূর জন্য পানি সংগ্রহ করালেন। এরপর তিনি সে পাত্র থেকে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর তাঁর ডান হাত পানিতে প্রবেশ করালেন। কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করলেন। এরপর সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করলেন। এরপর প্রত্যেক পা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর বললেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, আমি এখন যেভাবে ওযূ করেছি তিনি সেভাবে ওযূ করেছেন এবং তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করে একাগ্রতার সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, মহান আল্লাহ তাঁর অতীতের সকল ছগীরা (ছোট-খাট) গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[৪৭৮]

[৪৭৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৬৪

২. তাহিয়্যাতুল ওযূর আমলে জান্নাতে হযরত বিলালের জুতার আওয়াজ শুনতে পাওয়া:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাতের সময় হযরত বিলাল রাদি.-কে বললেন, হে বিলাল! তুমি ইসলাম গ্রহণ করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে আমল করেছ সে আমলের কথা আমাকে বলো। কেননা, আমি (মিরাজের রজনীতে) জান্নাতে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। তখন হযরত বিলাল রাদি. বললেন, দিনে বা রাত্রে যখনই আমি পবিত্রতা অর্জন করি, তখনই আমি সামর্থ অনুযায়ী দুই রাকাত সালাত আদায় করি।[৪৭৯]

৩. তাহিয়্যাতুল ওযূ জান্নাতের ব্যবস্থা:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

হযরত ওকবা ইবনে আমির রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোনো মুসলমান উত্তমভাবে ওযূ করে মনোযোগ দিয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।[৪৮০]

[৪৭৯] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৪৯

[৪৮০] আবু দাউদ, হাদীস-৯০৬

৪. তাহিয়্যাতুল ওযূ মানুষকে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় বানিয়ে দেয়:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ إِلَّا
انْفَتَلَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ

হযরত ওকবা ইবনে আমের রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোনো মুসলিম পূর্ণভাবে ওযূ করে দুই রাকাত সালাত এমনভাবে আদায় করে যে, যা সে পড়ছে তা সে জানে, তাহলে সে সদ্য ভূমি শিশুর ন্যায় হয়ে যায়। তার কোনো গুনাহ অবিশিষ্ট থাকে না।[৪৮১]

তাহিয়্যাতুল মসজিদ

তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর পরিচয় ও সময়:

তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হল, মসজিদের সম্মান। ইসলামি পরিভাষায় তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয় এমন সালাতকে যা মসজিদে প্রবেশ করার পর আদায় করতে হয়। এই সালাতকে আমাদের দেশে অনেকে 'দুখুলুল মসজিদ' বলে। একই সালাতের দুটি নাম। একজন মুমিন যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই দুই রাকাত সালাত আদায় করা তার জন্য সুন্নাত। তবে এই সুন্নাত অত্যাবশ্যক নয়। কিন্তু প্রতিদিন একবার তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যা অত্যাবশ্যক।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ যে কোনো সময়ে মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই পড়বে। তবে সালাত আদায়ের তিনটি নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয, ওয়াজিব এবং নফলসহ কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়, এবং সালাতুল ফজরের সময় ফজরের সুন্নাত এবং ফরয সালাত

[৪৮১] আল-মুসতাদরাকু আলাস সাহীহাইন, হাদীস-৩৫০৮

ব্যতীত অন্য কোনো সালাত পড়া মাকরূহ। ফজরের সময়েও তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া মাকরূহ। এমনিভাবে সালাত আদায়ের মাকরূহ সময়েও তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে না।

সালাতের নিয়্যত:

সালাতের নিয়্যত সম্পর্কে আমাদের বইয়ের মধ্যে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সালাতের নিয়ম:

তাহিয়্যাতুল মসজিদ অন্যান্য নফল সালাত পড়ার নিয়মেই পড়তে হয়। আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন এই সালাত পড়তে অমুক সূরা এতবার আর অমুক সূরা এতবার পড়তে হয়। আসলে কুরআন-হাদীসে এসব নেই। এই সালাত নফল। আমরা নফল সালাতের নিয়ম সম্পর্কে বিভিন্ন সালাতের শিরোনামে আলোচনা করেছি। সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর রাকাত সংখ্যা:

তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুই রাকাত। প্রতিদিন কতবার পড়তে হবে তা নির্ধারিত নয়। কারণ মুমিন যতবার মসজিদে প্রবেশ করবে ততবার এই সালাত আদায় করবে। অনেকে মনে করে যে, শুধু পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে হয়। তাদের ধারণা সঠিক নয়। বরং যতবার মসজিদে প্রবেশ করবে ততবার এই সালাত পড়বে। তবে প্রতিদিন একবার তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যা অত্যাবশ্যক।[৪৮২]

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ
الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

[৪৮২] আহসানুল ফাতাওয়া- ৩/৪৮৩

হযরত কাতাদা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসার পূর্বেই দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।[৪৮৩]

আমরা উল্লেখিত হাদীসটিতে একটু লক্ষ্য করলে খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, শুধু পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের সময় মসজিদে প্রবেশ করলেই তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে হবে এমন নয়। বরং মুমিন যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে। কারণ হাদীসটিতে বলা হয়েছে যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসার পূর্বেই দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়। উল্লেখিত হাদীসটিতে এ সালাতের রাকাত সংখ্যাও বলা হয়েছে। যা একবার প্রবেশের পর দুইয়ের অধিক নয়।

সালাতের গুরুত্ব:

তাহিয়্যাতুল মসজিদ এর গুরুত্ব অনেক। আমরা হাদীস থেকে এর গুরুত্ব বুঝতে পারি।

আবু কাতাদা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে নিয়ে বসা ছিলেন। তখন আমিও (আবু কাতাদা) বসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, বসার পূর্বে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে কে তোমাকে বারণ করেছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে বসা দেখেছি। লোকজনকেও

[৪৮৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৪৪

বসা দেখেছি। (এজন্য আমি বসেছি)। তখন তিনি বললেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করার পূর্বে না বসে।[৪৮৪]

তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর ফযিলত:

তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাত। সুন্নাতের সওয়াব বা ফযিলত বলার অপেক্ষা রাখে না। সুন্নাত পালনের অনেক সওয়াব ও ফযিলত রয়েছে। অন্যান্য পুস্তক থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর বিধান বা হুকুম:

একজন মুমিন যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই দুই রাকাত সালাত আদায় করা তার জন্য সুন্নাত। তবে এই সুন্নাত অত্যাবশ্যক নয়। কিন্তু প্রতিদিন একবার তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যা অত্যাবশ্যক।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

হযরত কাতাদা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসার পূর্বেই দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।[৪৮৫]

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: আমরা তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর আলোচনাতে যে সব হাদীস উল্লেখ করেছি সবগুলো হাদীসে একথা বলা হয়েছে বসার পূর্বে সালাত আদায় করা। এখন প্রশ্ন হল, মসজিদে প্রবেশ করে বসার পরও কেউ সালাত

[৪৮৪] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৬৮৮

[৪৮৫] সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৪৪

আদায় করলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হবে কিনা এবং সওয়াব হবে কিনা?

উত্তর: মসজিদে প্রবেশ করে বসার পরও কেউ সালাত আদায় করলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হবে তবে সওয়াব কম হবে। এজন্য উত্তম হল, বসার পূর্বে সালাত আদায় করা। তাহলে সওয়াব বেশি হবে।[৪৮৬]

সালাতুয যাওয়াল

সালাতের পরিচয় ও কিছু কথা:

আমাদের কাছে নতুন মনে হলেও ইসলামে এই সালাত নতুন কিছু নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মধ্যে এই সালাত আদায় করতেন।

সালাতের সময়:

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে যোহরের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়টি হচ্ছে সালাতুয যাওয়ালের সময়। আমাদের দেশে সালাত ও সিয়ামের সময় নির্দেশক অনেক ক্যালেন্ডার রয়েছে। কোন কোন ক্যালেন্ডারের মধ্যে দুপুরের যে সময়টাতে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ তা উল্লেখ করা থাকে। সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময়ের পরিমান সাধারণত তিন থেকে পাঁচ মিনিট। এই নিষিদ্ধ সময়ের পর থেকে যোহরের সালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়টা হলো সালাতুয যাওয়ালের সময়।

সালাতুয যাওয়ালের রাকাত সংখ্যা:

সালাতুয যাওয়াল সম্পর্কিত হাদীস সমূহ সামনে রাখলে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাওয়ালের সময় চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। আবার কোন কোন হাদীস থেকে দুই রাকাতের কথাও জানা যায়। তবে চার রাকাত আদায় করা উত্তম।

[৪৮৬] আহসানুল ফাতাওয়া- ৩/৪৮২ আহসানুল ফাতাওয়া- ৩/৪৮২

সালাতুয যাওয়ালের নিয়ত:

আরবিতে নিয়ত করা জরুরী নয়। যে কোনো ভাষায় নিয়ত করা যায়। বাংলাতেও নিয়ত করা যায়। যেমন- আমি চার রাকাত সালাতুয যাওয়ালের নিয়ত করলাম আল্লাহু আক্‌বার। তবে নিয়ত মুখে বলতে হয় না। মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেই হবে।

প্রিয় পাঠক! আমরা সকল সালাতের নিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সূচী থেকে সালাতের নিয়ত সম্পর্কিত শিরোনামের আলোচনা দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

সালাতুয যাওয়াল আদায়ের নিয়ম:

এই সালাত আদায়ের জন্য আলাদা কোন নিয়ম নেই। আমরা চার রাকাত সুন্নত সালাত যেভাবে আদায় করে থাকি সেভাবে আদায় করলেই চলবে। পার্থক্য হবে শুধু নিয়তের মধ্যে। আর কোনো পার্থক্য নেই। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সূরা নেই।

প্রিয় পাঠক! আমরা সকল সালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে 'সালাত আদায়ের পদ্ধতি' শিরোনামে এই বইয়ের মধ্যে আলোচনা করেছি। সূচী থেকে সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কিত শিরোনামের আলোচনা দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

সালাতুয যাওয়ালের গুরুত্ব:

সালাতুয যাওয়ালের গুরুত্ব অনেক। হাদীসের মধ্যে এই সালাতের কথা উল্লেখ হয়েছে। যে সালাতের আলোচনা হাদীসে এসেছে, সে সালাতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আর তেমন কিছুর প্রয়োজন হয় না।

হাদীসে এসেছে-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب الأَنْصَارِيِّ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ

হযরত বারা ইবনে আযিব রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ১৮ টি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। আমি তাকে দেখেছি যে, তিনি সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর এবং যোহরের পূর্বে দুই রাকাত সালাত কখনো ছেড়ে দেন নি।[৪৮৭]

সালাতুয যাওয়ালের ফযিলত:

সালাতুয যাওয়ালের অনেক ফযিলত রয়েছে। আমরা হাদীসের আলোকে কয়েকটি ফযিলত তুলে ধরছি।

১। আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ انَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর এবং যোহরের (সালাতের) পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। আর বলতেন এটা এমন সময়ে আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। আমি পছন্দ করি যে, এই সময়ে একটি নেক আমল উঠুক।[৪৮৮]

২। সালাতুয যাওয়াল শেষ রাতের সালাতের সমতুল্য:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أربعٌ قبلَ الظهرِ بعدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ من صلاةِ السَّحَرِ وليْسَ منْ شيء إلا وهو يُسَبِّحُ اللهَ تلك الساعة

[৪৮৭] আবু দাউদ, হাদীস-১২২৪

[৪৮৮] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস- ৪৭৮

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর এবং যোহরের (সালাতের) পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করা শেষ রাতের সালাতের (তাহাজ্জুদের) সমতুল্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, এমন কোন জিনিস নেই যা এই সময়ে মহান আল্লাহ্ তাআলার তাসবীহ পড়ে না।[৪৮৯]

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: হাদীস থেকে সালাতুয যাওয়ালের ফযিলত জেনেছি। আমল করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্। তবে যদি এই আমলটি করতে না পারি তাহলে কোনো গোনাহ হবে কী?

উত্তর: এই আমলটি একটি ঐচ্ছিক আমল। অর্থাৎ নফল আমল। করলে সওয়াব আছে। না করলে কোনো গোনাহ হবে না। তবে সব সময় করতে না পারলেও মাঝে মধ্যে করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। নতুবা সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

সালাতুস শোকর বা কৃতজ্ঞতার সালাত

সালাতুস শোকর ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:

ভালো-মন্দ সফলতা-ব্যর্থতা, কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুর মালিক মহান আল্লাহ। কোনো ব্যক্তি মন্দ, ব্যর্থতা এবং অকল্যাণের সম্মুখীন হলে তার জন্য উচিত মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় গ্রহণ করা। এসব থেকে পরিত্রানের জন্য দুআ করা। আর যদি কোনো ব্যক্তি ভালো, সফলতা এবং কল্যাণকর কোনো কিছু লাভ করে তার জন্য উচিত মহান আল্লাহ্র নিকট শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায় করার অন্যতম পদ্ধতি দুটি। একটি হচ্ছে সালাত আদায় করা। অপরটি হচ্ছে আলহামদু লিল্লাহ্ বলা। শোকরিয়া বা

[৪৮৯] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস- ৩১২৮

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যে সালাত আদায় করা হয় তাকে ইসলামের পরিভাষায় সালাতুস শোকর বলা হয়। কৃজ্ঞতা আদায়ের জন্য এটি সর্বোত্তম পদ্ধতি।

সালাতের সময়:

সালাতুস শোকর যে কোনো সময় পড়া যায়। তবে সালাত আদায়ের তিনটি নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত। সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ কিছু সময় রয়েছে। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয, ওয়াজিব এবং নফলসহ কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়। সালাতের নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য যে কোনো সময় এই সালাত পড়া যায়। সালাত আদায়ের মাকরূহ সময়ের মধ্যেও সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিষিদ্ধ সময় হচ্ছে তিনটি।

১. সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। এর আনুমানিক সময় হলো ১২/১৩ মিনিট।

২. সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩. সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো দুই রাকাত পড়েছেন। আবার কখোনো দুই রাকাতের অধিকও পড়েছেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য আট রাকাত সালাত আদায় করেছেন। তবে এ বিষয়ের হাদীসগুলোকে সামনে রাখলে একথা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত সালাতুস শোকর দুই রাকাত আদায় করতেন। দুই রাকাত এবং আট রাকাত সম্পর্কে দুটি হাদীস উল্লেখ করছি।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

اشْتَرَى مِنِّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِى أَنْ آتِىَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছ থেকে একটি উট ক্রয় করলেন। তিনি যখন মদীনায় এলেন, তখন তিনি আমাকে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।[৪৯০]

আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তার ঘরে প্রবেশ করলেন। গোসল করলেন। তারপর তিনি ৮ রাকাত সালাত আদায় করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি তাঁকে এর চেয়ে সংক্ষেপে সালাত আদায় করতে দেখি নি। তবে তিনি রুকু-সাজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন।[৪৯১]

সালাতুস শোকর এর নিয়ত:

সালাতের নিয়ত সম্পর্কে আমাদের বইয়ের মধ্যে আলাদা শিরোনামে বিস্তারীত আলোচনা করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সালাতের নিয়ম:

সালাতুস শোকর অন্যান্য নফল সালাত পড়ার নিয়মেই পড়তে হয়। এর জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই। আমরা নফল সালাতের নিয়ম সম্পর্কে বিভিন্ন সালাতের শিরোনামে আলোচনা করেছি সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সালাতের গুরুত্ব:

হাদীস থেকে জানা যায় যে, সালাতুস শোকরের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। হযরত আবু বাকরা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

---

[৪৯০] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১৬৯০

[৪৯১] সহীহ্ বুখারী, হাদীস- ১১৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১৭০০

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَا نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ ثَلاَثًا قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الآخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বের হয়েছি। ইচ্ছা করেছি মক্কা থেকে মদিনায় যাবো। আমরা আযুরা নামক স্থানে পৌঁছলাম। তখন তিনি অবতরন করলেন। দুই হাত তুলে প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত দুআ করলেন। তারপর সাজদাহ্ করলেন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। এরপর দাড়ালেন। আবারও হাত তুলে প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত দুআ করলেন, এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সাজদাহ্ করলেন। তারপর আবারও এরকম করলেন। এরপর তিনি বললেন; আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি। আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করেছি। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমার উম্মতের এক তৃতীয়াংশের জন্য সুপারিশ কবুল করেছেন। আমি শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য সাজদাহ্ বা দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি। তারপর সালাত থেকে অবসর হয়ে আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করেছি এবং আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করেছি। তখন তিনি উম্মতের আরও এক তৃতীয়াংশের জন্য সুপারিশ কবুল করেছেন। আমি তখনও শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য সাজদাহ বা দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি। তারপর সালাত শেষ করে পূর্বের ন্যায় আবারও প্রভুর নিকট প্রার্থনা করেছি। তখন তিনি আমার উম্মতের অবশি তৃতীয়াশের জন্যও সুপারিশ কবুল করেছেন। আমি তখনও শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য সালাত আদায় করেছি।[৪৯২]

[৪৯২] আবু-দাউদ, হাদীস- ২৭৭৭

সালাতুস শোকরের ফযিলত:

সালাতুস শোকরের ফযিলত অনেক। কুরআনে শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে বলা হয়েছে। কৃতজ্ঞতা আদায়ের দুটি পদ্ধতির মধ্যে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে সালাতের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা আদায় করা। যদি কোনো ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা আদায় করে তাহলে তাকে নিয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

যদি শোকরিয়া আদায় কর তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেবো। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহলে (যেনে রেখো) আমার শাস্তি অনেক কঠিন।[৪৯৩]

সালাতুল ইস্তিখারা

সালাতুল ইস্তিখারার পরিচয় ও প্রেক্ষাপট:

ইসলামে যে সব কাজ জায়েয করা হয়েছে সে সব কাজ করার পূর্বে অন্যান্য সাধারণ সালাতের নিয়মে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। এরপর দুআ করবে। সাধারণত যখন কোনো কাজের ব্যপারে সংশয় দেখা দেয়, যেমন সে ব্যবসা করবে নাকি চাকুরী করবে? দুটি ব্যবসা থেকে কোন ব্যবসা করবে? এই মেয়েকে বিয়ে করবে না সেই মেয়েকে বিয়ে করবে? বিদেশ যাবে নাকি দেশেই কর্ম করবে? এই জাতীয় আরও অনেক বিষয় রয়েছে। যেগুলোর ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতে হয়। তখন দুই রাকাত সালাত আদায় করে সালাত শেষে নির্ধারীত দুআ পড়তে হয়। দুআর বরকতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরের মধ্যে কল্যাণকর সিদ্ধান্তকে স্থীর করে দেবেন। এই পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নাম সালাতুল ইস্তিখারা।

[৪৯৩] সূরা ইবরাহীম, আয়াত- ৭

এখানে একটি বিষয় ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে- কোনো ধরণের হারাম কিংবা অন্যায় ও অবৈধ কাজের জন্য উল্লেখিত পদ্ধতিতে সালাত পড়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। কারণ হারাম কিংবা অন্যায় ও অবৈধ কাজের জন্য ইস্তিখারা করা হারাম।

সালাতের সময়:

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে দুই রাকাত নফল সালাত পড়ে ইস্তিখারার দুআ পড়া। ইনশাআল্লাহ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হবে। এই সালাত যে কোনো সময় পড়া যায়। তবে সালাত আদায়ের তিনটি নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত। সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ কিছু সময় রয়েছে। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয সালাত, ওয়াজিব এবং নফলসহ কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়। নিষিদ্ধ সময় হচ্ছে তিনটি।

১. সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। এর আনুমানিক সময় হলো ১২/১৩ মিনিট।

২. সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩. সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

ইস্তিখারার সালাত দুই রাকাত।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

হযরত জাবির রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমনভাবে ইস্তিখারার সালাত শেখাতেন যেভাবে কুরআনের কোনো সূরা শেখাতেন। তিনি প্রতি বিষয়ে ইস্তিখারা

করার জন্য বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করে তখন সে যেন দুই রাকাত সালাত পড়ে।[৪৯৪]

সালাতের গুরুত্ব:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে এই সালাত শিক্ষা দিয়েছেন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

হযরত জাবির রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমনভাবে ইস্তিখারার সালাত শেখাতেন যেভাবে কুরআনের কোনো সূরা শেখাতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করে তখন যেন দুই রাকাত সালাত পড়ে।[৪৯৫]

সালাতের নিয়ম ও দুআ:

সালাতুল ইস্তিখারা হলো, ইসলামে যে সব কাজ জায়েয করা হয়েছে সে সব কাজ করার পূর্বে অন্যান্য সাধারণ সালাতের নিয়মে দুই রাকাত সালাত আদায় করা। এর জন্য বিশেষ কোনো সূরা বা কিরাত পড়তে হয় না। আমাদের দেশে অনেকে মনে করে সালাতুল ইস্তিখারা করতে হয় রাত্রে। তারা এটাও মনে করে যে ইস্তিখারার পর দুআ পাঠ করে আর কারও সাথে কথা বলা যাবে না। দুআ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। তাদের ধারাণা একেবারেই ভুল। কারণ ইস্তিখারার সালাতের জন্য ঘুমানো শর্ত নয়। কথা বলা বন্ধ করাও শর্ত নয়। তবে সব সময় কথা কম বলা ভালো। তবে সালাত শেষে হাদীসে বর্ণিত এই দুআটি পড়লেই চলবে।

---

[৪৯৪] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৬২

[৪৯৫] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৬২

দুআটি হচ্ছে এই-

اللّٰهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللّٰهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণকর বিষয় লাভ করতে চাই। আর সে বিষয়ে সমর্থ হতে চাই আপনার শক্তিতে। আমি প্রত্যাশা করি আপনার মহা অনুগ্রহের কিছু অংশ। কেননা, আপনি শক্তিমান, আমি অক্ষম। আপনি জ্ঞানী, আমি জ্ঞানশূন্য। আপনার কাছে সকল অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে। ইয়া আল্লাহ! যদি এ কাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করুন। আর তা সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সহজ করুন। অত:পর তা আমার জন্য বরকতময় করুন। আর যদি এ কাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য এবং পরিণামের দিক থেকে ক্ষতিকর হয় তবে তার ও আমার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করুন। অত:পর আমার হৃদয়ে প্রশান্তি দান করুন।[৪৯৬]

এই দুআতে هَذَا الْأَمْرَ শব্দ বলার সময় সে কাজের কথা বলাা কিংবা মনে মনে সে কাজের দিকে ইঙ্গিত করা।

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: কতদিন পর্যন্ত ইস্তিখারার সালাত পড়তে হবে?

উত্তর: নিয়ম হলো সংশয় নিরসন হবার পূর্ব পর্যন্ত সালাত অব্যাহত রাখা ভালো। আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি ফলাফল পাওয়া যাবে। যদি

[৪৯৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৬২

তাড়াতাড়ি ফলাফল পাওয়া না যায়, তবে তিনদিন বা সাতদিন পর্যন্ত সালাতুল ইস্তিখারা আদায় করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: আমি ইস্তিখারার সালাত আদায় করার পর কীভাবে বুঝতে পারব কোন কাজটি আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে?

উত্তর: ইস্তিখারার সালাত আদায় করতে থাকলে আপনার মনের মধ্যে এই ধরণের ধারণা সৃষ্টি হবে। আপনার সামনে যে বিষয়গুলো থাকবে এর মধ্যে কোন একটি বিষয়ের প্রতি আপনার অন্তর ধাবিত হবে। তখন বুঝে নিতে হবে যে এই বিষয়টি আপনার জন্য মঙ্গল। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: আমি সালাতুল ইস্তিখারা পড়লে স্বপ্নে কিছু দেখতে পারব কী? কিছু স্বপ্নে দেখা কী অত্যাবশ্যক?

উত্তর: আপনি সালাতুল ইস্তিখারা পড়লে স্বপ্নে কিছু দেখা অত্যাবশ্যক নয়। কিছু দেখা বা না দেখার সাথে সালাতুল ইস্তিখারার কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং সালাতুল ইস্তিখারা করলে স্বপ্নে দেখা অত্যাবশ্যক নয়। যারা মনে করে সালাতুল ইস্তিখারা পড়লে অবশ্যই স্বপ্নে দেখবে এবং দেখা অত্যাবশ্যক তাদের কথা সঠিক নয়।

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহর পরিচয় ও প্রেক্ষাপট:

ইসলামি পরিভাষায় সালাতুত তাসবীহ বলা হয়, যে চার রাকাত সালাতের মধ্যে তিনশত বার সুনির্দিষ্ট তাসবীহ পাঠ করা হয়। আমাদের জীবনের ভুলত্রুটি মুছে জীবনকে নতুন করে সাজাতে এই সালাতের গুরুত্ব অনেক। জীবনকে গুনাহমুক্ত রাখা হল এই সালাতের প্রেক্ষাপট।

সালাতের সময়:

সালাতুত তাসবীহ্ যে কোনো সময় পড়া যায়। তবে সালাত আদায়ের তিনটি নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত। সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ কিছু সময় রয়েছে। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয, ওয়াজিব এবং নফলসহ কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়। নিষিদ্ধ সময় হচ্ছে তিনটি।

১. সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। এর আনুমানিক সময় হলো ১২/১৩ মিনিট।

২. সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত। সাধারণত এই সময়টার পরিমাণ হল ৪/৫ মিনিট মাত্র।

৩. সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

সালাতুত তাসবীহর বিধান বা হুকুম:

সালাতুত তাসবীহ্ পড়া ফরয বা ওয়াজিব নয়। এই সালাত নফল। সুতরাং সালাতুত তাসবীহ্ পড়লে সওয়াব আছে। না পড়লে গুনাহ নেই। সুযোগ থাকলে প্রদিদিন বা প্রতি সাপ্তাহে কিংবা মাসে একবার পড়া উচিত। তাও সম্ভব না হলে বছরে একাবার হলেও পড়া উচিত। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে জীবনে একবার হলেও তা পড়া উচিত।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

এই সালাতের রাকাত সংখ্যা হচ্ছে চার। এই চার রাকাত সালাত যদি প্রতিদিন পড়তে পারেন তাহলে খুব ভালো। আর সম্ভব না হলে প্রতি শুক্রবারে একবার পড়ুন। তাও সম্ভব না হলে প্রতি মাসে একবার, তাও সম্ভব না হলে বছরে একবার, আর তাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার হলেও পড়ুন।[৪৯৭]

[৪৯৭] আবু দাউদ, হাদীস-১২৯৯

সালাতের নিয়্যত:

সালাতের নিয়্যত সম্পর্কে আমাদের বইয়ের মধ্যে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সালাতের গুরুত্ব:

হাদীসে এসেছে-

إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً

এই চার রাকাত সালাত যদি প্রতিদিন পড়তে পারেন তাহলে খুব ভালো। আর সম্ভব না হলে প্রতি শুক্রবারে একবার পড়ুন। তাও সম্ভব না হলে প্রতি মাসে একবার, তাও সম্ভব না হলে বছরে একবার, আর তাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার হলেও পড়ুন।[৪৯৮]

সালাতের ফযিলত:

হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ الله لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস রাদি. -কে লক্ষ্য করে বললেন, চাচা! আমি

[৪৯৮] আবু দাউদ, হাদীস-১২৯৯

কি আপনাকে একটি হাদিয়া দিব না? আমি কি আপনাকে একটি উপহার দিব না? আমি কি আপনাকে এমন দশটি কথা বলে দিব না, যা পালন করলে আপনার দশটি লাভ হবে।

১. মহান আল্লাহ আপনার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

২. মহান আল্লাহ আপনার ভবিষ্যতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

৩. মহান আল্লাহ আপনার পুরাতন গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

৪. মহান আল্লাহ আপনার নতুন গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

৫. মহান আল্লাহ আপনার জানা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

৬. মহান আল্লাহ আপনার অজানা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

৭. মহান আল্লাহ আপনার ছোট গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

৮. মহান আল্লাহ আপনার বড় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

৯. মহান আল্লাহ আপনার গোপনীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

১০. মহান আল্লাহ আপনার প্রকাশ্য গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[৪৯৯]

সালাতের নিয়মঃ

সেই দশটি কথা (সালাতুত তাসবীহ সম্পর্কিত সকল কথা) এই যে, অর্থাৎ সালাতুত তাসবীহর নিয়ম হল এই-

أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ

[৪৯৯] আবু দাউদ, হাদীস-১২৯৯

আপনি চার রাকাত সালাত পড়বেন। প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোন সূরা পড়বেন। (এর জন্য আলাদা কোনো সূরা নেই।) সালাতুত তাসবীহ-এর নিয়ম হল প্রথম রাকআতে কিরাআতের পর পনের বার পড়বেন-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

এরপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ পাঠ করার পর দশ বার। রুকু থেকে উঠার পর দাঁড়ানো অবস্থায় দশ বার। সাজদায় গিয়ে সাজদাহর তাসবীহ পাঠ করার পর দশ বার। দুই সাজদার মাঝখানে বসে দশ বার। দ্বিতীয় সাজদায় গিয়ে সাজদাহর তাসবীহ পাঠ করার পর দশ বার এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে দশ বার পড়বেন। প্রতি রাকআতে (উপরোক্ত তাসবীহ) সর্বমোট ৭৫ বার পড়া হবে। এভাবে চার রাকাত পূর্ণ করবেন। এভাবে চার রাকাত সালাতের মধ্যে ৩০০ বার তাসবীহ পাঠ করা হবে।[৫০০]

এই সালাতে এতো তাসবীহ পাঠ করা হয় বলে এই সালাতের নাম সালাতুত তাসবীহ।

আপনার জিজ্ঞাসার জবাবঃ

প্রশ্নঃ কেউ যদি জীবনে একবারও এই সালাত না পড়ে তাহলে কী তার গোনাহ হবে?

উত্তরঃ সালাতুত তাসবীহ নফল। কেউ আদায় করলে সওয়াব পাবে। আদায় না করলে গোনাহ হবে না। জীবনে একবারও যদি এই সালাত না পড়ে তাহলেও কোনো গোনাহ হবে না। তবে না পড়লে বিরাট সওয়াব ও ফযিলত থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে।

[৫০০] আবু দাউদ, হাদীস-১২৯৯

সালাতুত তাওবা

সালাতুত তাওবা ও কিছু কথা:

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুই প্রবণতাই প্রদান করছেন। অত:পর মানুষের জন্য ভালো ও মন্দ দুই পথ ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যাতে মানুষ তার কর্মের মধ্যে তা প্রমাণ করে, কে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আর কে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়। নবীগণ ছাড়া অন্য সকল মানুষেরই কিছু না কিছু গুনাহ হয়ে যায়। তবে মুমিন এ কারণে হতাশ হয় না; বরং আপন কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং গুনাহর কালো দাগ থেকে পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করে।

তাওবা অর্থ হল কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং আগামীতে গুনাহ না করার সংকল্প করা।

কুরআন মাজীদে এসেছে-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আপনি আমার ওই বান্দাদেরকে বলে দিন, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন। নি:সন্দেহে তিনি হলেন পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[৫০১]

অন্যত্রে আরো বলা হয়েছে-

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

আপনি অতি ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান এনে সৎকর্ম করে এবং সৎপথে অবিচলিত থাকে।[৫০২]

---

[৫০১] সূরা যুমার, আয়াত-৫৩
[৫০২] সূরা তহা, আয়াত-৮২

ইসলামে তাওবার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। তাওবার জন্য কোনো মাধ্যম গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। খৃষ্টধর্মে যেমন রয়েছে- পাদ্রীর সম্মুখে পাপ স্বীকার করে ক্ষমাপত্রে দস্তখত করার আগ পর্যন্ত পাপের কালিমা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এমন কোনো ধারণা ও নিয়ম ইসলামে নেই। ইসলামের তাওবার পদ্ধতি হচ্ছে- কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং আগামীতে গুনাহ না করার সংকল্প করা এবং কোনো গুনাহর মধ্যে জড়িত থাকলে তা ছেড়ে দেওয়া। অনুতপ্ত হওয়ার জন্য হাদীসে বর্ণিত দুআ এবং ইস্তিগফার করা যায়। তবে উত্তম হলো, সালাতের মাধ্যমে অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সার কথা হল, গোনাহ থেকে মুক্তি লাভের উল্লেখযোগ্য পথ দুটি। একটি হচ্ছে, সাধারণ দুআ এবং ইস্তিগফারের মাধ্যমে গোনাহ থেকে মুক্তি চাওয়া। অপরটি হচ্ছে, সালাতের মাধ্যমে গোনাহ থেকে মুক্তি চাওয়া।

সালাতের সময়:

সালাতুত তাওবা যে কোনো সময় পড়া যায়। তবে সালাত আদায়ের তিনটি নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত। সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ কিছু সময় রয়েছে। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয, ওয়াজিব এবং নফলসহ কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়। নিষিদ্ধ সময় হচ্ছে তিনটি।

১. সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। এর আনুমানিক সময় হলো ১২/১৩ মিনিট।

২. সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩. সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

সালাতের নিয়্যত:

সালাতের নিয়্যত সম্পর্কে আমাদের বইয়ের মধ্যে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

সালাতুত তাওবা দুই রাকাত । তবে বেশিও পড়া যায়। তাওবার উদ্দেশ্যে যদি দুই রাকাত সালাত পড়া যায় তবে অতি উত্তম কাজ। এই মর্মে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

যার কোনো গুনাহ হয়ে যায়, এরপর সে উত্তমরূপে ওযূ করে দুই রাকাত সালাত পড়ে এবং মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, মহান আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত পাঠ করলেন-

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর যারা কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের উপর জুলুম করে কৃত পাপের জন্য মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে গুনাহসমূহ ক্ষমা করে। আর তারা তাদের কৃতকর্মের উপর জেনে শুনে অবিচল থাকে না।[৫০৩]

সালাতের নিয়ম:

সালাতুত তাওবা অন্যান্য নফল সালাত পড়ার নিয়মেই পড়তে হয়। আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন এই সালাত পড়তে অমুক সূরা এতবার আর অমুক সূরা এতবার পড়তে হয়। আসলে কুরআন-হাদীসে এসব নেই। আমাদের দেশে মকসুদুল মুমিন বা বাজারে আরো কিছু ছোট-খাট বইয়ে সালাতুত তাওবার কিছু নিয়ম লেখা আছে। যেমন, এক সাথে

[৫০৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৫২৩

চার রাকাত পড়ার নিয়ত করতে হয়। এভাবে মোট বার রাকাত পড়তে হয়। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর দশবার, বা বিশবার সূরা কদর পড়তে হয়। দ্বিতীয় রাকআতে দশবার সূরা মাউন পড়তে হয়। তৃতীয় রাকআতে দশবার সূরা ইখলাস এবং চতুর্থ রাকআতে দশবার সূরা নাস পড়তে হয়। মকসুদুল মুমিন বা বাজারের ছোট-খাট বইয়ের এসব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট কথা। কারণ এসব কুরআন-হাদীসে নেই। তবে রাকাত সংখ্যার ব্যপারে নিয়ম হলো, যে যতটুকু পড়তে চায় সে ততটুকু পড়বে। তবে অন্যান্য সুন্নত বা নফল সালাত যেভাবে পড়া হয় সেভাবে পড়তে হয়। এটাই আসল নিয়ম। এর আলাদা কোনো নিয়ম-নীতি নেই। সুনির্দিষ্ট সূরাও নেই।

সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত:

১. সালাতুত তাওবার দ্বারা গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়:

আবু বকর সিদ্দীক রাদি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ

যার কোনো গুনাহ হয়ে যায়, এরপর সে উত্তমরূপে ওযূ করে দুই রাকাত সালাত পড়ে এবং মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, মহান আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন।[৫০৪]

২. সালাতুত তাওবার বিনিময় জান্নাত:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

[৫০৪] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১৫২৩

হযরত ওকবা ইবনে আমের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি উত্তমভাবে ওযূ করার পর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন বিনয়ের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করে তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত।[৫০৫]

সালাতুত তাওবা কবুলের শর্ত:

হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, তাওবা কি? তিনি উত্তর দিলেন, ছয়টি বিষয়ের সমষ্টির নাম হল তাওবা।

১। অতীত জীবনের গুনাহর উপর অনুতপ্ত হওয়া।

২। যে সব ফরয এবং ওয়াজিব ছুটে গেছে সে গুলো যথাযথভাবে আদায় করা।

৩। কারো কাছ থেকে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা পরিশোধ করে দেওয়া।

৪। কাউকে হাতে বা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে এর জন্য তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

৫। সাথে সাথে গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং জীবনে আর কখনো গুনাহ করবে না এই কথা বলে দৃঢ় সংকল্প করা।

৬। নিজেকে যেমন আল্লাহর নাফরমানী করতে দেখেছিল, এখন তেমনিভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।[৫০৬]

সালাতুল হাজাহ

সালাতুল হাজাহ-এর পরিচয়:

সালাতুত হাজাহ দুটি আরবি শব্দ। সালাত আমাদের দেশে নামায নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। আর হাজাহ-এর অর্থ প্রয়োজন, চাহিদা। সুতরাং সালাতুল

[৫০৫] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-৯০৬

[৫০৬] তাফসীরে মাযহারী; সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ‘মায়ারিফুল কুরআন’-৮/৫১২

হাজাহ-এর অর্থ হলো প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণের নামায। চাহিদা পূরণের সালাত।

সালাতুল হাজাহ-এর প্রেক্ষাপট:

আমরা মানুষ। আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন থাকে। চাহিদা হয় অনেক কিছুর। এসব প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য আমরা চেষ্টা করি বিভিন্নভাবে। মানুষ তার জীবনযাত্রায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। হওয়া স্বাভাবিক। কখনো এমন কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়, যে সমস্যাকে মানবীয় সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে এবং শক্তি দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। অথচ সমস্যার সমাধান করা অতীব জরুরী। নিতান্ত প্রয়োজন। তখন এই প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ এমন এক স্বত্তার শরনাপন্ন হয়, যেই স্বত্তার জ্ঞান এবং শক্তি অসীম। যার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তিনিই হলেন মহান রাব্বুল আলামীন। সুতরাং আমাদের উচিত হলো সকল প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে চাওয়া। এমনিভাবে যখন আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই তখনও তাঁরই কাছে সমাধান চাওয়া। প্রকৃত মুমিন একমাত্র মহান আল্লাহকেই তাদের সমস্যার সমাধানকারী বলে বিশ্বাস করেন। তাদের প্রয়োজন পূরণকারী তাঁকেই মনে করেন। মনের পূর্ণ আস্থা একমাত্র তাঁরই উপর। মুমিন যখনই কোনো বিপদে পড়েন তখন মহান আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম রাদি. কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে সমাধান চাইতেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবাদের ন্যায় সালাতের মাধ্যমে প্রয়োজন ও চাহিদা নিবারণ করা। সমস্যার সম্মুখীন হলে সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে এর সমাধান চাওয়া। এই পদ্ধতিতে চাওয়া বা সমাধানের নাম সালাতুল হাজাহ বা প্রয়োজন পূরণের সালাত, সমস্যার সমাধানের সালাত। আর সালাতের মাধ্যমে চাওয়া হল সাহায্য প্রার্থনার বা প্রয়োজন পূরণের সর্বোত্তম পদ্ধতি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈয্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।[৫০৭]

অন্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈয্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় মহান আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।[৫০৮]

সালাতুল হাজাহ-এর সময়:

সালাতুল হাজাহ যে কোনো সময় পড়া যায়। তবে সালাত আদায়ের তিনটি নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত। সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ কিছু সময় রয়েছে। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয, ওয়াজিব এবং নফলসহ কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়। নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য যে কোনো সময় এই সালাত পড়া যায়। নিষিদ্ধ সময় হচ্ছে তিনটি।

১. সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। এর আনুমানিক সময় হলো **১২/১৩** মিনিট।

২. সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩. সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

সালাতের নিয়্যত:

সালাতের নিয়্যত সম্পর্কে আমাদের বইয়ের মধ্যে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সালাতের নিয়ম:

সালাতুল হাজাহ অন্যান্য নফল সালাত পড়ার নিয়মেই পড়তে হয়। আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন এই সালাত পড়তে অমুক সূরা

[৫০৭] সূরা বাকারা, আয়াত-৪৫

[৫০৮] সূরা বাকারা, আয়াত- **১৫৩**

এতবার আর অমুক সূরা এতবার পড়তে হয়। আসলে কুরআন-হাদীসে এসব নেই। আমরা নফল সালাতের নিয়ম সম্পর্কে বিভিন্ন সালাতের শিরোনামে আলোচনা করেছি। সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

সালাতুল হাজাহ-এর রাকাত সংখ্যা:

হাদীস থেকে জানা যায় যে, সালাতুল হাজাহ দুই রাকাত। এক সঙ্গে দুয়ের অধিক রাকাত পড়ার কথা জানা যায় না। তবে একই প্রয়োজন পূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিকবার সালাতুল হাজাহ পড়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই সালাত অত্যন্ত বিনিয় ও আন্তরিকতার সাথে আদায় করা উচিত। অন্তরের মধ্যে প্রয়োজন পূরণের ব্যপারে শতভাগ আস্থাশীল হওয়া আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হাদীসে দুই রাকাতের কথা বলা হয়েছে। হযরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّلًا أَوْ مُؤَخِّرًا

যে উত্তমরূপে ওযূ করে, এরপর পূর্ণাঙ্গরূপে দুই রাকাত সালাত পড়ে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রার্থিত বিষয় (প্রয়োজনীয় জিনিস) দান করবেন। শিঘ্রই দান করবেন অথবা কিছুকাল পর (যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন।)[৫০৯]

সালাতুল হাজাহ-এর ফযিলত:

মহান আল্লাহ অতি দয়ালু। তাঁর জ্ঞান ও শক্তির কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। সুতরাং তিনি যা দিবেন তা হবে অনেক উত্তম এবং কল্যাণকর। সেই উত্তম এবং কল্যাণকর বস্তু সালাতুল হাজাহ-এর মাধ্যমে অবশ্যই পাওয়া যাবে। সুতরাং সালাতুল হাজাহ হলো উত্তম, বরকতময় এবং কল্যাণকর বস্তু পাবার নিশ্চিত মাধ্যম। পাবার নিশ্চিয়তা দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৫০৯] মুসনাদু আহমদ, হাদীস- ২৭৪৯৭

ওয়া সাল্লাম। হযরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّلًا أَوْ مُؤَخِّرًا

যে উত্তমরূপে ওযূ করে, এরপর পূর্ণাঙ্গরূপে দুই রাকাত সালাত পড়ে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রার্থিত বিষয় (প্রয়োজনীয় জিনিস) দান করবেন। শীঘ্রই দান করবেন অথবা কিছুকাল পর (যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন।)[৫১০]

সালাতুল হাজাহ-এর শেষে যে দুআ করা উত্তমঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে আমাদের কাছে এলেন। এরপর বললেন, যদি কারো কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে সে যেন ওযূ করে এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করে। চাই তার প্রয়োজন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হোক কিংবা মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। সালাত শেষে মহান আল্লাহর গুণগান করবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ প্রেরণ করবে। তারপর সে এই দুআটি পাঠ করবে। দুআটি হচ্ছে এই-

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

মহা সম্মানের অধিকারী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ পবিত্র। তিনি আরশে আযীমের মালিক। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি বিশ্বের পালনকর্তা। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে

[৫১০] মুসনাদু আহমদ, হাদীস-২৭৪৯৭

ঐ সকল জিনিস প্রার্থনা করছি, যা আপনার রহমতকে অত্যাবশ্যক করে, যার দ্বারা আপনার মাগফিরাত নিশ্চিত হয়। আমি আপনার নিকট সকল সাওয়াবের কাজে অংশ গ্রহণ করার এবং সকল পাপ কাজ থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রার্থনা করছি। আমি আরও প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমার কোনো গুনাহ রাখবেন না, সব গুনাহ ক্ষমা করুন। আমার সকল পেরেশানী দূর করুন। আমার ঐ সকল প্রয়োজন পূরণ করুন, যার মধ্যে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে। হে অসীম দয়াময়।[৫১১]

সালাতুল খাউফ

সালাতুল খাউফ এর পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক কথাঃ

সালাতুল খাউফ- এর অর্থ ভয়ভীতির সালাত। এই সালাত আদায়ের নিয়ম অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত সালাত থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। যখন মুসলমান কোনো দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তখন সবাই যদি একই ইমামের পিছনে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে চায় তাহলেই সালাতুল খাউফ আদায় করবে। তখন সালাতুল খাউফ আদায় করার জন্য উপস্থিত লোকজন দুই দলে ভাগ হবে। একদল ইমামের সাথে সালাত আদায় করবে। অন্য দল দুশমনের সাথে যুদ্ধ করবে। এই পদ্ধতিতে সালাত আদায় করার নাম সালাতুল খাউফ বা ভয়ভীতির সালাত।

এখানে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে উপস্থিত মুসলমানদের সবাই যদি একই ইমামের পেছনে জামাতের সাথে সালাত পড়তে চায় তাহলে সালাতুল খাউফ পড়বে। আর যদি উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে ইমাম হওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন একাধিক লোক থাকে তাহলে সালাতুল খাউফ পড়বে না। তখন স্বাভাবিকভাবে জামাতের মতো আলাদা করে সালাত আদায় করবে। অর্থাৎ দুটি জামাত করে অন্যান্য সালাতের মতো সালাত আদায় করবে।

[৫১১] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস-৪৭৯

সালাতুল খাউফ এর প্রেক্ষাপট:

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানের দুশমনেরা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে চিরতরে ধ্বংশ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। মুসলমান সালাতে দাড়ালে দুশমনেরা আক্রমন করত। এ জন্য এমন নাজুক পরিস্থিতিতে সালাতুল খাউফ আদায় করা ইসলামে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

(হে নবী) যখন আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন এবং তাদের সালাত কায়েম করাবেন তখন (শত্রুর সাথে মোকাবেলা সময় নিয়ম এই যে) মুসলিমদের একটি দল আপনার সাথে দাঁড়াবে এবং তারা নিজের অস্ত্র সাথে রাখবে। এরপর যখন তারা সাজদা করে নেবে তখন তারা তোমাদের পেছনে চলে যাবে এবং অন্য দল যারা এখনো সালাত আদায় করে নি তারা তারা সামনে এসে আপনার সাথে সালাত আদায় করবে। তারাও নিজেদের সাথে আত্মরক্ষার উপকরণ এবং অস্ত্র সাথে রাখবে। অমুসলিমরা কামনা করে তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও। যাতে তারা তোমাদের উপর অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়তে পারে।[৫১২]

সালাতুল খাউফ-এর রাকাত সংখ্যা:

সালাতুল খাউফ শুধু ফরয সালাতের ক্ষেত্রেই পড়তে হয়। সুতরাং সালাতুল খাউফ এর রাকাত সংখ্যা সুনির্ধারিত। আর তা সালাত আদায়কারী সবারই জানা আছে।

[৫১২] সূরা নিসা, আয়াত- ১০২

সালাতুল খাউফ আদায়ের নিয়ম বা পদ্ধতি:

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, সালাতুল খাউফ আদায়ের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রসিদ্ধ পদ্ধতি উল্লেখ করছি। উল্লেখিত পদ্ধতিটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَامُوا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلاَءِ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَؤُلاَءِ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাতুল খাউফ পড়লেন। একদল তাঁর পেছনে দাঁড়াল। আরেকদল শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। যে দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে দাঁড়াল, তিনি তাঁদেরকে নিয়ে এক রাকাত সালাত পড়লেন। তারা এক রাকাত শেষ করে শত্রুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। আর ঐ দলটি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে দাড়িয়ে এক রাকাত আদায় করল। (সালাতটি দুই রাকাত বিশিষ্ট হওয়ার কারণে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফেরালেন। তারপর প্রথম দলটি এসে একাকী অবশিষ্ট আরও এক রাকাত পড়ে সালাম ফেরাল। তারা তাদের সালাত শেষ করে শত্রুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। তখন দ্বিতীয় দলটি এসে একাকী তাদের অবশিষ্ট এক রাকাত পড়ে সালাম ফেরালেন।[৫১৩]

[৫১৩] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস- ১২৪৬

সালাতুল খাউফ এর নিয়ত:

সালাতুল খাউফ এর নিয়ত অন্যান্য সাধারণ ফরয সালাতের মতোই নিয়ত করতে হয়। এর জন্য ব্যতিক্রম কোনো নিয়ত নেই।

সালাতুল খাউফ আদায়ের সময়:

সালাতুল খাউফ হচ্ছে ভয়ভীতির সালাত। সুতরাং সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময় শত্রুর আক্রমনের ভয় দেখা দিবে তখন সালাতুল খাউফ পড়া যাবে।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সালাত

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের কারণ:

ভুমন্ডল ও নভোমন্ডলের সব কিছু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হচ্ছে মহান আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। মহান আল্লাহ সাময়িক সময়ের জন্য চন্দ্র-সূর্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেন। যেভাবে তিনি ইচ্ছা সাময়িক সময়ের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন করেন, তেমনিভাবে তিনি ইচ্ছা করলে চিরদিনের জন্যও অন্ধকারচ্ছন্ন করে দিতে পারেন। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীকে সর্তক করেন যে, এই বিশ্ব যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তিনি এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে ভিন্ন অবস্থা তৈরী করতে পারেন। সুতরাং যিনি মহা বিপর্যয়ের অশনি সংকেত দেন তিনিই মহা প্রলয়ের মাধ্যমে বিশ্বের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। অতএব একমাত্র তাঁকেই ডাকতে হবে। তাঁর বিধান মতোই পৃথিবীতে চলতে হবে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ

হযরত আবু বাকরা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র মহান আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি অন্যতম নিদর্শন। কারও মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগে না। বরং মহান আল্লাহ এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন।[৫১৪]

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন:

আমাদের দেশে কিছু অন্ধ, মুর্খ লোকেরা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের কোনো বড় ওলী বা আল্লাহ প্রেমিক মৃত্যু বরণ করার কারণে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ লেগে থাকে। এমন অন্ধ এবং ভুল বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে আরব সমাজেও ছিল। বর্তমানেও আমাদের সমাজে সেই ভুল বিশ্বাস রয়েছে। ইসলাম সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস বাতিল করে দিয়েছে। সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ মহান আল্লাহর কুদরতের অন্যতম দুটি নিদর্শন।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا

হযরত আবু মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কারও মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগে না। বরং এ দুটি হচ্ছে মহান আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। যখন তোমরা এই অবস্থা দেখবে তখন আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং সালাত পড়বে।[৫১৫]

---

[৫১৪] সহীহ বুখারী, হাদীস-১০৪৮

[৫১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১৫৪

হাদীসে এসেছে-

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ

হযরত মুগীরা ইবনে শুবাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেদিন (নবীজীর ছেলে) ইবরাহীম মৃত্যুবরণ করেছিল সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা এই অবস্থা দেখবে তখন তোমরা সালাত আদায় করবে এবং দুআ করতে থাকবে।[৫১৬]

সালাতের সময়:

সালাতের তিনটি নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময় এই সালাত পড়া যায়। সূর্য গ্রহণের সালাতের জন্য আযান, ইক্বামত নেই। মানুষকে একত্রিত করার জন্য এভাবে ডাক দিবে সালাতের জামাত হচ্ছে। আযান এবং ইকামত দিতে হবে না।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন (জামাত সমবেত হওয়ার জন্য) إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ (ইন্নাস সালাতা জামিআতুন) নিশ্চয় জামাত হচ্ছে বলে আওয়াজ দেওয়া হল।[৫১৭]

[৫১৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-১০৪৩

[৫১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-১০৪৫

উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা গেল যে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সালাতে আযান-ইকামত নেই। তবে নিশ্চয় জামাত হচ্ছে এই বলে ঘোষণা দিতে হবে।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

চন্দ্র গ্রহণের সালাত জামাত সহকারে পড়া সুন্নত নয়। জামাত ব্যতীত সকলেই পৃথকভাবে সালাত আদায় করবে। তবে সূর্য গ্রহণকালে সুন্নত হচ্ছে জামাত সহকারে দুই রাকাত সালাত পড়া। জামাত সহকারে পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ

হযরত আবু বাকরা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সূর্য গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন। চাদর টানলেন। মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। সূর্য পূর্ণ আলোকিত হওয়া পর্যন্ত।[৫১৮]

সালাতের নিয়ম:

আমরা সাধারাণত যেভাবে সালাত পড়ি সেভাবেই সূর্যগ্রহণের সালাত পড়া হয়। ইমামের জন্য সুন্নত হচ্ছে, সালাতের কিরাত, রুকু এবং সাজদা দীর্ঘায়িত করা। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুআ করবেন এবং মুক্তাদীগণ তাঁর সাথে দুআতে আমীন বলবেন। সূর্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুআ অব্যাহত রাখবে।

[৫১৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-১০৪০

হযরত নুমান ইবনে বশীর রাদি. বলেন-

إِذَا انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ লাগে তখন তোমরা কিছুক্ষণ আগের (অর্থাৎ ফজরের) সালাতের মতো দুই রাকাত সালাত আদায় করবে।[৫১৯]

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় আমাদের করণীয়:

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় আমাদের জন্য দুটি করণীয় রয়েছে।

প্রথমত: সালাত আদায় করা। আমরা সালাত সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়ত: দান-সাদকা করা। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় দান-সাদকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুনানু আবু দাউদ-এর হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কারও জন্ম এবং মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা সেটা দেখতে পাবে তখন তোমরা মহান আল্লাহর কাছে দুআ করবে। তাকবীর বলবে এবং দান-সাদকা করবে।[৫২০]

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সালাতে আযান-ইকামত দিতে হবে কি?

উত্তর: চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সালাতে আযান-ইকামত দিতে হবে না।

[৫১৯] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস-১৮৭৩

[৫২০] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস-১১৯৩

প্রশ্ন: সূর্যগ্রহণের সালাত জামাতে পড়তে হয় নাকি একাকী?

উত্তর: সূর্যগ্রহণের সালাত জামাতে পড়তে হয়। ফজরের সালাত যেভাবে জামাতের সাথে দীর্ঘ কিরাত এবং রুকু, সাজদাহর মাধ্যমে পড়তে হয় ঠিক সেভাবেই সূর্যগ্রহণের সালাত পড়তে হয়।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ

হযরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি বের হয়ে মসজিদে গেলেন। লোকেরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। (তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।)[৫২১]

সালাতুল ইস্তিস্‌কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত

সালাতুল ইস্তিস্‌কা:

ইস্তিস্‌কা আরবি শব্দ। এর অর্থ হল আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। সুতরাং সালাতুল ইস্তিস্‌কা হল এমন সালাত, যে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়।

সালাতুল ইস্তিস্‌কার কারণ:

বৃষ্টি মহান আল্লাহর রহমত। এটি তাঁর বড় নিয়ামত। যখন মানুষ গুনাহ করতে থাকে তখন কখনো এর শাস্তি হিসেবে খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। ফলে সে এলাকার চাষাবাদ, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য মারাত্নকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ শাস্তি এজন্য আসে, যেন মানুষ নিজের কৃতকর্মের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে। ক্ষমা প্রার্থনা করে

[৫২১] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৯৪৬

নিজের কৃত অপরাধের জন্য। ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গিকার করে মহান রবের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তাহলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবশ্যই রহমতর বৃষ্টি প্রেরণ করবেন।

ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার দুটি পদ্ধতি:

হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথম পদ্ধতি: সালাতের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: দুআ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে।

আমরা হাদীসে বর্ণিত দুটি পদ্ধতিকে আলাদা করে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

ইস্তিস্কার প্রথম পদ্ধতির বিবরণ:

প্রথম পদ্ধতি: সালাতের মাধ্যমে। এখানে আমরা সালাতের রাকাত সংখ্যা। সালাত আদায়ের সময় এবং সালাত আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

সালাতের রাকাত সংখ্যা:

সালাতুল ইস্তিসকা দুই রাকাত। হযরত আব্বাদ ইবনে তামিম তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন—

قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়দানে আসলেন। (এটি মসজিদ থেকে এক হাজার ফুট দূরে অবস্থিত একটি খোলা ময়দান।) তিনি বৃষ্টির জন্য দুআ করলেন। কিবলামুখী হলেন। পরিহিত চাদরের পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন। দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন।[৫২২]

[৫২২] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১০৮

সালাত আদায়ের সময় ও স্থান:

সালাতের তিনটি নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময় এই সালাত পড়া যায়। ঈদের সালাত যেই মাঠে আদায় করা হয় সেই মাঠে আদায় করা উত্তম। অন্যান্য সাধারণ মাঠেও আদায় করা যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিস্কার সালাতের উদ্দেশ্যে মাঠের দিকে বের হলেন। তিনি দুআ করলেন। বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। এরপর তিনি কিবলামুখী হলেন। পরিহিত চাদরের পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন।[৫২৩]

সালাত আদায়ের পদ্ধতি:

সালাতুল ইস্তিসকা অন্যান্য দুই রাকাত ফরয সালাতের মতো। জামাতের সঙ্গে দুই রাকাত সালাত আদায় করা। ইস্তিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের জন্য আযান-ইক্বামত নেই। আযান-ইকামত ব্যাতীত জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে হবে। জামাতের মধ্যে সর্বাধিক নেককার মানুষের ইমামতিতে এ সালাত আদায় করা হবে। সালাতে উচ্চ আওয়াজে কিরাত পড়া হবে। সালাত শেষে সকলে মিলে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর কাছে দুআ করা। অবস্থা পরিবর্তনের আশা প্রকাশ করে পরিহিত চাদরের ডান দিক বাম কাঁধে আর বাম দিক যান কাঁধে রাখবে। যেন এই আশা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর রহমতপূর্ণ মেঘমালাকেও আমাদের এলাকা অভিমুখী করে দিবেন।

হযরত আব্বাদ ইবনে তামিম তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন—

قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

[৫২৩] সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৩৪৩

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়দানে আসলেন। (এটি মসজিদ থেকে এক হাজার ফুট দূরে অবস্থিত একটি খোলা ময়দান।) তিনি বৃষ্টির জন্য দুআ করলেন। কিবলামুখী হলেন। পরিহিত চাদরের পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন। দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন।[৫২৪]

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বলেন-

خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিস্কার সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আযান-ইকামত ছাড়া জামাতের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি আমাদেরকে উপদেশ দিলেন। উপদেশের সঙ্গে দুআ ছিল। এরপর তিনি কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দুআ করলেন। দুআ শেষে পরিহিত চাদরের পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন। চাদরের ডান দিক বাম কাঁধে এবং বাম দিক ডান কাঁধে রাখলেন।[৫২৫]

ইস্তিস্কার দ্বিতীয় পদ্ধতির বিবরণ:

ইস্তিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার দ্বিতীয় পদ্ধতি হল দুআ ও ইস্তিগফার।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

(হযরত হুদ আ. বলেছিলেন) হে আমার সম্প্রদায়! নিজেদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অত:পর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদের প্রতি আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।[৫২৬]

---

[৫২৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১০৮

[৫২৫] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-১২৬৮

[৫২৬] সূরা হুদ, আয়াত- ৫২

অন্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে-

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا () وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ()

(হযরত নূহ আ. বলেছিলেন) তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে জেনো, তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচোর বৃষ্টি বর্ষন করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন। তিনি তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।[৫২৭]

জুমার খুতবার মাঝেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টির জন্য দুআ করেছেন। হাদীসে এসেছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনই বৃষ্টির জন্য দুআ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হল। অবিরাম এক সপ্তাহ বৃষ্টি হতে থাকে। পরবর্তী জুমআতে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর কাছে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ চাওয়া হয়। তিঁনি দুআ করলেন।

হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا فَقَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ

একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, (অনাবৃষ্টির কারণে) আমাদের গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে। রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি দুআ করলেন। ফলে এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে

---

[৫২৭] সূরা নূহ, আয়াত- ১০ থেকে ১২

লাগল। তারপর সে ব্যক্তি এসে বলল অতি বৃষ্টির কারণে আমাদের ঘর-বাড়ী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে যাচ্ছে। পশুগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং আপনি বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ! আপনি টিলা, নিম্নভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। তখন মদীনা থেকে মেঘ কেটে গেল।[৫২৮]

এখানে আমরা বৃষ্টি বর্ষনের জন্য এবং বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য যে দুআগুলো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সে দুআগুলোকে উল্লেখ করছি।

ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে এই দুআ পড়াঃ -১

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ আলুকা খাইরাহা, ওয়া খাইরা মা-ফীহা, ওয়া খাইরা মা-উরছিলাত বিহী, ওয়া আউযুবিকা মিং শাররিহা, ওয়া শাররি মা-ফীহা, ওয়া শাররি মা-উরছিলাত বিহী।

হে আল্লাহ! আমি এ বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যা কিছু আছে তার কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে প্রবাহিত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি এ বায়ুর অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে প্রবাহিত করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৫২৯]

ঝড়-তুফান শুরু হলে এই দুআ পড়াঃ -২

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا

আল্লাহুম্মাজ য়ালহা রাহমাতাও ওয়ালা তাজ য়ালহা আযাবান, আল্লাহুম্মাজ য়ালহা রিআহান ওয়ালা তাজ আলহা রীহান।

[৫২৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-১০১৬
[৫২৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১২২

হে আল্লাহ! আপনি এই বায়ুকে আমাদের জন্য রহমত বানিয়ে দিন, একে শাস্তি হিসেবে প্রেরণ করবেন না। হে আল্লাহ! আপনি একে মৃদু বাতাস করুন, একে ভয়ংকর ঝড়তুফান করবেন না।[৫৩০]

আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে এই দুআ পড়াঃ

اللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

আল্লাহুম্মা লা তাক্বতুলনা বিগাদ্বাবিকা, ওয়ালা তুহলিকনা বিআযাবিকা, ওয়াআফিনা ক্বাবলা যালিকা।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে গযব দিয়ে শেষ করবেন না এবং আপনার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না, এর আগেই আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।[৫৩১]

বৃষ্টি বর্ষনের সময় এই দুআঃ

اللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

আল্লাহুম্মা ছায়্যিবান নাফিআন।

হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষন করুন।[৫৩২]

রহমতের বৃষ্টির জন্য এই দুআ পড়াঃ

اللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

আল্লাহুম্মা আছক্বি ইবাদাকা, ওয়া বাহায়িমাকা, ওয়াং সুর রাহমাতাকা, ওয়া আহয়ি বালাদাকাল মায়্যিত।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদেরকে এবং চতুষ্পদ প্রাণীগুলোকে পানি পান করান। আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন এবং মৃত শহরকে সজীব করুন।[৫৩৩]

[৫৩০] মিশকাত, হাদীস-১৫১৯;
[৫৩১] তিরমিযি, হাদীস-৩৪৫০
[৫৩২] বুলুগুল মারাম, হাদীস-৫২০
[৫৩৩] আবু দাউদ, হাদীস-১১৭৮

অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে এই দুআ পড়া:

اللّٰهمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

আল্লাহুম্মা হাওয়া লাইনা ওয়ালা আলাইনা।

হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বৃষ্টি বর্ষন করুন, আমাদের উপর নয়।[৫৩৪]

জমা বাইনাস সালাতাইন

(দুটি সালাতকে একত্রে পড়া)

জমা বাইনাস সালাতাইন ও কিছু কথা:

জমা বাইনাস সালাতাইন-এর অর্থ হল, দুই ওয়াক্তের সালাতকে একত্রে আদায় করা। যেমন, যোহর এবং আসরকে একসাথে আদায় করা। মাগরিব এবং ইশাকে একসাথে আদায় করা।

হাদীসের আলোকে জমা বাইনাস সালাতাইন:

জমা বাইনাস সালাতাইন বৈধতার ব্যপারে অনেক হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম দুই ওয়াক্তের সালাতকে একত্রে আদায় করেছেন। এ সম্পর্কে এই আলোচনার বিভিন্ন শিরোনামে হাদীস উল্লেখ করা হবে।

জমা বাইনাস সালাতাইন-এর দুটি পদ্ধতি:

জমা বাইনাস সালাতাইন-এর দুটি পদ্ধতি আছে।

প্রথম পদ্ধতি: দ্বিতীয় ওয়াক্তের সালাতকে সামনের দিকে এগিয়ে এনে প্রথম ওয়াক্তের সালাতের সাথে দ্বিতীয় ওয়াক্তের সালাতও আদায় করে নেয়া। যেমন, যোহরের সময়ে যোহর এবং আসরের সালাতকে একত্রে

[৫৩৪] সহীহ বোখারী, হাদীস-২১১৬

আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার মাঠে যোহর এবং আসরকে এভাবে একত্রে আদায় করতেন।

সহীহ বুখারীতে এসেছে-

سَأَلَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ

হযরত আবদুল্লাহ রাদি.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আরাফার মাঠে অবস্থানের সময় কিভাবে আমল করব? সালিম বললেন, আপনি যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে আরাফার দিনে দুপুরে সালাত আদায় করবেন। আবদুল্লাহ বললেন, সালিম সঠিক বলেছেন। সাহাবিগণ সুন্নাত অনুযায়ী যোহর এবং আসরের সালাত একত্রে আদায় করতেন। (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী এমন করেছেন? তিনি বললেন, এ ব্যপারে তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে?[৫৩৫]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: প্রথম ওয়াক্তের সালাতকে বিলম্বিত করে দ্বিতীয় ওয়াক্তের সালাতের সাথে একত্রে আদায় করা। যেমন, মাগরিবের সালাতকে বিলম্বিত করে ইশার সময়ের কাছাকাছি করে মাগরিব এবং ইশা একত্রে আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফাতে মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।

সহীহ বুখারীতে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

[৫৩৫] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৬৬২

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফাতে মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। প্রত্যেক সালাতের জন্য আলাদা আলাদা ইকামাত দেওয়া হতো। তবে তিনি উভয় সালাতের মধ্যে এবং আগে-পরে কোনো নফল সালাত পড়েন নি।[৫৩৬]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

হযরত আবু আইউব রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালিফাতে মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন।[৫৩৭]

আরেকটি হাদীসে এসেছে-

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ

হযরত নাফে রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. মুযদালিফাতে মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্র করতেন। তিনি সেই গিরিপথ অতিক্রম করতেন যেই গিরিপথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেতেন। তিনি সেখানে প্রবেশ করতেন। পেশাব করতেন। ওযূ করতেন। কিন্তু সালাত আদায় করতেন না। তিনি মুযদালিফাতে গিয়ে সালাত আদায় করতেন।[৫৩৮]

[৫৩৬] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৬৭৩

[৫৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৬৭৪

[৫৩৮] সহীহ বুখারী, হাদীস-১৬৬৮

জমা বাইনাস সালাতাইন-এর বিধান:

আমরা বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে উপরে জমা বাইনাস সালাতাইন এর দুটি প্রদ্ধতির আলোচনা করেছি। উল্লেখিত দুটি পদ্ধতির আলোচনা থেকে যে বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে তা হলো, হজ্ব পালনের সময়ে আরাফার মাঠে এবং মুযদালিফার মাঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম জমা বাইনাস সালাতাইন করেছেন। সুতরাং হজ্ব পালনের সময়ে আরাফার মাঠে এবং মুযদালিফার মাঠে জমা বাইনাস সালাতাইন জায়েয আছে। তবে হজ্ব পালনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সফরে জমা বাইনাস সালাতাইন জায়েয নেই।

আপনার জিজ্ঞাসার জবাব:

প্রশ্ন: বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্ব পালনের সময় ছাড়াও সাধারণ সফরে জমা বাইনাস সালাতাইন করেছেন। তাহলে শুধু হজ্ব পালনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সফরে জমা বাইনাস সালাতাইন জায়েয নয় কেন?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্ব পালনের সময় ছাড়াও সাধারণ সফরে যেভাবে জমা বাইনাস সালাতাইন করেছেন, তা দেখতে জমা বাইনাস সালাতাইন হলেও মূলত সেটা জমা বাইনাস সালাতাইন ছিল না। কারণ তিনি হজ্ব পালনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে জমা বাইনাস সালাতাইন করার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। আর তা হল, তিনি প্রথম সালাতকে বিলম্বিত করে ওয়াক্তের শেষ অংশে সালাত আদায় করেছেন এবং পরবর্তী সালাতকে ওয়াক্তের শুরু অংশে আদায় করেছেন। এই পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের কারণে বাহ্যিকভাবে জমা বাইনাস সালাতাইন মনে হলেও সেটা জমা বাইনাস সালাতাইন ছিল না। বরং প্রতিটি সালাতকে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করা হয়েছে।

আমরা বিষয়টিকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজে বোঝার চেষ্টা করছি। যেমন, মাগরিবের সালাতের সময় শুরু হয় সন্ধা ৬ টা ৫০ মিনিটের সময়। ওয়াক্ত শেষ হয় ৮ টা ১৫ মিনিটে। আর ইশার সালাতের সময় শুরু হয় ৮ টা ১৬ মিনিটের সময়। এখন কেউ যদি মাগরিবের প্রায় শেষ সময়ে অর্থাৎ

৮ টা ৫ মিনিটের সময় মাগরিবের সালাত শুরু করল। আর শেষ করল ৮ টা ১০ মিনিটের সময়। আর ৫/৭ মিনিট পরেই ইশার সালাতের সময় শুরু হল। তখন সে ইশার সালাত শুরু করল। তাহলে সে দুটো সালাতকে দুটি সময়ে আদায় করল। কিন্তু বাহ্যিকভাবে মনে হয়েছে যে, সে ব্যক্তি দুটি সালাতকে একই ওয়াক্তে আদায় করল। আসলে একই ওয়াক্তে আদায় করে নি। বরং আলাদা আলাদা ওয়াক্তেই সালাত আদায় করা হয়েছে। সুতরাং যে সব হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্ব ব্যতীত অন্যান্য সফরে জমা বাইনাস সালাতাইন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা বাহ্যিকভাবে জমা বাইনাস সালাতাইন মনে হলেও মূলত জমা বাইনাস সালাতাইন ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে হজ্ব পালনের সময় ছাড়াও বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই ধরণের পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা জায়েয ছিল। বর্তমানেও বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই ধরণের পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা জায়েয আছে। আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন।

উপরে উল্লেখিত পদ্ধতির বিবরণ সহীহ মুসলিমের হাদীসেও এসেছে-

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

হযরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সফরে বেশি ব্যস্ততা থাকলে তিনি যোহরের সালাতকে আসরের শুরু ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। এরপর দুই সালাতকে (যোহর এবং আসরকে) একত্রে আদায় করতেন। এরপর এভাবেই মাগরিব এবং ইশাকে একত্র করে আদায় করতেন।[৫৩৯]

[৫৩৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৬৬১

লাইলাতুল কদরের সালাত

লাইলাতুল কদরের পরিচয় ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথাঃ

লাইলাতুল কদর। এখানে মূলত দুটি শব্দ। লাইলাতুন অর্থ রাত। আর কদর অর্থ মহিমান্বিত, সম্মান ও ভাগ্য। সুতরাং লাইলাতুল কদর অর্থ মহিমান্বিত রাত। কদরের আরেক অর্থ তাকদীর। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের জন্য অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থা প্রয়োগকারী ফিরিশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি, ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফিরিশতাগণকে লিখে দেয়া হয়। এমনকি এবছর কে হজ্জ করবে তাও লিখে দেয়া হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, এসব কাজ চারজন ফিরিশতার কাছে সোপর্দ করা হয়। সেই চারজন ফিরিশতা হলেন, হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালাম, হযরত মিকাঈল আলাইহিস সালাম, হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালাম ও হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম।[৫৪০]

এই রাতের আরেকটি নাম হচ্ছে শবে কদর। শব শব্দটি ফার্সী। এর অর্থ হল রাত বা রজনী। কদর অর্থ হল মহিমান্বিত, সম্মান ও ভাগ্য। সুতরাং শবে কদর অর্থ মহিমান্বিত রজনী বা ভাগ্য রজনী। যেহেতু এই রাতটি অনেক মহিমান্বিত এইজন্য একে লাইলাতুল কদর বলা হয়। আবু বকর ওয়াররাক বলেন, এ রাত্রিকে লাইলাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য ছিল না, সে এই রাত্রিতে তওবা-ইস্তিগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়ে যায়। আমাদের দেশে অনেকে লাইলাতুল কদর বলার পরিবর্তে শবে কদর বলতে বেশি আগ্রহী। কুরআন-হাদীসে এই রাতকে লাইলাতুল কদর বলা হয়েছে। সুতরাং শবে কদর বলার পরিবর্তে লাইলাতুল কদর বলা উত্তম এবং বরকতময়। কারণ লাইলাতুল কদর শব্দটি আল্লাহর হাবীব, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত শব্দ। এমনিভাবে নামায, রোযা ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তেও সালাত, সাওম বলা

[৫৪০] মায়ারিফুল কুরআন, ৮/৮৩১

উত্তম ও বরকতময়। এজন্য আমরা আমাদের এই পুস্তিকাতে শবে কদর এবং নামায-রোযা শব্দগুলোর পরিবর্তে লাইলাতুল কদর এবং সালাত-সিয়াম বা সাওম শব্দ ব্যবহার করেছি।

লাইলাতুল কদরের ইতিহাস:

১. মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত মুজাহিদ রাহি. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তির আলোচনা করলেন। বললেন ঐ ব্যক্তি হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম আল্লাহর রাস্তায় অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। কখনও অস্ত্র সংবরণ করেননি। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি একনাগারে এক হাজার মাস পর্যন্ত জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবারা একথা শুনে বিস্মিত হলেন। এই জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরায়ে কদর নাযিল করেন। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একথা জানিয়ে দিলেন যে, লাইলাতুল কদরের ইবাদত ঐ ব্যক্তির এক হাজার মাসের চেয়েও বেশী উত্তম।[৫৪১]

২. ইমাম ইবনে জারীর রাহি. হযরত মুজাহিদ রাহি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনি ইসরাঈলের এক লোক সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন। আবার সন্ধা থেকে সকাল পর্যন্ত মহান আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। তিনি এক হাজার মাস পর্যন্ত এইভাবে কাটিয়ে দেন। অত:পর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সূরা নাযিল করে তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতকে সুসংবাদ জানিয়ে দেন যে, এই উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি লাইলাতুল কদরে ইবাদত করে তাহলে সে বনি ইসরাঈলের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী সওয়াব পাবে।[৫৪২]

৩. মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আলী ইবনে উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি ইসরাঈলের চারজন আবিদের (ইবাদতকারীর) কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা আশি বছর পর্যন্ত মহান আল্লাহর ইবাদত করেছিলেন। এই আশি

[৫৪১] মায়ারিফুল কুরআন- ৮/৮৩১

[৫৪২] ইবনে কাছির, সূরায়ে কদরের ব্যাখ্যা

বছরের মধ্যে সামান্য সময়ের জন্যও তারা মহান আল্লাহর নাফরমানী করেন নি। এই চারজন হলেন হযরত আইউব আলাইহিস সালাম, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম, হযরত হিযকিল আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইউশা ইবনে নুন আলাইহিস সালাম। এ ঘটনা শুনে সাহাবায়ে কিরাম খুবই অবাক হলেন। তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন: হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার উম্মতেরা এই ঘটনা শুনে আশ্চর্য হয়েছে। আপনি জেনে রাখুন, মহান আল্লাহ আপনাকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস দান করেছেন। আপনার উম্মত যে ব্যপারে আশ্চর্য হয়েছে এটা তার চেয়েও অনেক উত্তম। এই কথা বলে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সূরায়ে কদর তিলাওয়াত করে শুনালেন। এতে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম রাদি. অত্যন্ত খুশি হলেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরায়ে কদর নাযিল করে অন্য উম্মত থেকে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিলেন।[৫৪৩]

লাইলাতুল কদর কখন?

লাইলাতুল কদর কখন? এ ব্যপারে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন-

১. বছরের যে কোন দিন: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. এবং ইরাকের কুফা নগরীর আলেমদের মতে লাইলাতুল কদর সারা বছরে একটি এবং তা যে কোন মাসেই থাকার সম্ভাবনা আছে।

২. রমযানুল মুবারকের পুরো মাসে লাইলাতুল কদর থাকার সম্ভবনা রয়েছে।

৩. ইমাম গাযালি রাহি. বলেছেন, রমযানের প্রথম রাত্রিই লাইলাতুল কদরের রাত্রি।[৫৪৪]

৪. রমযান মাসের একুশতম রাত্রি হলো লাইলাতুল কদর।

৫. রমযানের তেইশ তারিখ।

[৫৪৩] মায়ারিফুল কুরআন- ৮/৮৩১

[৫৪৪] ইবনে কাছির, সূরায়ে কদরের ব্যাখ্যা

৬. রমযানের চব্বিশ তারিখ।

৭. হযরত আলী রাদি. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. হতে বর্ণিত আছে, রমযানের ঊনত্রিশতম রাত্রি হলো লাইলাতুল কদর।

৮. রমযানের শেষ দশকে: হযরত মুরসিদ রাদি. বলেন, আমি হযরত আবু যর রাদি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো প্রশ্ন করেছিলেন? হযরত আবু যর রাদি. উত্তরে বললেন: জেনে রেখো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রায় সময় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতাম। একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আচ্ছা, লাইলাতুল কদর কী রমযান মাসেই রয়েছে, নাকি অন্য মাসে রয়েছে? তিনি আমাকে উত্তরে বললেন: লাইলাতুল কদর রমযান মাসেই রয়েছে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম: এই রাত্র কি নবীদের জীবদ্দশা পর্যন্তই থাকবে, নাকি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে আমাকে বললেন: কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমি আবারও জিজ্ঞাসা করলাম: এই রাত্র রমযানের কোন অংশে আছে? তিনি আমাকে জবাব দিলেন: এই রাত্রি রমযানের প্রথম ও শেষ দশকে অনুসন্ধান কর। আমি তখন নীরব হয়ে রইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য দিকে মনোনিবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর একটু সুযোগ পেয়ে আবারও জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আমার হক আছে। এই জন্য আমি আপনাকে কৃসম দিচ্ছি। দয়া করে আমাকে সংবাদ দিন, লাইলাতুল কদরের রাত্রি কোনটি? তিনি প্রশ্ন শুনে আমার উপর অত্যন্ত রাগ করলেন। ইত:পূর্বে আমার উপর এতো রাগ আর কোনদিন করেননি। তারপরও তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, রমযানের শেষ দশ রাত্রে তালাশ করো। এরপর প্রশ্ন করো না।[৫৪৫]

৯. রমযানের ২৭ তারিখ। অর্থাৎ ছাব্বিশতম সিয়ামের পর যে রাত্রি আসে সেই রাত্রে। মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, প্রখ্যাত সাহাবি হযরত উবাই ইবনে কাব রাদি. কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলতেন, যে ব্যক্তি বৎসরের প্রত্যেক রাত্রে জাগ্রত

[৫৪৫] ইবনে কাছির, সূরায়ে কদরের ব্যাখ্যা

থাকবে সে অবশ্যই লাইলাতুল কদর পাবে। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কাব রাদি. বললেন: আমি ঐ মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, যিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) এ কথা জানতেন যে, লাইলাতুল কদর রমযান মাসের মধ্যে রয়েছে। আমার ভাই এই কথাও জানতেন যে, রমযানের সাতাশতম রাত হলো লাইলাতুল কদর।[৫৪৬]

লাইলাতুল কদর অনির্দিষ্ট রাখার রহস্য:

হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে খবর দেয়ার জন্য বের হয়ে এলেন। কিন্তু তিনি বের হয়ে দেখলেন যে, দুজন মুসলমান পরস্পরে ঝগড়া করছে। তিনি এই অবস্থা দেখে বললেন: আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দিতে এসেছিলাম। কিন্তু অমুক আর অমুকের ঝগড়ার কারণে ঐ রাত্রির বিষয়টি আমার স্মৃতি থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। সম্ভবত: এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই হাদীসের ভাবার্থ হলো এই যে, এই রাত্রির সন্ধানকারী সম্ভাব্য সারা রাত অত্যন্ত ভক্তি এবং বিনয়ের সাথে ইবাদত করবে। আর যদি এই রাত্রি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হতো তাহলে লোকজন শুধু ঐ রাত্রেই ইবাদত করতো। এই জন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহানবীর স্মৃতি থেকে এই রাতের নির্দিষ্টতাকে তুলে নিয়েছেন। এর কয়েকটি কারণ আছে। যেমন-

১. এই রাতটি যেহেতু হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম, তাই অলস ও ইবাদত ফাঁকি দেয় এমন লোকেরা সারা বছর নফল ইবাদত ছেড়ে দিয়ে শুধু লাইলাতুল কদরের ইবাদতকে যথেষ্ট মনে করে বসে থাকতো, তাই এ রাত নির্ধারণ করা হয় নি।

২. যদি কেউ কোনো কারণবশত এই রাতে ইবাদত করতে না পারতো তবে সে দু:খে-কষ্টে দিশেহারা হয়ে যেত। যা পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন ফরয এবং ওয়াজিব আমলে সমস্যার সৃষ্টি করতো। যার ফলে সে অনেক

[৫৪৬] ইবনে কাছির, সূরায়ে কদরের ব্যাখ্যা

রহমত থেকে বঞ্চিত থাকতো। এজন্য কেউ যেন দুঃখ-কষ্ট না পায়, কারো আমলে যেন সমস্যার সৃষ্টি না হয় এবং রহমত থেকে বঞ্চিত না হয় তাই এ রাতকে নির্ধারণ করা হয় নি।

৩. যেন লোকজন রাত্রিটিকে পাবার আশায় রমযানের প্রতিটা মুহুর্তকে ইবাদতের মধ্যে লাগাতে পারে। বিশেষ করে রমযানের শেষ দশকে যেন ইবাদতের জন্য সর্বাত্নক প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে বেশি আমল করতে পারে। তাই এ রাতকে নির্ধারণ করা হয় নি। তবে এই রাত্রটিকে বোঝার কয়েকটি নিদর্শন আছে।

লাইলাতুল কদরের নিদর্শনঃ

লাইলাতুল কদর অবশ্যই অনির্দিষ্ট। তবে এর কিছু সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। তা আমরা আলোচনা করেছি। আর সেই সম্ভাব্য তারিখ বোঝার জন্য কয়েকটি নিদর্শনও বলা হয়েছে। যেমন-

১. এই রাতটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং এমন উজ্জ্বল দেখা যাবে যেন চন্দ্র উদয় হয়েছে।

২. এ রাতে শান্তি বিরাজ করবে।

৩. বেশী গরমও লাগবে না, আবার বেশী ঠাণ্ডাও লাগবে না। (সুতরাং মনে হবে অনেকটাই আমাদের দেশের ইয়ার কন্ডিশনের মতো)।

৪. সকাল পর্যন্ত আকাশে নক্ষত্র জ্বলজ্বল করবে।

৫. প্রভাতে সূর্য প্রখর কিরণের সাথে উদিত হবে না, বরং চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের মতো সূর্য উদিত হবে। ঐ দিন সূর্যের সাথে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।[৫৪৭] হাদিসটির সনদ সহীহ, মতন গারীব।

লাইলাতুল কদরের আমলঃ

কুরআন-হাদীসে লাইলাতুল কদরের বিশেষ কোনো আমলের কথা উল্লেখ নেই। হাদীসে থেকে একটি আমলের কথা জানা যায়। আর তা হচ্ছে, রাত্রে অধিক সালাত আদায় করা। তবে সালাতের মধ্যে সংখ্যা বেশি

[৫৪৭] সূত্রঃ ইবনে কাছির।

হওয়ার চেয়ে সালাতের কোয়ালিটি বা মান ভালো হওয়া বেশি প্রয়োজন। মহান আল্লাহর কাছে নফল আমলের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে কোয়ালিটির গুরুত্ব অনেক বেশি। লাইলাতুল কদরে সালাত আদায়ের কথা অনেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে-

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাত্রিতে ইবাদত করে, তার পূর্বের সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৫৪৮]

লাইলাতুল কদরের সালাতের রাকাত সংখ্যা ও পড়ার নিয়মঃ

লাইলাতুল কদরে সালাত পড়ার নিয়ম হলো অন্যান্য নফল বা তাহাজ্জুদ সালাত পড়ার নিয়মেই পড়তে হয়। এরাতে সালাত পড়ার বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন এ রাতে অমুক সূরা এতবার আর অমুক সূরা এতবার পড়তে হয়। আসলে কুরআন-হাদীসে এসব নেই। আমাদের দেশে মকসুদুল মুমিন বা বাজারে আরো কিছু ছোট ছোট বইয়ে লাইলাতুল কদরের সালাতের কিছু নিয়ম লেখা আছে। যেমন, এক সাথে চার রাকাত পড়ার নিয়ত করতে হয়। এভাবে মোট বার রাকাত পড়তে হয়। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর দশবার, বা বিশবার সূরা কদর পড়তে হয়। দ্বিতীয় রাকআতে দশবার সূরা মাউন পড়তে হয়। তৃতীয় রাকআতে দশবার সূরা ইখলাস এবং চতুর্থ রাকআতে দশবার সূরা নাস পড়তে হয়। এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কারণ এসব কুরআন-হাদীসে নেই। তবে রাকাত সংখ্যার ব্যপারে নিয়ম হলো, যে যতটুকু পড়তে চায় সে ততটুকু পড়বে। অন্যান্য সুন্নত বা নফল সালাত যেভাবে পড়া হয় সেভাবে পড়তে হবে। এটাই আসল নিয়ম।

[৫৪৮] সহীহ বুখারী, হাদীস- ১৯০১

লাইলাতুল কদরের ফযিলত:

লাইলাতুল কদরের অনেক ফযিলত রয়েছে। এর মধ্যে এখানে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকটি ফযিলতের কথা উল্লেখ করছি-

১. এই রাত্রিতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে:

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

একে নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদি.-সহ প্রমুখ সাহাবি হতে বর্ণিত আছে যে, লাইলাতুল কদরে সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করা হয়েছে। তারপর বিভিন্ন ঘটনার পরিপেক্ষিতে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে ধীরে-ধীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।[৫৪৯]

২. লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও বেশী উত্তম:

মহান আল্লাহ বলেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। হযরত মুজাহিদ (রাহ.) বলেন যে, এ কথাটির ভাবার্থ হচ্ছে: লাইলাতুল কদর ঐ হাজার মাসের সালাত, সিয়াম, ইবাদত থেকেও উত্তম, যে হাজার মাসের মধ্যে লাইলাতুল কদর নেই।[৫৫০]

৩. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল গুনাহ মাফ করে দেন:

হাদীসে এসেছে-

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাত্রিতে ইবাদত করে, তার পূর্বের সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৫৫১]

---

[৫৪৯] ইবনে কাছির, সূরায়ে কদরের ব্যাখ্যা।

[৫৫০] ইবনে কাছির, সূরায়ে কদরের ব্যাখ্যা।

[৫৫১] সহীহ বুখারী, হাদীস- ১৯০১

৪. বয়স ও রিযিকের বাজেট নির্ধারণ করা হয়:

হযরত কাতাদা রাহি. বলেন যে, এই রাত্রে সমস্ত কাজের ফায়সালা করা হয়। বয়স ও রিযিকের বাজেট নির্ধারণ করা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন-

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

এই রাত্রে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।[৫৫২]

৫. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ফিরিশতাসহ অবতীর্ণ হন:

মহান আল্লাহ বলেন-

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফিরিশতাগণ এবং রূহ (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) অবতীর্ণ হন। তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।[৫৫৩]

শবে বরাতের নামায

শবে বরাতের পরিচয়:

আরবি বছরের গণনা মতে অষ্টম মাসের নাম শাবান মাস। যে মাসটি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযিলতপূর্ণ। শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে শবে বরাত বলা হয়। শবে বরাত ফার্সী ভাষার দুটি শব্দ। শব শব্দটির অর্থ রাত বা রজনী। বরাত অর্থ মুক্তি। বাংলায় বরাত শব্দটির অর্থ কপাল, ভাগ্য, সৌভাগ্য ইত্যাদি। অবশ্য বারাআত শব্দটি আরবিতে অধিক ব্যবহার হয়। আরবিতে একে লাইলাতুল বারাআত বলা হয়। এর অর্থ মুক্তির রজনী। হাদীসের ভাষায় শবে বরাতের নাম হল **ليلة النصف من شعبان** (লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান) অর্থ্যৎ মধ্য শাবানের রাত্রি। তবে কুরআনের কোথাও শবে বরাত বা লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান পরিভাষাটি এবং এর আলোচনা প্রত্যক্ষভাবে করা হয় নি। আমাদের দেশে শবে বরাত নামেই

---

[৫৫২] সূরা দুখান, আয়াত-৪

[৫৫৩] সূরা কদর, আয়াত- ৪

বেশি প্রসিদ্ধ। কারণ এক সময় মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ এলাকাতে ফার্সী ভাষার অধিক প্রচলন ছিল। তখন থেকে এই রাতটি শবে বরাত নামে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য আমরাও এটাকে শবে-বরাত বলে থাকি। হাদীসের বর্ণিত নামকে উপেক্ষা করে এ রাতটিকে ফার্সী নামে শবে বরাত বললে কোনো অসুবিধা হবে না। যেমন নামায, রোযা, দরুদ ইত্যাদি। তবে এই শব্দগুলো কুরআন-হাদীসে নেই। কারন এই নামগুলো ফার্সী। তারপরও আমরা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নাম সালাত, সিয়াম না বলে এর পরিবর্তে নামায, রোযা বলে থাকি। এতে যেমন কোন অসুবিধা হবে না, ঠিক তেমনিভাবে হাদীসের বর্ণিত নামের পরিবর্তে ফার্সীতে শবে-বরাত বললেও কোনো ধরণের অসুবিধা হবে না। তবে যেহেতু হাদীসে শবে বরাতকে লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান বলা হয়েছে। সুতরাং শবে-বরাত বলার পরিবর্তে লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান বলা উত্তম এবং বরকতময়। কারণ লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান নামের শব্দগুলো আল্লাহর হাবীব এবং আমাদের প্রিয় নবী সা. এর ব্যবহৃত শব্দ। এমনিভাবে নামায, রোযা ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে সালাত, সাওম বলা উত্তম ও বরকতময়। সকল মুমিনের জন্য কুরআন-সুন্নাহ এবং সাহাবিগণের ব্যবহৃত শব্দ এবং পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম।

আমরা এই আলোচনাতে সাধারণ পাঠকের সহজ এবং সুবিধার্থে মাঝে মধ্যে শবে বরাত পরিভাষা ব্যবহার করলেও শবে-বরাত বুঝাতে লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান এর অনুবাদে 'মধ্য শাবানের রাত্রি' পরিভাষা ব্যবহার করব। সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে এই আলোচনাকে 'শবে বরাতের নামায' নাম দিয়েছি।

শবে বরাত ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা:

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বা শবে বরাতের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের সমাজে অনেক কথা দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত হয়ে আছে। মুমিনগণ এ রাতে নিজেকে বিভিন্ন ইবাদতে নিয়োজিত করেন অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে। যেমন- ওয়ায-নসীহত, মীলাদ-মাহফিল, বিশেষ দুআ-মুনাজাত, জিলাপি, মিষ্টি ও অন্যান্য তাবারুক বিতরণ, কবর যিয়ারত ও বিশেষ সালাতে মুসল্লীরা মশগুলে থাকেন এ রাতে। পরদিন সিয়াম পালন করেন অনেকেই। কিন্তু এ রাতের ফযিলত সম্পর্কিত বক্তব্য কতটুকু নির্ভরযোগ্য

এবং এ রাতের ওয়ায-নসীহত, মীলাদ-মাহফিল, বিশেষ দুআ-মুনাজাত, জিলাপি, মিষ্টি ও অন্যান্য তাবারুক বিতরণ, কবর যিয়ারত ও বিশেষ সালাত আদায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কতটুকু গুরুত্ব রাখে এবং গ্রহণযোগ্যতা রাখে তা নিয়ে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে বিভিন্ন বক্তব্য ও মতভেদ রয়েছে। মধ্য শাবানের রাতে ইবাদতকে কেন্দ্র করে অনেক স্থানে মুসলমানরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একে অপরকে গালাগালি করে থাকে। কখনো একে অপরকে ইহুদীর দালালও বলে। শুরু হয় এক জনের সাথে আরেকজনের শত্রুতা।

এজন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ রাতের মর্যাদা এবং এ রাতের করণীয় জানা উচিত। সাথে সাথে এ রাতের আমল ও আমলের ফযিলত সম্পর্কে আমাদের সমাজে প্রচলিত বানোয়াট হাদীসগুলো ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত। তাহলে আমরা বিদআত থেকে বাঁচতে পারব এবং সুন্নাহর আলোকে সঠিক পথে চলতে পারব। এই উদ্দেশ্যে আমরা শবে বরাতের আলোচনাকে আমাদের সালাতের বইটিতে সন্নিবেশিত করেছি। যেন মুমিনগণ নিজেকে সাজাতে পারেন নবীজির সুন্নাহর আলোকে এবং বাঁচতে পারেন আমলের নামে বিদআতের ভয়াবহতা থেকে। বুঝে নিতে পারেন সঠিক কর্মপদ্ধতি।

মধ্য শাবানের রাত এবং এ রাতের গুরুত্ব:

আমরা শবে বরাতের পরিচয় শিরোনামে আগেই বলেছি যে, কুরআনে কোথাও শবে বরাত বা লাইলাতুল বারাআত পরিভাষা ব্যবহৃত হয় নি। লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বা মধ্য-শাবানের রজনী পরিভাষাটিও কুরআন কারীমে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। তবে কুরআন কারীমের সূরা দুখানের ৩ এবং ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্‌সির শবে বরাত প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ () فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ()

আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক (বরকতময়) রজনীতে। আমি তো সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

উল্লেখিত আয়াতে বরকতময় রজনী শব্দের উদ্দেশ্য ও মর্ম যেহেতু অস্পষ্ট, তাই এর দ্বারা কোন রাতকে বুঝানো হয়েছে এ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আল-কুরআনের ভাষ্যকারদের মধ্যে সাধারণত দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথম অভিমত: অধিকাংশ ভাষ্যকারদের মতে আলোচ্য আয়াতে বরকতময় রজনী এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লাইলাতুল কদর (শবে ক্বদর)।

দ্বিতীয় অভিমত: হযরত ইকরামাহ ও কাতাদাহসহ প্রমুখদের মতে বরকতময় রজনী এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত শবে বরাত।

এবার আমাদের জানার এবং বুঝার বিষয় হল কোন্ কোন্ মুফাসসির আয়াতের মধ্যে মুবারক রজনী বলতে শবে বরাত বলে ব্যাখ্যা করেছেন আর কোন্ কোন্ মুফাসসির আয়াতের মধ্যে মুবারক রজনী বলতে লাইলাতুল কদর (শবে কদর} বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

শবে বরাত বলে ব্যাখ্যাকারীগণ:

সূরা দুখানের আয়াতটিতে লাইলাতুম মুবারাকা এর ব্যাখ্যায় একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত ইকরামাহ (মৃ. ১০৪ হি.) বলেছেন আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হল শবে বরাত। তিনি প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি. (মৃ. ৬৮ হি.) এর খাদেম ছিলেন। তিনি অর্থাৎ ইকরামা যে মত প্রকাশ করেছেন তা অসংখ্য সাহাবি এবং তাবেয়ীর মতের সাথে মিল নেই। তাঁর মতটি অনেক সাহাবি এবং তাবিয়ীর মতের বিপরীত। পরবর্তীতে যারা হযরত ইকরামাহ রাহি. এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন তাদের অধিকাংশই বক্তব্যটি হযরত ইকরামার বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে দ্বিতীয় হিজরি শতকের কোনো একজন বর্ণনাকারী বক্তব্যটিকে ইকরামার মনিব হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি. এর বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন আন-নাদর ইবনু ইসমাঈল (১৮২ হি.)। তিনি বলেন তাকে মুহাম্মদ বিন সুক্কা বলেছেন। তাকে ইকরামা বলেছেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে। ইবনে আব্বাস সূরা দুখানের ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: মুবারক রজনী হলো মধ্য শাবানের রাত। এতে মৃত্যুবরণকারীদের নাম বর্ণনা করা হয় এবং হাজ্বীদের তালিকা তৈরী করা হয়। কোনো কম-বেশ করা হয় না।

বর্ণনাকারী আন-নাদর ইবনু ইসমাঈলের পরিচিতি:

প্রিয় পাঠক! এই বর্ণনার সনদের মধ্যে যেই বর্ণনাকারী আছেন, তিনি আন-নাদর ইবনু ইসমাঈল (১৮২ হি.)। তিনি কুফার একজন গল্পকার এবং সুবক্তা ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সৎ হলেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার ভুলের কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আন-নাদর ইবনু ইসমাঈল সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের অভিমত:

আবুল হাসান ইজলি: আন-নাদর ইবনু ইসমাঈল বিশ্বস্ত।

ইয়াহয়িয়া বিন সাঈদ: আন-নাদর ইবনু ইসমাঈল একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও মূল্যহীন।

ইমাম নাসায়ী ও আবু যুরআ: আন-নাদর ইবনু ইসমাঈল শক্তিশালী বা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন: আন-নাদর ইবনু ইসমাঈল সত্যবাদী তবে সে কি বর্ণনা করে তা নিজেই জানে না।

ইমাম বুখারী: ইমাম আহমদের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, আন-নাদর ইবনু ইসমাঈল সনদ মুখস্থ রাখতে পারত না।

ইবনু হিব্বান: আন-নাদর ইবনু ইসমাঈলের ভুল খুব মারাত্মক, যে কারণে তিনি পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয়েছেন।

বর্ণনাকারী আন-নাদর ইবনু ইসমাঈলের অবস্থা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে হয়তো তিনি ভুলবশত ইকরামার বক্তব্যকে সাহাবি ইবনু আব্বাসের বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত আন-নাদর ইবনু ইসমাঈল তার উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনু সূক্কাকে বলতে শুনেছেন (عن عكرمة مولى ابن عباس) ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাসের মাওলা। এখানে তিনি হয়তো ভুলে (عن عكرمة عن ابن عباس) ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে.. বলেছেন। এভাবে মাকতু হাদীস (তাবিয়ীর বক্তব্য) মাওকুফ হাদীসে (সাহাবির বক্তব্যে) পরিণত হয়েছে। অনেক বর্ণনাকারী ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বস্ত হলেও নিয়মিত চর্চা, স্মৃতির শক্তির দুর্বলতা এবং

পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের অভাবে অনেক সময় তাবেয়ীর বক্তব্যকে সাহাবির বক্তব্য হিসেবে কিংবা সাহাবির বক্তব্যকে তাবেয়ীর বক্তব্য (মাকতূ হাদীসকে মাওকূফ বা মাওকূফ হাদীসকে মারফূ) রূপে বর্ণনা করেছেন। এসব ভুল মুহাদ্দিসগণ নির্ধারণ করেছেন হাদীসের অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে তুলনামূলক পরিক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে। উসূলে হাদীসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তাবেয়ী ইকরামা রাহি. সূরা দুখানের লাইলাতুম মুবারাকা এর ব্যাখ্যার মধ্য শাবানের রজনী বুঝতেন। তবে অধিকাংশ মুফাসসির ইকরামার মত গ্রহণ করেন নি, বরং তারা ইকরামার মতটি বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। তারা সাহাবি এবং তাবেয়ীদের মতকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছেন।

শবে কদর বলে ব্যাখ্যাকারীগণ:

সূরা দুখানে লাইলাতুম মুবারাকা বা বরকতময় রজনীর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সাহাবি ও তাবিয়ী বলেছেন যে, এ রাতটি হলো শবে কদর বা লাইলাতুল কাদর যা রমজান মাসে। সাহাবিগণের মধ্য থেকে ইবনু আব্বাস রাদি. ও ইবনু উমার রাদি. সহ আরও অনেক সাহাবি অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাবেয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী (৭৪ হি.), মুজাহিদ বিন জাবর (১০২ হি.), হাসান বসরী (১১০ হি.), ক্বাতাদা ইবনু দিআমা (১১৭ হি.) এবং আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (১৮২ হি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, সূরা দুখানের আয়াতটিতে লাইলাতুম মুবারাকাহ দ্বারা লাইলাতুল কাদর বা মহিমান্বিত রজনী উদ্দেশ্য।

অনেক মুফাসসিরের মতে সূরা দুখানে বর্ণিত লাইলাতুম মুবারাকা এবং সূরা কদরে বর্ণিত লাইলাতুল কদর একই রাতের দুটি নাম। যে সকল মুফাস্সির লাইলাতুম মুবারাকার ব্যাখ্যায় লাইলাতুল কদর বলেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন-

মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী বিভিন্ন সনদে ইকরিমার এ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করার পরে তার প্রতিবাদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدر

সঠিক মত হলো তাদের মত যারা বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকা বা বরকতময় রাত্রি হলো লাইলাতুল কাদর বা মর্যাদার রাত্রি।

অত:পর তিনি বলেন যে, বরকতময় রাত্রির ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফয়সালার বিষয়েও আলিমগণ মতভেদ করেছেন। অনেকে বলেছেন, এ হলো লাইলাতুল কদর, এ রাত্রিতেই পরবর্তী বছরের জন্ম, মৃত্যু, উন্নতি, অবনতি ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়। হাসান বসরী, কাতাদা, মুজাহিদ, আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী, উমার মাওলা গাফরা, আবূ মালিক, হিলাল ইবনু ইয়াসাফ প্রমুখ তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ী থেকে উদ্ধৃত করেন যে, এদের সকলের মতেই লাইলাতুল কাদরে এ সকল বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। এরপর তিনি ইকরামা থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তার মতে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানে এ সকল বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। অত:পর তিনি বলেন:

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك ليلة القدر لما قد تقدم من بياننا عن أن المعني بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة ليلة القدر

এতদুভয়ের মধ্যে সঠিকতর মত হলো যারা বলেছেন যে, লাইলাতুল কাদরে এ সকল বিষয়ের ফয়সালা হয়; কারণ আমরা বলেছি যে, এখানে লাইলাতুম মুবারাকা বলতে তো লাইলাতুল কাদরকেই বুঝানো হয়েছে।[৫৫৪]

আল্লামা আবূ বাক্‌র মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ৫৪৩ হি.) বলেন:

وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ الصَّادِقِ الْقَاطِعِ: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} فَنَصَّ عَلَى أَنَّ مِيقَاتَ نُزُولِهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ عَبَّرَ عَنْ زَمَانِيَّةِ اللَّيْلِ هَاهُنَا بِقَوْلِهِ: {فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ

[৫৫৪] জামিউল বায়ান, সূরা দুখানের ৩ এবং ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

অধিকাংশ আলিম বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকা বা বরকতময় রজনী হলো লাইলাতুল কাদর। কেউ কেউ বলেছেন, তা হলো মধ্য-শাবানের রজনী। এ মতটি বাতিল; কারণ মহান আল্লাহ সন্দেহাতীভাবে সত্য গ্রন্থে বলেছেন: রমযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথাটি দ্ব্যর্থ হীনভাবে জানাচ্ছে যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় রমযান মাস। অত:পর এ আয়াতে অবতীর্ণ হওয়ার সময় জানিয়ে বলা হয়েছে বরকতময় রাত্রিতে। কাজেই কেউ যদি মনে করে যে, এ বরকতময় রাত্রিটি রমযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে তাহলে সে আল্লাহর নামে মহা মিথ্যা বানিয়ে বললো।[৫৫৫]

আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল-কুরতুবী (৬৭১ হি.):

তিনি বলেন:

والليلة المباركة ليلة القدر. . . . وقال عكرمة: الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان والأول أصح لقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}

লাইলাতুম মুবারাকা বা বরকতময় রজনী হলো লাইলাতুল কাদ্‌র ..... ইকরিমাহ (রাহিমাহুল্লা.) বলেছেন, এখানে বরকতময় রজনী বলতে মধ্য-শাবানের রজনী বুঝানো হয়েছে। তবে এখানে প্রথম মতটিই অর্থাৎ লাইলাতুল কদর হওয়ার মতটি সঠিকতর।[৫৫৬]

আল্লামা ইসমাঈল ইবনু উমার আবুল ফিদা ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি.):

তিনি নিশ্চিত করে বলেন যে, বরকমতয় রজনী বলতে লাইলাতুল কাদরই বুঝানো হয়েছে। অত:পর তিনি বলেন:

ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في رمضان

---

[৫৫৫] আহকামুল কুরআন, ৭/১২০

[৫৫৬] আল-জামে লিআহকামিল কুরআন, ১৬/১২৬

ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বরকতময় রাত্রিটি শাবানের মধ্য রজনী। এ মতটি একটি অসম্ভব ও অবাস্তব মত। কারণ কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, এ রাত্রটি রমযান মাসের মধ্যে।[৫৫৭]

আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (১৩৬২ হি.):

তিনি বলেন: অধিকাংশ তাফসিরকারকই লাইলাতুম মুবারাকাকে এখানে শবে কদর বলিয়া তাফসীর করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে হাদীসও যথেষ্ট রহিয়াছে। .... আর কেহ কেহ লাইলাতুম মুবারাকার তাফসীর করিয়াছেন শবে বরাত। কেননা শবে বরাত সম্মন্ধেও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে বরাতে বৎসরের যাবতীয় কার্যের মীমাংসা হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু শবে বরাতে কুরআন নাযিল হইয়াছে বলিয়া কোনো রেওয়ায়াত নাই এবং শবে কদরে নাযিল হইয়াছে বলিয়া স্বয়ং কুরআনের ‘নিশ্চয় আমি তা লাইলাতুল কাদরে অবতীর্ণ করেছি’ আয়াতেই উল্লেখ রহিয়াছে; সেই হেতু শবে বরাত বলিয়া লাইলাতুম মুবারাকার তাফসীর করা শুদ্ধ নহে বলিয়া মনে হয়।[৫৫৮]

মুফতী মুহাম্মদ শফী

আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকা এর ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে শবে কদর বোঝানো হয়েছে। যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে মুবারক বলার কারণ এই যে এ রাত্রিতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয়। সূরা কদরের আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন পাক শবে কদরে নাযিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে কদরকেই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বরগণের প্রতি

---

[৫৫৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৫/৩৪৪

[৫৫৮] তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, ৮/৭৪৭ ই.ফা. প্রকাশিত; তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনের মধ্যে তাফসীরের সার-সংক্ষেপ অংশটি আল্লামা আশরাফ আলী থানবী রাহি. এর বয়ানুল কুরআনের অংশ।

যত কিতাব নাযিল করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে। . . . . ইকরামাহ প্রমুখ কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের পনের তারিখের রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কুরআন অবতরণের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী।[৫৫৯]

প্রিয় পাঠক! আমরা 'মধ্য শাবানের রাত এবং এ রাতের গুরুত্ব' শিরোনামে দীর্ঘ আলোচনায় দেখছি যে, কুরআনের মধ্যে শবে বরাত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো আলোচনা নেই। যদিও তাবেয়ী ইকরামা রাহি. সূরা দুখানের ৩ নং এবং ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় শবে বরাত বলেছেন। তিনি ছাড়া অধিকাংশ সাহাবি এবং তাবেয়ী সূরা দুখানের ৩ এবং ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় শবে কদর বলেছেন। এছাড়া প্রায় সকল প্রসিদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য মুফাসসির বলেছেন সূরা দুখানের আয়াতে শবে কদর বুঝানো হয়েছে। অতএব আমরা ইকরামার মতের ভিত্তিতে সূরা দুখানের আয়াতের ব্যাখ্যায় 'শবে বরাত' বলে ব্যাখ্যা করা শুভবুদ্ধির কাজ মনে করি না এবং এটাও বিশ্বাস করি যে, কুরআনের পত্যক্ষ্য এবং পরোক্ষ কোনোভাবেই শবে বরাতের আলোচনা নেই। তবে শবে বরাত বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। এখানে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছি। আমরা বিভিন্ন শিরোনামে আরও হাদীস উল্লেখ করব এবং পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

শবে বরাত ও সালাতের ফযিলত:

১. শিরক এবং বিদ্বেষে জড়িত ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করা হয়: (এই হাদীসটি সহীহ)

মুয়ায ইবনু জাবাল রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

يَطَّلِعُ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

[৫৫৯] (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, ৮/৭৪৮ ই.ফা. প্রকাশিত)

মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।[৫৬০]

হাদীসটি ইবনু আবি আসিম তাঁর সনদে মাকহুল থেকে, তিনি মালেক বিন ইউখামের থেকে, তিনি মুয়ায বিন জাবাল রাদি. থেকে বর্ণনা করেন। আল্লামা হায়সামী বলেন, ইমাম তাবরানী এ হাদীসটিকে তাঁর কাবীর ও আল-মুয়জামুল আওসাত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত উভয় বর্ণনার রাবীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।[৫৬১]

একই বিষয়ে আউফ ইবনু মালিক রাদি. বর্ণিত হাদীস:

মুসনাদে বাযযার (হাদীস নং ২৭৫৩) এর মধ্যে আউফ ইবনু মালিক রাদি. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদীসের সনদের মধ্যেও ইবনু লাহীয়া রয়েছে। যার কারণে হাদীসটি দূর্বল বলে গণ্য। এছাড়াও মুসনাদে বাযযারের হাদীসটিতে ইবনু লাহীয়ার উস্তাদ শায়খ আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউমকে অধিকাংশ ইমাম দূর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। কথাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ, ইমাম আবূ দাউদ রাহ. আহমদ ইবনু সালেহ আল-মিসরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুর রহমান বিন যিয়াদ থেকে বর্ণিত হাদীস দলিলের উপযোগ্য কিনা? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। দলিল দেওয়া যাবে। তিনি নির্ভরযোগ্য। তাঁর ব্যপারে বিরূপ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব আল-মিসরী রাহ. আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউমের ছাত্র। ইয়াহিয়া ইবনু সাঈদ আল-ক্বাত্তান বলেছেন, আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম নির্ভরযোগ্য।[৫৬২]

মুসনাদে বাযযারে হযরত আবূ বকর রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসটিও (হাদীস নং ৮০) দুর্বল। কারণ এর সনদে আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল মালেক রয়েছে। ইমামুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রাহি. তাকে দূর্বল বলেছেন। তবে ইবনু আবী হাতিম আল-জারহু ওয়াত তায়দীল গ্রন্থে আবদুল মালিক ইবনু আবদুল মালিক নামক রাবীকে দুর্বল বলেন না।

[৫৬০] আল-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস- ২১৫

[৫৬১] মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস ১২৮৬০; আল-ইয়তিবার, পৃ.- ২৯

[৫৬২] আল-ইয়তিবার, পৃষ্টা- ৩৯

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহি. বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারী কাসেম যদি তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করে থাকেন তাহলে হাদীসটি হাসান (সহীহ হাদীসের একটি প্রকার) পর্যায়ের। আমরা একটু অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই যে, ইমাম বাইহাকী রাহি. শুয়াবুল ঈমান এর (হাদীস নং-৩৮২৮) মধ্যে হাদীসটির সনদের মধ্যে কাসেম তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হাদীসটি দুর্বল নয়, বরং হাসান। আল-হামদুলিল্লাহ।[৫৬৩]

একই বিষয়ে সাহাবি হরযত আবূ মূসা রাদি. বর্ণিত হাদীস:

সুনানু ইবনে মাজাহ (হাদীস নং ১৩৯০) এবং মিশকাত (হাদীস নং ১৩০৬) এর মধ্যে হযরত আবূ মূসা রাদি. থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটি দূর্বল। কারণ হচ্ছে, ইমাম ইবনে মাজাহ রাহি. এর উস্তাদ আবদুল্লাহ বিন লাহীয়া আল-হাযরামী (ইবনু লাহীয়া) দুটি সনদে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু লাহীয়া এক সনদে দাহহাক ইবনু আইমান থেকে বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন। অপর সনদে যুবাইর ইবনু সুলাইম থেকে বর্ণনার কথা বলেছেন। তিনি (ইবনু লাহীয়া) তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ফকিহ এবং হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি হাদীস মুখস্থ করা এবং বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দূর্বল ছিলেন। এ জন্য হাদীসটি দূর্বল।

একই বিষয়ে আবূ হুরাইরা রাদি. বর্ণিত হাদীস:

ইমাম হাইসামী রাহি. তাঁর সংকলিত মাজমাউয যাওয়াইদ (হাদীস নং ১২৯৫৮) এর মধ্যেও হযরত আবূ হুরাইরা থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম বাযযার রাহি. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এই হাদীসের সনদের মধ্যে হিশাম বিন আবদুর রহমান অজ্ঞাত। এজন্য সনদটি দূর্বল। তবে অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

২. আত্মহত্যাকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করা হয়:

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

---

[৫৬৩] আল-ইয়তিবার, পৃষ্টা- ৩২

يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ

আল্লাহ তাআলা মধ্য-শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু বিদ্বেষী ও আত্মহত্যাকারীকে ক্ষমা করেন না।[৫৬৪]

এই হাদীসের সনদে ইবনু লাহীয়ার দুর্বলতার কারণে এ হাদীসের দুর্বলতা স্পষ্ট।[৫৬৫] তবে শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী বলেছেন, হাদীসটি হাসান লি গাইরিহী। কারণ ইবনু লাহীয়ার উস্তাদ হুয়াই বিন আবদুল্লাহ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন রিশদীন বিন সাদ বিন হুওয়াই।

৩. হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় লিপ্ত ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করা হয়:

আবু সালাবা আল-খুশানী রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ لِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ

যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি জীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতপর তিনি মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর অমুসলিমদের বিষয়টি স্থগিত রাখেন। শত্রুতার লিপ্তদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেন শত্রুতা থেকে ফেরত আসার আগ পর্যন্ত। (এদেরকে ক্ষমা করা হয় না।)[৫৬৬]

এ হাদীসটির সনদের মধ্যে আহওয়াস নামের একজন রাবী রয়েছে। আল্লামা হাইসামী তাকে দূর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, আহওয়াস থেকে অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীসটি বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লামা আবূ হামীদ ইবনু আদী বলেন,

---

[৫৬৪] মুসনাদে আহমদ, হাদীস- ৬৬৪২

[৫৬৫] মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস- ১২৮৬১

[৫৬৬] ইমাম বাইহাকী রাহ. রচিত আস-সুনানুস সুগরা, হাদীস- ১৪৫৮

আহওয়াস থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে আবদুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ আল-মুহারিবী। অন্যান্য রাবীগণও নির্ভরযোগ্য। আবু সালাবা আল-খুশানী রাদি. বর্ণিত দূর্বল নয়।

৪. অসংখ্য-অগণিত মানুষ ক্ষমা লাভ করে মধ্য শাবানের রাতে: (ভিত্তিহীন)

হযরত আয়েশা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعرِ غَنَمِ كَلْبٍ

মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অতপর কালব (আরবের একটি) সম্প্রদায়ের মেষপালের পশমের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন।[৫৬৭]

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।[৫৬৮]

এ হাদীসটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। উভয়ে একই সনদে আহমদ ইবনু মানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াযিদ ইবনু হারূন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাজ্জাজ ইবনু আরত্বা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াহয়িয়া ইবনু আবি কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন উরওয়াহ থেকে। উরওয়াহ বর্ণনা করেছেন আয়শা রাদি. থেকে। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর এর দুর্বলতা আলোচনা করেছেন এবং ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে আরো শক্তিশালী করেছেন। তিনি বলেন-

حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة و الحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير

[৫৬৭] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস- ৭৩৯

[৫৬৮] সুনানুত তিরমিযী, হাদীস- ৭৩৯

আয়েশা রাদি. এর হাদীস হাজ্জাজের এ সনদ ব্যতীত অন্য কোনভাবে আমাদের জানা নেই। আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) এ হাদীসের দুর্বলতা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, ইয়াহয়িয়া বিন আবি কাসীর উরওয়াহ থেকে শ্রবণ করেন নি এবং হাজ্জাজও ইয়াহয়িয়া বিন আবি কাসীর থেকেও শ্রবণ করেন নি।

হযরত আয়েশা থেকে অন্য সনদে এ হাদীসের সমার্থক একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি ইবনুল জাওযী রাহি. তাঁর সনদে আতা ইবনু আজলান থেকে, তিনি ইবনু আবি মুলায়কা থেকে, তিনি আয়শা রাদি. থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী রাহি. ভিত্তিহীন বর্ণনা সমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কারণ এ সনদের রাবী আতা ইবনু আজলানকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস জালিয়াতি ও মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন, বুখারী, আবু হাতিম রাযী ও ইবনু হিব্বান সকলেই এ ব্যপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

৫. ব্যাভিচার এবং শিরক থেকে মুক্ত সকল অপরাধীকে ক্ষমা করা হয়, প্রার্থনাকারীকে দান করা হয়: (হাদীসটি দূর্বল। তবে বানোয়াট নয়।)

ওসমান ইবনু আবিল আস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إذا كانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبانَ نادَى مُنادٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ سائِلٍ فأُعْطِيَهُ فلا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئاً إِلاَّ أُعْطِيَ إِلا زَانِيَةٌ بِفَرْجِها أَوْ مُشْرِكٌ

যখন মধ্য-শাবানের রাত আসে তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান এই বলে আহ্বান করতে থাকে, কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোনো যাচনাকারী আছে কি? আমি তাকে দান করব। ব্যাভিচারিনী ও শিরকে জড়িত ব্যতীত যত লোক যা কিছু চাইবে সকলকেই তাদের প্রার্থনা পূরণ করে দেয়া হবে।[৫৬৯]

হাদীসটি দূর্বল হলেও তা অত্যন্ত দূর্বল বা বানোয়াট পর্যায়ের নয়।

[৫৬৯] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস- ৩৮৩৬

৬. পাঁচ রাতের দুআ বিফলে ফেরত দেওয়া হয় না: (হাদীসটি বানোয়াট)

হযরত আবূ উমামা রাদি. এর সূত্রে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নামে উল্লেখ আছে যে:

خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة : أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر

পাঁচ রাতের দুআ বিফল হয় না। রজব মাসের প্রথম রাত। মধ্য শাবানের রাত। জুমার রাত। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত। [৫৭০]

এই হাদীসটি ইমাম সুয়ূতী রাহি. ইবনে আসাকিরের উদ্ধৃতি দিয়ে আল-জামে আস সাগির কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সনদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া (১৮৪ হি.) বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইমাম মালিক, বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, যাহাবী, তাকে রাফেযী এবং শিয়া বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন। যে হাদীস এ ধরণের মিথ্যাবাদী এককভাবে বর্ণনা করেন, অন্য কোনো বিশ্বস্ত রাবী তা বর্ণনা না করেন, সে হাদীসটি বানোয়াট হিসেবেই বিবেচিত হয়।

একই বিষয়ে ইবনু ওমর রাদি. বর্ণিত হাদীস: (হাদীসটি বানোয়াট।)

একই বিষয়ে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (হাদীস- ৭৯২৭) এর মধ্যে ইবনু ওমর রাদি. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদীসের সনদ হল আবদুর রাজ্জাক বলেন আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, তিনি বাইলামানীকে বলতে শুনেছেন, তার পিতা বলেছেন, আমাকে ইবনু উমার বলেছেন। এখানে আবদুর রাজ্জাকের উস্তাদের পরিচয় অজ্ঞাত। অজ্ঞাত রাবীর বর্ণিত হাদীস একেবারেই দুর্বল। এরপর বাইলামানী মিথ্যা হাদীস জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম বুখারী তার হাদীসকে বানোয়াট বলেছেন। ইবনু মাঈন ও ইবনু হিব্বান তাকে (বাইলামানীকে) বানোয়াটকারী বলে উল্লেখ করেছেন।

[৫৭০] আল জামে আল সাগীর, হাদীস- ৩৯৫২

শবে বরাতের আমল:

১. গোরস্থানে যিয়ারত ও মৃতদের জন্য দুআ: (এই হাদীসটি দুর্বল)

হযরত আয়েশা রাদি. বলেন

فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ (رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ) فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُيَا رَسُولَ اللهِ انى ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ

এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজে পেলাম না। তখন বের হয়ে দেখি তিনি বাক্বীতে (আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে) রয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কি আশংকা করছিলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর অবিচার করবেন! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন। তখন তিনি বলেন, মহিমান্বিত পরাক্রান্ত আল্লাহ মধ্য শাবনের রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের মেষপালের পশমের অধিক সংখ্যককে ক্ষমা করেন।[৫৭১]

এ হাদীসটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। উভয়ে একই সনদে আহমদ ইবনু মানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াযিদ ইবনু হারূন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাজ্জাজ ইবনু আরত্বা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াহয়িয়া ইবনু আবি কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন উরওয়াহ থেকে। উরওয়াহ বর্ণনা করেছেন আয়শা রাদি. থেকে। ইমাম তিরমিযি এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর এর দুর্বলতা আলোচনা করেছেন এবং ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে আরো শক্তিশালী করেছেন। তিনি বলেন-

حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير

[৫৭১] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস- ৭৩৯; ইবনু মাজাহ, হাদীস- ১৩৮৯

আয়েশা রাদি. এর বর্ণিত এই হাদীস হাজ্জাজের এ সনদ ব্যতীত অন্য কোনভাবে আমাদের জানা নেই। আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) এ হাদীসের দুর্বলতা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, ইয়াহয়িয়া বিন আবি কাসীর উরওয়াহ থেকে শ্রবণ করেন নি এবং হাজ্জাজ ইয়াহয়িয়া বিন আবি কাসীর থেকেও শ্রবণ করেন নি।

হযরত আয়েশা থেকে অন্য সনদে এ হাদীসের সমার্থক একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি ইবনুল জাওযী রাহি. তাঁর সনদে আতা ইবনু আজলান থেকে, তিনি ইবনু আবি মুলায়কা থেকে, তিনি আয়শা রাদি. থেকে র্বণনা করেছেন। হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী রাহি. ভিত্তিহীন বর্ণনা সমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কারণ এ সনদের রাবী আতা ইবনু আজলানকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস জালিয়াতি ও মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন, বুখারী, আবু হাতিম রাযী ও ইবনু হিব্বান সকলেই এ ব্যপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

২. রাতে নফল ইবাদত এবং দিনের বেলায় সিয়াম পালন করা: (হাদীসটি অত্যন্ত দূর্বল।)

আলী রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لى فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر

যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাতে (সালাতে) দন্ডায়মান থাক এবং দিবসে সিয়াম পালন কর। কারণ; ঐ দিন সুর্যাস্তের পর মহান আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোন রিয্ক অনুসন্ধানকারী আছে কি? আমি তাকে রিয্ক প্রদান করব। কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি আছে কি? আমি তাকে মুক্ত করব। এভাবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে।[৫৭২]

[৫৭২] সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস- ১৩৮৮; কানযুল উম্মাল, হাদীস- ৩৫১৭৭

হাদীসটির সনদঃ শাবান মাসের ১৫ তারিখে সিয়াম পালন সম্পর্কিত হাদীসটি হযরত আলী রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মাজাহ এর সংকলক মুহাম্মাদ ইবনু এজিদ আল-কাজবিনী রাহ. বলেন, আমাকে আমার উস্তাদ হাসান ইবনু আলী বলেছেন, তাঁকে আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, তাঁকে ইবনু আবী সাবরাহ বলেছেন ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ থেকে। তিনি মুয়াবিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন জাফর থেকে। তিনি তাঁর পিতা থেকে। তিনি হযরত আলী ইবনু আবী তালিব রাদি. থেকে।

হাদীসের ইমামগণের মতামত:

হাদীসের ইমামগণের মত অনুযায়ী এ হাদীসটি বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। কারণ এ হাদীসটির সনদে ইবনু আবি সাবরাহ (১৬২ হি.) রাবী রয়েছেন। তাঁর বর্ণনা ছাড়া আর কোনো বর্ণনায় সিয়াম পালন করার কথা নেই। তার পূর্ণ নাম আবু বকর বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি সাব্রাহ। ইমাম আহমদ, ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী, ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম নিশাপুরী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁকে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন।[৫৭৩]

এমন বানোয়াট হাদীস দ্বারা সিয়াম পালন করা কোনোভাবেই সুন্নত প্রমাণিত হয় না। তবে আমাদের জন্য উচিত শাবান মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখ সিয়াম পালন করা। কারণ, প্রতি মাসের এই তারিখগুলোতে সিয়াম পালন করা বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

৩. রাতে দীর্ঘ সাজদার মাধ্যমে সালাত আদায় এবং সাজাদার মধ্যে দুআ: (হাদীসটি দূর্বল।)

রাতে দীর্ঘ সাজদার মাধ্যমে সালাত আদায় এবং সাজাদার মধ্যে দুআ বিষয়ক হাদীসটি ইমাম বাইহাকী রাহি. তাঁর রচিত শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন আমার উস্তাদ আবূ আবদুল্লাহ হাফিয ও মুহাম্মাদ ইবনু মূসা আমাকে বলেছেন, তাদেরকে বলেছেন আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব। তাঁদেরকে বলেছেন মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনু হাইয়ান আল-মাদায়িনী। তাঁদেরকে বলেছেন সাল্লাম ইবনু সুলায়মান।

[৫৭৩] (বিস্তারীত জানার জন্য সিয়ারু আয়লামিন নুবালা-১৩/৩৭৪)

তাঁদেরকে সালাম আত-তাবীল বলেছেন উহাইব আল-মক্কী থেকে। তিনি আবু রুহম থেকে বর্ণনা করেন। আবূ রুহ্ম বলেন, আবু সাঈদ খুদরী রাদি. আয়েশা রাদি. এর কাছে গেলেন। তখন হযরত আয়েশা রাদি. তাঁকে বলেন-

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتم أن قام فلبسهما فأخذتني غيرة شديدة فظننت أنه يأتي بعض صويحباتي فخرجت اتبعه فأدركته بالبقيع بقيع الغرقد يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء فقلت بأبي وأمي أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا فانصرفت فدخلت حجرتي ولي نفس عال ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا النفس يا عائشة ؟ فقالت بأبي وأمي أتيتني فوضعت عنك ثوبيك ثم لم تستتم أن قمت فلبستهما فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنك تأتي بعض صويحباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع قال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله بل أتاني جبريل عليه السلام فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان و لله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر قال : ثم وضع عنه ثوبيه فقال لي يا عائشة تأذنين لي في قيام هذه الليلة فقلت : نعم بأبي و أمي فقام فسجد ليلا طويلا حتى ظننت أنه قبض فقمت التمسته و وضعت يدي على باطن قدميه فتحرك ففرحت وسمعته يقول في سجوده : أعوذ بعفوك من عقابك و أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلما أصبح ذكرتهن له فقال : يا عائشة تعلمتهن ؟ فقلت : نعم فقال : تعلميهن و علميهن فإن جبريل عليه السلام علمنيهن وأمرني أن أرددهن في السجود

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর পোশাক খুললেন। কিন্তু বিলম্ব না করে আবার তা পরিধান করলেন। এতে আমার আত্মমর্যাদায় কঠিন আঘাত লাগল। কারণ আমার মনে হলো যে, তিনি আমার কোন সতীনের নিকট গমন করছেন। তখন আমি বেরিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, তিনি বাক্বী গোরস্থানে মুমিন নর-নারী ও শহীদদের গোনাহ মাফের জন্য দুআ করছেন। আমি (মনে মনে) বললাম, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবানী হউন, আপনি আপনার রবের কাজে ব্যস্ত। আমি আমার জাগতিক প্রয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। অত:পর আমি ফিরে গিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন আমার শ্বাস দীর্ঘ হচ্ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করে বললেন, আয়েশা, তুমি এভাবে হাঁপাচ্ছ কেন? আয়েশা বললেন, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবানী হউন, আপনি আমার কাছে এসে কাপড় খুলে তা আবার পরিধান করলেন। ব্যপারটি আমাকে খুব আহত করল। কারণ আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি আমার কোন সতীনের সংস্পর্শে গিয়েছেন। পরে আপনাকে বাক্বীতে দুআ করতে দেখলাম।

তিনি বললেন, হে আয়শা! তুমি কি আশংকা করেছিলে যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার উপর অবিচার করবেন? বরং আমার কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং বললেন, এ রাত্রিটি মধ্য শাবানের রাত। আল্লাহ তায়ালা এ রাতে কালব সম্প্রদায়ের মেষপালের পশমের চাইতে অধিক সংখ্যককে ক্ষমা করেন। তবে তিনি শিরকে লিপ্ত, বিদ্বেষী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, কাপড় ঝুলিয়ে (টাখনু আবৃত করে) পরিধানকারী, পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান ও মদ্যপায়ীদের প্রতি দৃষ্টি দেন না।

অত:পর তিনি কাপড় খুললেন এবং আমাকে বললেন, হে আয়শা! আমাকে কি এ রাতে ইবাদত করার অনুমতি দিবে?। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন! অবশ্যই। অতপর তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন এবং এমন দীর্ঘ সাজদা করলেন আমার মনে হলো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অত:পর আমি (অন্ধকার ঘরে) তাঁকে খুঁজলাম এবং তাঁর পদদ্বয়ের তালুতে হাত রাখলাম। তখন তিনি নড়াচড়া

করলেন। ফলে দুশ্চিন্তা মুক্ত হলাম। আমি শুনলাম, তিনি সাজদারত অবস্থায় বলছেন: আমি আপনার কাছে শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা চাই, অসন্তুষ্টির পরিবর্তে সন্তুষ্টি চাই। আপনার কাছে আপনার (আজাব ও গজব) থেকে আশ্রয় চাই। আপনি সুমহান। আপনার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারি না। আপনি তেমনই যেমন আপনি আপনার প্রসংশা করেছেন। আয়েশা রাদি. বলেন, সকালে আমি এ দুআটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, হে আয়শা, তুমি কি এগুলো শিখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, হে আয়শা! তুমি এগুলো ভাল করে শেখো এবং অন্যকে শিক্ষা দাও। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে এগুলো শিক্ষা দিয়েছেন এবং সাজদার মধ্যে বারবার পড়তে বলেছেন।[৫৭৪]

হাদীসটি দুর্বল। কারণ, এই হাদীসের সনদের মধ্যে যে সব রাবী আছেন এর মধ্যে সালাম আত-তাবীল অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী। তিনি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হাদীস রচনায় অভিযুক্ত। তাঁর দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সকল ইমাম একমত। ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন, আহমদ ইবনু হাম্বল, বুখারী, নাসায়ী ও ইবনু হিব্বান সকলেই তাঁর মিথ্যাচার ও দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি অত্যন্ত দূর্বল ও পরিত্যাহ্য। কেউ কেউ জাল এবং বানোয়াটও বলেছেন।

একই বিষয়ে হযরত আয়েশা রাদি. বর্ণিত হাদীস (এই হাদীসটি দুর্বল)

একই বিষয়ে শুয়াবুল ঈমান (হাদীস নং ৩৮৩৫) এর মধ্যে হযরত আয়েশা রাদি. থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির সনদ হল ইমাম বায়হাকী বলেন, আমাদেরকে বলেছেন আবু নসর ইবনু কাতাদাহ, তিনি আবু মানসুর মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আযহারী থেকে, ইমরান ইবনু ইদরীস থেকে, তিনি আবু উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর চাচা ইবনু ওয়াহাব থেকে, তিনি মুয়াবিয়া ইবনু সালিহ থেকে, তিনি আলা ইবনুল হারিস থেকে। তিনি আয়শা রাদি. থেকে। এখানে আলা ইবনুল হারিস হযরত আয়েশা রাদি. থেকে হাদীসটি শোনেন নি। কারণ, তিনি ১৩০ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। বেঁচে ছিলেন ৭০ বছর। তাহলে তাঁর জন্ম ৬০ হিজরিতে। কেউ

[৫৭৪] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস- ৩৮৩৭

কেউ বলেন তাঁর জন্ম ৬৬ হিজরিতে। অথচ হযরত আয়েশা ৫৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। সুতরাং আলা ইবনুল হারিস হযরত আয়েশা রাদি. থেকে হাদীসটি শোনেন নি। হয়তো অন্য কোনো মাধ্যমে হযরত আয়েশার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার নাম উল্লেখ করেন নি। অনুল্লেখিত ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা জানা না থাকার কারণে হাদীসটি দুর্বল।

একই বিষয়ে হযরত আয়েশা রাদি. বর্ণিত হাদীস

(এই হাদীসটিও দুর্বল)

একই বিষয়ে শুয়াবুল ঈমান (হাদীস নং ৩৮৩৮) এর মধ্যে হযরত আয়েশা রাদি. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির সনদ হল ইমাম বায়হাক্বী তাঁর সনদে সুলায়মান বিন আবি কারীমা থেকে, তিনি হিশাম বিন উরওয়াহ্ থেকে, তিনি তাঁর পিতা উরওয়াহ্ থেকে, তিনি আয়শা রাদি. থেকে র্বণনা করেন, তিনি বলেন- . . . . .। হাদীসটির সনদে সুলাইমান বিন আবী কারিমা এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী। আবু হাতিম রাযি. তাঁকে দুর্বল হিসেবে নিশ্চিত করেছেন। ইবনু আদী বলেনঃ তাঁর বর্ণিত হাদীস সমূহ অধিকাংশই পরিত্যাহ্য। এ কারণেই ইবনুল জাওযী এ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন ও পরিত্যাহ্য হাদীস সমূহের মধ্যে গণনা করেছেন।

নোটঃ মধ্য শাবানের রাত সম্পর্কিত হযরত আয়েশা রাদি. থেকে পাঁচটি সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসের সমর্থনে ভিন্ন হাদীস থাকার কারণে দীর্ঘ সাজাদায় সালাত আদায় এবং মুমিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়টি প্রমাণিত এবং কিছুটা গ্রহণযোগ্য হলেও মানুষের ভাগ্য, রিজিক এবং হায়াত মউত এবং শুধু ১৫ তারিখে সিয়াম পালন সম্পর্কিত হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. মধ্য শাবানের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা: (হাদীসটি বানোয়াট)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيِ الْعِيْدِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ

যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত এবং মধ্য শাবানের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তরের মৃত্যু হবে না যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে।[৫৭৫]

এ হাদীসের বর্ণনাকারী ঈসা ইবনু ইবরাহীম ইবনু তাহমান বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সুপরিচিত। ইমাম বুখারী, নাসায়ী, ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন ও আবু হাতিম রাযি ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে তাকে পরিত্যক্ত ও মিথ্যাবাদি রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ের রাবী কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত হাদীস ভিত্তিহীন বা বানোয়াট হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া ঈসার উস্তাদ সালামা বিন সুলাইমান দুর্বল রাবী। আর ঈসার উস্তাদের উস্তাদ মারওয়ান বিন সালিম মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। এধরণের হাদীস বানোয়াট বলে বিবেচিত হয়।

শবে বরাতের সালাতের নিয়্যত:

সালাতের নিয়্যত সম্পর্কে আমাদের বইয়ের মধ্যে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আলোচনাটি সহজে বের করার জন্য বইয়ের সূচী থেকে দেখে নেওয়া ভালো। তবে শবে বরাতে নফল সালাত আদায়ের পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস নেই।

মধ্য শাবানের রাতের সালাতের নিয়ম, সময় এবং রাকাত সংখ্যা:

এখানে একটি কথা লক্ষণীয় যে, মধ্য শাবানের রাত সম্পর্কে যে সব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব হাদীসের কোনো একটি হাদীসের মধ্যেও সালাতের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের কথাও বলা হয় নি। কোন কোন সূরা পড়তে হবে এবং কতবার পড়তে হবে তাও উল্লেখ নেই সেসব হাদীসের মধ্যে। মধ্য শাবানের রাতে কেউ যদি সালাত পড়তে চায়, তাহলে অন্যান্য নফল বা তাহাজ্জুদ সালাত পড়ার নিয়মেই পড়বে। সন্ধার পর থেকে সাহরীর শেষ সময় পর্যন্ত যে কোন নফল সালাত পড়া যায়। তবে বছরের যে কোন রাতের আনুমানিক ১০/১১ পর যত সালাত পড়া হবে সবই তাহাজ্জুদ

[৫৭৫] আবূ নুয়াইম ইস্পাহানী (রাহি.) রচিত মারেফাতুস সাহাবা, হাদীস- ৫৩৩৩

হিসেবে গণ্য হবে। তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া বেশি সওয়াব এবং উত্তম ও বরকতময়। আমাদের দেশে মকসুদুল মুমিন বা বাজারে আরো কিছু ছোট ছোট বইয়ে মধ্য শাবানের রাতের সালাতের কিছু নিয়ম লেখা আছে। যা সম্পূর্ণ বানোয়াট। এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কারণ এসব কুরআন-হাদীসে নেই। আমাদের দেশে যে সব বক্তা বা আলোচক মধ্য শাবানের রাতে সালাতের রাকাত এবং সালাত আদায়ের পদ্ধতি বলেন তা কোনো হাদীসে নেই। নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পাঠ করার অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই বানোয়াট এবং রম্য গল্পকার ওয়ায়েযদের মস্তিস্কপ্রসূত কথা। তবে রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে নিয়ম হলো, যে যতটুকু পড়তে চায় সে ততটুকু পড়বে। অন্যান্য সুন্নত বা নফল সালাত যেভাবে পড়া হয় সেভাবে পড়বে। এটাই আসল নিয়ম। আমরা নফল সালাতের নিয়ম সম্পর্কে বিভিন্ন সালাতের শিরোনামে আলোচনা করেছি। সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি।

মধ্য শাবানের রাতে কাঙ্খিত ফলাফল লাভের পূর্বশর্ত

আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে অনেক লোক এমন আছেন, যারা আমল করেন কিন্তু কবুল হয় না। তখন সে বলে আমি অনেক আমল করেছি কিন্তু আমার আমল তো কবুল হয় না, এই জন্য এখন আর আমল করি না। আসলে কেন কবুল হয় না সেটা তার জানা নেই। এ জন্যই সে এমন ভুল মন্তব্য করে থাকে। যেন কোনো মুসলিম এমন ভুল না করেন সে জন্য এখানে আমল কবুল না হওয়ার অনেক গোপন রহস্য থেকে আমরা কয়েকটি রহস্যের কথা মধ্য শাবানের রাতে কাঙ্খিত ফলাফল লাভের পূর্বশর্ত শিরোনামে উল্লেখ করছি। যেমন-

(১) বিশুদ্ধ ঈমান:

শির্‌ক ও কুফর মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত। শিরক করলে অন্যান্য আমলও বাতিল হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

তুমি যদি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৫৭৬]

আমরা 'মধ্য শাবানের রজনীতেও যারা মুক্তি পাবে না' শিরোনামের আলোচনাতে দেখেছি যে মুশরিকসহ আরও অনেক শ্রেণির মানুষকে ক্ষমা করা হবে না। এর কারণ হচ্ছে শিরকে লিপ্ত হওয়া। এ জন্য মধ্য শাবানের রাতে কাঙ্খিত ফলাফল লাভের পূর্বশর্ত হল ঈমান বিশুদ্ধ করতে হবে। শিরক থেকে পবিত্র থাকতে হবে।

(২) ইবাদত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া:

প্রতিটি ইবাদত পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে সে ইবাদত মহান আল্লাহর কাছে কোনোভাবেই কবুল হবে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ () الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ () الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ()

বড় দুঃখ আছে সেই নামাযীদের যারা তাদের সালাতে গাফলতি করে। যারা মানুষকে দেখায়।[৫৭৭]

আয়াতে ঐ সমস্ত মানুষের শাস্তির কথা বলা হয়েছে যারা সালাত (নামায) পড়ে মানুষকে দেখানোর জন্য। যা মূলত আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নয়। এ জন্য মধ্য শাবানের রাতে কাঙ্খিত ফলাফল লাভের শর্ত হল ইবাদত করতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

(৩) সুন্নাতের অনুসরণ:

মুমিনের প্রতিটি আমল অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বা আদর্শের আলোকে পালন করতে হবে। তাঁর সুন্নাত বা আদর্শের আলোকে আমল না করে ভিন্ন পদ্ধতিতে পৃথিবী সমপরিমাণ ইখলাস থাকলেও তা মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

[৫৭৬] সূরা যুমার, আয়াত- ৬৫

[৫৭৭] সূরা মাউন, আয়াত- ৪, ৫, ৬

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

(হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন) অবশ্যই এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ কর। অন্য কোনো পথের অনুসরণ করো না। অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[৫৭৮]

এ জন্য মধ্য শাবানের রাতে কাঙ্খিত ফলাফল লাভের শর্ত হল আমল করতে হবে সুন্নাহর আলোকে। নবীজির পদ্ধতিতে।

(৪) হালাল ভক্ষণ করা হারাম বর্জন করা:

ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল জীবিকা নির্ভর হতে হবে। হারাম ভক্ষণকারীর ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। এই জন্য মহান আল্লাহ তাঁর সকল রাসূলগণের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন হালাল পানাহার করার জন্য।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সমূহ হতে (যা ইচ্ছা) খাও এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আমি সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।[৫৭৯]

আবু হুরাইরা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; হে মানুষেরা, আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র (বৈধ) ছাড়া কোনো কিছুই কবুল করেন না। আল্লাহ মুমিনগণকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি নবী ও রসূলগণকে দিয়েছেন। তিনি নবী-রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর তা আমি জানি। আর মহান আল্লাহ মুমিনগণকে একই নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদের যে রিযিক প্রদান করেছি তা থেকে পবিত্র রিযিক ভক্ষণ কর। এরপর তিনি একজন মানুষের কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি (হজ্জ, উমরা ইত্যাদি পালনের জন্য আল্লাহর পথে) দীর্ঘ সফরে থাকে ধূলি ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুল, তার হাত দুটি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দুআ

[৫৭৮] সূরা আনয়াম, আয়াত- ১৫৩

[৫৭৯] সূরা মুমিনুন ২৩/৫১

করতে থাকে, আর বলে: হে প্রভু! হে প্রভু!! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং হারাম উপার্জনের জীবিকাতেই তার রক্তমাংস গড়ে উঠেছে। তাহলে এমন ব্যক্তির দুআ কিভাবে কবুল হবে?।[৫৮০]

প্রিয় পাঠক! মানুষের খাদ্য এবং পানীয় যেমন করে শরীর গঠনে ভূমিকা রাখে তেমনি আত্মার উপরও খাদ্য এবং পানীয় যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। খারাপ ও পঁচা খাবার যেমন শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনি অবৈধ বা হারাম পদ্ধতিতে উপার্জিত সম্পদ মানুষের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুতরাং সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি, অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ দখল, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাত প্রভৃতি অবৈধ পদ্ধতিতে উপার্জিত খাবার খেয়ে বা পোশাক পড়ে আমল বা দুআ করলে তা কবুল করা হবে না। আমরা দেখছি যে, এ ব্যক্তি দুআ কবুল হওয়ার অনেকগুলো আদব রক্ষা করেছে, যেমন; সে মুসাফির অবস্থায় দুআ করেছে, সে ধূলি ধূসরিত ও অসহায় অবস্থায় দুআ করেছে এবং বিনয় আকুতি সহকারে দুআ করেছে। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দুআ করেছে। এগুলো দুআর গুরুত্বপূর্ণ আদব। সুতরাং তার দুআ কবুল হওয়ার কথা। কিন্তু তারপরও তার দুআ কবুল হয় নি, কারণ তার জীবিকা হারাম উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দুআ বা আমল কবুল না হওয়ার জন্য এটি একটি গোপন রহস্য।[৫৮১] এ জন্য মধ্য শাবানের রাতে কাঙ্খিত ফলাফল লাভের শর্ত হল হালাল ভক্ষণ করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা।

(৬) অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখা:

প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো তার অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখা। হিংসা-বিদ্বেষ গুরুতর অপরাধ। একটি ধ্বংসাত্মক অন্যায়। ভয়াবহ পাপ। এই পাপ অন্যান্য নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয় এবং মহান আল্লাহর নিকট থেকে সাধারণ ক্ষমা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ কতটা ভয়াবহ অপরাধ তা আমরা উপরের বিভিন্ন হাদীস থেকে কিছুটা বুঝতে পেরেছি।

---

[৫৮০] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ২৩৯৩

[৫৮১] রাহে বেলায়াত, পৃ.- ১১১

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا أَوِ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا

মানুষের আমলকে প্রতি সপ্তাহে দুইবার (মহান আল্লাহর) কাছে পেশ করা হয়। প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবারে। তখন প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু ঐ বান্দাকে ক্ষমা করা হয় না যার সাথে তার ভাইয়ের হিংসা-বিদ্বেষ আছে। হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীদের ব্যপারে বলা হয় যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত হিংসা-বিদ্বেষ থেকে ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে বাদ দাও।[৫৮২]

এ জন্য মধ্য শাবানের রাতে কাঙ্খিত ফলাফল লাভের শর্ত হল অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

মধ্য শাবানের রজনীতেও যারা মুক্তি পাবে না:

হাদীসের ভাষ্যমতে শবে বরাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদার রাত। প্রত্যেক রাতেই মহান আল্লাহ মানুষের গুনাহ ক্ষমা করেন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। এ রাতেও মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভ করে। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছে যারা এই রজনীতেও মুক্তি পাবে না। হাদীসে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তারা হচ্ছে-

১. মুশরিক (শিরকে লিপ্ত), ২. হিংসুক, ৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, ৪. টাখনুর নিচে লুঙ্গী, পায়জামা বা প্যান্ট পরিধানকারী (পুরুষ)। ৫. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। ৬. মদ্যপায়ী।

এ সম্পর্কে শবে বরাতের আমল শিরোনামের অধীনে হযরত আয়েশা রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। একই বিষয়ে মুসনাদে হারিসের মধ্যে (হাদীস নং ৩৩৫) কাসীর ইবনু মুররা থেকে মুরসাল হিসেবে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। কাসীর ইবনু মুররা একজন তাবেয়ী ছিলেন।

---

[৫৮২] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৬৭১২

৭. ব্যাভিচারিনীকে ক্ষমা করা হয় না:

ওসমান ইবনু আবিল আস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

هَلْ مِنْ سائِلٍ فأُعْطِيَهُ فلا يَسْأَلُ أحَدٌ شَيْئاً إلاَّ أُعْطِيَ إلا زَانِيَةٌ بِفَرْجِها أوْ مُشْرِكٌ

যখন মধ্য-শাবানের রাত আসে তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান এই বলে আহ্বান করতে থাকে, কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোনো যাচনাকারী আছে কি? আমি তাকে দান করব। ব্যাভিচারিনী ও শিরকে জড়িত ব্যতীত যত লোক যা কিছু চাইবে সকলকেই তাদের প্রার্থনা পূরণ করে দেয়া হবে।[৫৮৩]

হাদীসটি দূর্বল হলেও তা অত্যন্ত দূর্বল বা বানোয়াট পর্যায়ের নয়।

৮. আত্মহত্যাকারীকে ক্ষমা করা হয় না:

হাদীসে এসেছে-

يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ

মধ্য শাবানের রাতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অত:পর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে করেন। কিন্তু দুই শ্রেণির মানুষকে ক্ষমা করেন না। হিংসুক এবং আত্মহত্যাকারী।[৫৮৪]

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্মল রাহি. এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর বলেছেন হাদীসটি সহীহ। এই হাদীসের সনদে ইবনু লাহীয়া নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। কিন্তু এই হাদীসের সমর্থক আরও হাদীস রয়েছে।

উপরের হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে এ রাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রমানিত হয়েছে। এ রাত্রে মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদের ক্ষমা করার বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। যাদেরকে ক্ষমা করা হবে না তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যদি কেউ আন্তরিকভাবে তাওবা করেন তাহলে মহান আলাহ রাব্বুল আলামীন তাকেও ক্ষমা করে দিবেন।

[৫৮৩] শুয়াবুল ঈমান, হাদীস- ৩৮৩৬

[৫৮৪] (মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদীস- ৬৬৪২)

বিদআত থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য কর্তব্য:

শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সব সময় প্রানান্তকর প্রচেষ্টা করছে। মানুষকে হিদায়াত থেকে দূরে সরিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত করার জন্য সে তার পূর্ণ শক্তি ব্যয় করছে। শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সবচেয়ে বড় সিস্টেম হল সে মানুষকে সওয়াবের প্রলোভন দিয়ে বিদআতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। কোন মানুষ যেন সেই শয়তানের ধোকায় না পড়ে সে জন্য মহান আলাহ রাব্বুল আলামীন শয়তানের গভীর চক্রান্তের কথা কুরআনে সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন-

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

(শয়তান বলল) আমি মানুষের কাছে আসব, তাদের সম্মুখ এবং পেছন দিক থেকে, ডান এবং বাম দিক থেকে। (তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য।)[৫৮৫]

পবিত্র শবে বরাতেও শয়তান বসে নেই। সে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে। মানুষকে নেক আমলের নামে বিদআত ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত করছে। নিম্নে কয়েকটি বিদআত ও কুসংস্কারের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

১. আতশবাজী:

অনেকে আতশবাজীকে নেক আমল মনে করে থাকে। আতশবাজীতে সওয়াব হবে দূরের কথা এতে অনেক গুনাহ হবে। কারণ-

ক. আতশবাজীতে অর্থের অপচয় হয়। পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে অপচয়কারী শয়তানের ভাই।[৫৮৬]

খ. আতশবাজীতে অহেতুকভাবে আমাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। সময়ের অপব্যয় অবশ্যই গুনাহর কাজ। অপব্যয় করা যে শয়তানে কাজ সেটা তো আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

গ. আতশবাজীর কারণে সমাজের সুস্থ-অসুস্থ সকল মানুষ ভোগান্তির স্বীকার হন। কারণ আতশবাজীর প্রচন্ড আওয়াজে সুস্থ মানুষ উদ্বিগ্ন

[৫৮৫] সূরা আল-আরাফ, আয়াত-১৭

[৫৮৬] সূরা রূম, আয়াত-৪১

থাকেন। এছাড়া অসুস্থ মানুষ মানষিকভাবে চরম কষ্ট পেয়ে থাকেন। আর আমরা একথাও জানি, যে কাজের দ্বারা অন্যরা কষ্ট পায় তা ইসলামে অনুমোদন নেই।

ঘ. আতশবাজী ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। যে সব দ্বীনদার মানুষ এ রাতে নিরিবিলি ইবাদত করতে চায়, তারা নিরিবিলি ইবাদত করতে পারে না। মনোযোগ সহকারে প্রভুর প্রেমে সাড়া দিতে পারে না। সুতরাং আতশবাজী সমাজ, দেশ এবং ইসলামের ক্ষতি করে। এসব ক্ষতি থেকে নিজে বাঁচানো এবং অন্যকে বাঁচানো আমাদেরই দায়িত্ব।

২. আলোকসজ্জা:

আমাদের বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকাতে মধ্য শাবানের রাত উপলক্ষে মসজিদ, কবরস্থান ও বাসা-বাড়ী, দোকানপাট আলোকসজ্জা করা হয়ে থাকে। এটা মোটেও ঠিক না। কারণ, এর দ্বারা যেমনভাবে অর্থের অপচয় হয়, তেমনিভাবে বিজাতীয়দের কালচারের অনুসরন হয়। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব মিশকাত শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী রাহি. লিখেছেন- আলোকসজ্জার প্রচলনটি প্রথম বারামিকা জাতি থেকে শুরু হয়েছে। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও খৃষ্ট ধর্মের আলোকসজ্জার প্রথা বাদ দেয় নি।[৫৮৭]

এখান থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, খৃষ্টানরা সরাসরি আগুনের পুজাঁ করে। আর তারা মুসলমানদেরকে আলোকসজ্জার নামে পরোক্ষভাবে আগুনের পুজাঁয় লিপ্ত করেছে। যারা আগুনের পুজাঁ করে তারা যেমন জাহান্নাম থেকে বাচঁতে পারবে না। তেমনিভাবে যারা আলোকসজ্জার নামে পরোক্ষভাবে আগুনের পুজাঁ করে তারাও জাহান্নাম থেকে সহজে বাচাঁর কথা নয়। সুতরাং মসজিদ, কবরস্থান, দোকানপাট এবং বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা করার নিগূঢ় রহস্য জানার পর আমাদের জন্য উচিত হচ্ছে এ সব বিদআত এবং কুসংস্কার থেকে নিজেরা বেচেঁ থাকা এবং আমাদের মুসলমান ভাই-বোনদেরকে বাচাঁনোর জন্য সর্বাত্তক প্রচেষ্টা করা।

[৫৮৭] মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/১৯৮

৩. হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি বিতরণ:

আমাদের সমাজে কিছু মুসলমান এ কথা মনে করে যে, হালুয়া-রুটি ছাড়া শবে বরাত পালন করা হয় না। আমাদের দেশে কিছু অজ্ঞ, মুর্খ লোকেরা বলে থাকে যে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি হালুয়া খেয়েছিলেন। এ জন্য শবে বরাতে হালুয়া বানিয়ে খেতে হয়। এই তথ্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে চরম মিথ্যা কথা। কারণ, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসে। আর শবে বরাত হল শাবান মাসে। এ সব মিথ্যা এবং বিদআত বাদ দিয়ে সুন্নাহর আলোকে জীবন সাজাতে হবে। আর মনে রাখতে হবে পূন্যময় রজনীতে হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি বিতরণের কাজে লাগিয়ে মুসলমানদেরকে ইবাদত থেকে দূরে রাখাই হলো শয়তানের রহস্যজনক ষড়যন্ত্র।

৪. সন্ধার পর গোসল অত্যাবশ্যক মনে করা:

আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে সন্ধার পর গোসল করার কথাটি। অথচ মধ্য শাবানের রাতে সন্ধার পর ইবাদতের নিয়তে গোসল করা বিদআত। অনেকে মনে করে 'যে ব্যক্তি শবে বরাতে সন্ধার পর ইবাদতের নিয়তে গোসল করে তাকে গোসলের পানির প্রতিটা ফোঁটার বিনিময়ে সাতাশ রাকাত নফল নামাযের সওয়াব দেওয়া হয়।' এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল কোনো কোনো ছোট-ছোট পুস্তকে গোসলের ফযিলত উল্লেখ করা থাকে। লেখা থাকে 'যে ব্যক্তি শবে বরাতে এবাদতের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় গোসল করবে, তার গোসলের পানির প্রতিটি ফোটা পানির পরিবর্তে তার আমল নামায় ৭০০ (সাতশত) রাকাত নফল নামাযের ছওয়াব লিখে দেওয়া হইবে। গোসল করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামায পড়িবে।' এমন কথা কুরআন-হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই। এটিও একটি ভিত্তিহীন ও মনগড়া কথা। তবে কেউ যদি শারীরিক পবিত্রতার সন্দেহ করে, তাহলে গোসল করলে কোন অসুবিধা নেই। এছাড়া গোসল করাকে অত্যাবশ্যক কিংবা ইবাদতের অংশ মনে করলে গুনাহ হবে।

অতএব গুরুপূর্ণ রাতকে মূল্যায়ন করা উচিত। বিশেষ করে আমাদের সমাজে নেক আমলের নামে যে সব বিদআত আছে তা থেকে দূরে থাকা

উচিত। কখনো যেন আতশবাজী, আলোকসজ্জার নামে আগুন পুজাঁ, হালুয়া-রুটি ইত্যাদি বিদআত ও কুসংস্কার না করি সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সব বিদআত বাদ দিয়ে কুরআন-হাদীসের আলোকে নিজেদের ঈমান-আমলের জন্য মেহনত করব। তবেই মধ্য শাবানের রাতের সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

শবে বরাত সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর এবং হাদীসের নামে বানোয়াট কথা:

১. প্রশ্ন: আমাদের দেশে কোনো কোনো ছোট ছোট লিফলেট এবং পুস্তিকাতে মধ্য শাবানের রাতে ৩০০ রাকাত সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে প্রতি রাকআতে ৩০ বার সূরা ইখলাস পড়ার জন্য। এই আমলের ফযিলত বলা হয়েছে যে ব্যক্তি এভাবে সালাত আদায় করবে সে এমন ১০ ব্যক্তির ব্যপারে তার সুপারিশ কবুল করা হবে যাদের জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত। এখন জানার বিষয় হল, এমন কথা কী সঠিক?

উত্তর: (ক) এমন কথা হাদীসের নামে বলা হয়। কিন্তু তা সঠিক নয়। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম রাহি. এটিকে বাতিল বা ভিত্তিহীন হাদীস সমূহের তালিকাতে উল্লেখ করেছেন। এমন কথার কোনো দলিল-প্রমাণ নেই।

(খ) প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সালাত আদায় করলে প্রতি রাকআতে দুই মিনিট সময় লাগবে। তাহলে ৩০০ রাকাত সালাত আদায় করতে মোট সময় লাগবে ৬০০ মিনিট বা দশ ঘন্টা। এবার একটু সহজে হিসাব করলে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি এশার সালাতের পর রাত ৮/৯ টার সময় সালাত শুরু করেন, তাহলে এই পদ্ধতির সালাত শেষ করতে সকাল ৬/৭ টার সময় শেষ হবে। যা ফজরের সালাতের আরও প্রায় দেড়-দুই ঘন্টার পর সালাত শেষ হবে। যা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। তাহলে এমন কথা যে অবাস্তব এবং অবান্তর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুস্থ বিবেকের কোনো মানুষ হাদীসের নামে এমন মিথ্যা কথা বিশ্বাস করতে পারে না।

২. প্রশ্ন: আমাদের সমাজে এমন কথাও প্রচলিত আছে যে, যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকাত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা ও ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে সে উক্ত রাতে যত প্রয়োজনের কথা বলবে আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। লাওহে মাহফুজে তাকে দুর্ভাগা লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরির্বতন করে সৌভাগ্যবান হিসেবে তার নিয়তি নির্ধারণ করা হবে। আল্লাহ তার কাছে ৭০ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা তার পাপ মুছে দেবেন। বছরের শেষ পর্যন্ত তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখবেন। এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা আদন জান্নাতে ৭০ হাজার বা ৭ লক্ষ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করবেন এবং তার জন্য বৃক্ষরাজি রোপন করবেন ...। যে ব্যক্তি এ সালাত আদায় করবে এবং পরকালের শান্তি কামনা করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য তার অংশ প্রদান করবেন। এখন জানার বিষয় হল, এমন কথা কী সঠিক?

উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতির সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু হয় হিজরি চতুর্থ শতকের পরে। ধীরে ধীরে তা মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মূলত ৪৪৮ হিজরি সনে প্রথম ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে শাবানের রাত্রিতে এই পদ্ধতির সালাত আদায় করা হয়। এ সম্পর্কিত (১০০ রাকাত সম্পর্কিত) আরও কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। কেউ যদি এমন আমলের কথা বলে তাহলে তার কাছে হাদীসের প্রমাণ চাওয়া উচিত। কিয়ামত পর্যন্ত এমন হাদীস দেখাতে কেউ পারবে না।

৩. প্রশ্ন: যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ৫০ রাকাত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে যত প্রকার প্রয়োজনের কথা বলবে তার সবই পূরণ করে দেয়া হবে। এমনকি লাওহে মাহফুজে তাকে দুর্ভাগ্যবান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে তাকে সৌভাগ্যবান করা হবে এবং আল্লাহ তাআলা তার কাছে ৭ লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার নেকী লিপিবদ্ধ করবে, অপর ৭ লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ করবে ..... এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করে এমন ৭০ হাজার মানুষের জন্য তার সুপারিশ গ্রহন করা হবে ...। এটি কী সত্য?

উত্তর: ইমাম যাহাবী রাহি. বলেন, এই কথাটি জাল। তিনি আরও বলেন যে ব্যক্তি এ হাদীসটি বানিয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাকে লাঞ্ছিত করুন। এমন কথা কোনো হাদীসে নেই। আজ থেকে যারা এমন কথা বলবে তাদের কাছে হাদীসের রেফারেন্স চাওয়া উচিত। কিয়ামত পর্যন্ত এমন হাদীস দেখাতে কেউ পারবে না।

৪. প্রশ্ন: কোন কোন মানুষের মুখ থেকে শোনা যায় যে হযরত আলী রাদি. থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন: আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্য-শাবানের রাতে ১৪ রাকাত সালাত আদায় করেছেন। তিনি সালাত শেষ করে বসে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস প্রত্যেকটি ১৪ বার করে তিলাওয়াত করেছেন। তারপর তিনি একবার আয়াতুল কুরসী এবং সূরা তাওবার শেষের দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। আমি (আলী) তাঁকে এই আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তুমি আমাকে যেভাবে এই আমল করতে দেখেছ ঠিক সেভাবেই যে এই আমলগুলো করবে তাকে ২০টি কবুল হজ্বের সওয়াব দেওয়া হবে। ২০ বছরের কবুল সিয়াম পালনের সওয়াব দেওয়া হবে। আর যদি সে পরদিন সিয়াম পালন করে তাহলে তাকে দুই বছরের সিয়াম পালনের সওয়াব দেওয়া হবে।' এখন জানার বিষয় হল, এটি নাকি ইমাম বাইহাকী তার কিতাবের উল্লেখ করেছেন? এমন কথা কতটুকু সত্য? হাদীসে থাকলে রেফারেন্সসহ জানাবেন।

উত্তর: এই হাদীসটি ইমাম বাইহাকী রাহি. তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এ কথাও বলেছেন: ইমাম আহমদ রাহি. বলেছেন যে, এই হাদীসটি আপত্তিকর, বানোয়াট ও জাল বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লামা ইবনুল জাওযী এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহি. বলেন: হাদীসটি বানোয়াট। এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইমাম আহমদ রাহি. বলেন: এর সনদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মুহাজির রয়েছেন। তিনি হাদীস বানোয়াটকারী। সুতরাং এমন জাল এবং বানোয়াট হাদীস দিয়ে দলিল-প্রমাণ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৫. প্রশ্ন: অনেকের মুখে এ কথাও শুনা যায় যে, শবে বরাতে চার রাকাত করে মোট আট রাকাত নামায পড়তে হয়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কদর (ইন্না আংযালনা) একবার এবং সূরা ইখলাস পচিঁশবার

পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে সালাত আদায় করবে তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং সে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। এমন কথা কুরআন-হাদীসে কোথাও আছে কী?

উত্তর: এমন কথা অবশ্যই ভ্রান্ত এবং মনগড়া কথা।। এ ধরণের কথা কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই। এ সব বানোয়াট কথা। কারণ, এগুলোর পক্ষে কুরআন-হাদীসের কোন দলিল-প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না। সুতরাং যারা এমন কথা বিশ্বাস করে তাদের গুনাহ হবে। তাদেরকে ভালকরে মনে রাখা উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আমি যা বলিনি (অর্থাৎ যা হাদীস নয়) তা যদি আমার নামে কেউ প্রচার করে তাহলে সে যেন জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করে নেয়।[৫৮৮]

সুতরাং আপনার শোনা কথাটি সঠিক নয়।

৬. প্রশ্ন: পাঁচটি রাত্রি ইবাদতে জেগে থাকার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

উত্তর: এ সম্পর্কিত একটি বানোয়াট হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা প্রথমে হাদীসটি উল্লেখ করব তারপর হাদীসটির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করব। হাদীসটি মুয়ায ইবনু জাবাল রাদি. -এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ : لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَلَيْلَةَ النَّحْرِ، وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

যে ব্যক্তি পাঁচ রাত (ইবাদতে) জাগ্রত থাকবে তার জন্য জান্নাত পাওয়া অবধারিত হবে: ১. যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত্রি, ২. যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের (আরাফার) রাত্রি, ৩. যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখের (ঈদুল আযহার) রাত্রি, ৪. ঈদুল ফিতরের রাত্রি ও ৫. মধ্য শাবানের রাত্রি।

[৫৮৮] সহীহ বুখারী, হাদীস- ১২৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৪; আবু দাউদ, হাদীস- ৩৬৫৩

সূরা দুখানের প্রথম চারটি আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বয়ানেও হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে। তবে হাদীসটি মাওযূ বা জাল। কারণ হাদীসটির সনদের মধ্যে আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আলআম্মী (১৮৪ হি.) রয়েছেন। তিনি জাল-হাদীস বর্ণনাকারী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম বুখারী, নাসাঈ, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আহমদ ইবনু হাম্বাল, আবূ দাউদ ব্যক্তির মিথ্যাবাদিতার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এজন্য এ হাদীসটি মাওযূ বা জাল হাদীস বলে গণ্য।

৭. প্রশ্ন: মধ্য শাবানের রাত্রিতে রহমতের ৩০০ দরজাগুলো খোলা হয়। এটি কী হাদীস?

উত্তর: উবাই ইবনু কাব রাদি. এর সূত্রে কথিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

اِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَنِىْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ : ثُمَّ فَصَلِّ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَيَدَيْكَ اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ثَلَاثُ مِاَةِ بَابٍ ..... فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ اِلَى بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَبَيْنَا هُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ ..... فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام ..... فقال يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ اِلَى السَّماء فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ مَفْتُوْحَةٌ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكٌ يُنَادِىْ طُوْبَى لِمَنْ سَجَدَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ

মধ্য শাবানের রাত্রে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আগমন করে বলেন, আপনি দাঁড়িয়ে সালাত পড়ুন এবং আপনার মাথা ও হস্তদ্বয় উপরে উঠান। আমি বললাম, হে জিবরাঈল, এটি কোন রাত? তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ, এ রাতে আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং রহমতের ৩০০ দরজা খুলে দেওয়া হয়। ... তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকী গোরস্থানে গমন করেন। তিনি যখন সেখানে সাজদারত অবস্থায় দুআ করছিলেন, তখন জিবরাঈল সেখানে অবতরণ করে বলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি আকাশের দিকে মাথা তুলুন। তিনি তখন তাঁর মস্তক উত্তোলন করে দেখেন যে, রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক দরজায় একজন ফিরিশতা ডেকে বলছেন, এই রাত্রিতে যে সাজদা করে তার জন্য মহা সুসংবাদ...।

হাদীসটি উল্লেখ করে আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ইরাক আল-কিনানী (৯৬৩ হি.) বলেন, এ হাদীসটি একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সে সূত্রে উল্লেখিত বর্ণনাকারীগণ সকলেই অজ্ঞাত পরিচয়। ফলে হাদীসটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। আশা করি বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

৮. প্রশ্ন: মধ্য শাবানের রাতের ইবাদত চারশত বছরের ইবাদতের সমান। এই মর্মে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত যে ঘটনা সমাজে প্রচারিত আছে তা কী সত্য?

উত্তর: এই মর্মে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত একটি ঘটনা কালইউবী কিতাবে বর্ণিত আছে। ঘটনা হচ্ছে, একদা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ভ্রমণে বের হলেন। তিনি এক সুউচ্চ পাহাড় দেখতে পেয়ে সেদিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ করে পাহাড়ের চূড়ায় একটি শক্ত পাথর তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। যা দুধের চেয়েও শুভ্র-স্বচ্ছ। তার চারপাশে তিনি হাঁটতে লাগলেন এবং তার সৌন্দর্যে অভিভূত হতে লাগলেন। আল্লাহপাক তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, হে ঈসা! তুমি যা দেখছো এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয় আমি তোমার সামনে প্রকাশ করবো। তুমি কী তা পছন্দ করো? ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন: হ্যাঁ, হে আমার প্রভু! আপনি তা করুন। পাথরটি তখন ফেটে গেলো। তিনি তার মধ্যে একজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তার পরনে রয়েছে পশমি জুব্বা। তার হাতে একটি সবুজ ছড়ি। তার দুচোখের সামনে রয়েছে আঙ্গুর। আর সে বুযুর্গ দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অনেক বিস্মিত হয়ে বললেন: হে শায়খ! আমি একি দেখছি? শায়খ বললেন: এটা আমার দৈনন্দিনের রিযিক। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন: আপনি কত দিন পর্যন্ত এই পাথরের মধ্যে উপাসনায় রয়েছেন? তিনি বললেন, চারশ বছর ধরে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলে উঠলেন, হে আমার মাবুদ! হে আমার প্রভু! আমি বলতে পারি না যে, আপনি এর চেয়ে কোনো উত্তম মাখলুক আর সৃষ্টি করেছেন কিনা? আল্লাহ ওহী পাঠালেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের যে কেউ শাবান মাস পায় আর সে উক্ত মাসের ১৫ তারিখের রজনীতে ইবাদত করে তা আমার নিকট চারশত বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এ কথা শোনে

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন: হায়! যদি আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হতাম।[৫৮৯]

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! যেই কালয়ূবী কিতাবে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে সেই কিতাবটি আমাদের বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার অষ্টম/নবম শ্রেণির সিলেবাসের পাঠ্য কিতাব। মূলত কিতাবটি থেকে কোনো হাদীস বা ইতিহাস শেখানোর উদ্দেশ্যে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। বরং এই কিতাবটি থেকে আরবি সাহিত্য শেখানো মূল উদ্দেশ্য। কিতাবটিতে এমন আরও কিছু ইসরায়েলী বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। যা সাধারণত বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাল এবং ভিত্তিহীন। সুতরাং এ সব কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আমল করার সুযোগ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমলযোগ্য হাদীস সমর্থিত না হবে। তবে উত্তম হচ্ছে এ সব কিতাবের পরিবর্তে আরও উন্নত সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য সেগুলো সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে কুরআন-হাদীসের সাহিত্য শেখার সহায়ক গ্রন্থ বেশি উত্তম।

৯. প্রশ্ন: আমরা শুনেছি হাদীসের মধ্যে মধ্য শাবানের রাত্রিতে চলতি বছরে জন্ম-গ্রহণকারী এবং মৃত্যুবরণকারী আদম সন্তানদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাতে আদম সন্তানদের আমল উপরে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের রিযিক অবতীর্ণ হয়। কথাটি কতটুকু সত্য?

উত্তর: এ ধরণের হাদীস কোনো কোনো কিতাবে উল্লেখ আছে। যেমন-

فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم

এ রাতে চলতি বছরে জন্ম-গ্রহণকারী আদম সন্তানদের নাম এবং চলতি বছরে মৃত্যুবরণকারী আদম সন্তানদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাতে আদম সন্তানদের আমল উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের রিযক অবতীর্ণ হয় ...।[৫৯০]

[৫৮৯] কালয়ূবী (আরবি-বাংলা), সম্পাদনা ও সংযোজনা: মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী, আল-আকসা লাইব্রেরী, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

[৫৯০] মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস- ১৩০৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশাকে বললেন, তুমি কী জানো আজকের রাত্রিটি কোন রাত্রি? আয়েশা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ রাত্রে কী আছে? তখন তিনি উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বললেন। হাদীসটি মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে খতীব তাবরিযী (৭৫০ হি.) উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ইমাম বায়হাক্বীর আদ-দাওয়াতুল কাবীর নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদে একজন অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী আছেন। এছাড়া হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী হলেন আন-নাদ্র ইবনু কাসীর"। তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাদ থেকে, তিনি উরওয়া ইবনু যুবাইর থেকে তিনি আয়েশা রাদি. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আন-নাদর ইবনু কাসীর সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের অভিমত:

ইবনু হাজার বলেন: আন-নাদ্র ইবনু কাসীর তাবি-তাবিয়ী যুগের একজন রাবী। মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমদ বলেন: এ ব্যক্তি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন: সে অত্যন্ত দুর্বল বা মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে। তার বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। ইমাম নাসাঈ বলেন: লোকটি চলনসই। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন: এ ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। উকাইলী, দোলাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও তাকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

এমন দূর্বল হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত এবং সহীহ হাদীসের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। কুরআনে বলা হয়েছে মানুষ সৃষ্টির আরও অনেক আগেই তাদের জীবন-মৃত্যু এবং রিযিক নির্ধারণ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ () وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ()

তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় আছে। প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।[৫৯১]

[৫৯১] সূরা কামার, আয়াত- ৫২-৫৩

হাদীসে এসেছে-

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

মহান আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তাঁর সকল সৃষ্টির ভাগ্য (জীবন-মৃত্যু, রিযিক ইত্যাদি) লিখে রেখেছেন।[৫৯২]

অতএব এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মধ্য শাবানের রাত্রিতে চলতি বছরে জন্ম-গ্রহণকারী এবং মৃত্যুবরণকারী আদম সন্তানদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাতে আদম সন্তানদের আমল উপরে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের রিযক অবতীর্ণ হয় কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এমন কথা কুরআনের আয়াত এবং অসংখ্য সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝার তাওফিক দান করুন।

১০. *প্রশ্ন: আমাদের সমাজের কিছু সাধারণ আলেম-উলামা এবং জনসাধারণের মুখ থেকে শোনা যায় যে মধ্য শাবানের রাতে মালাকুল মাউতকে মৃতদের নাম জানানো হয় এবং ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। এমন কথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য?*

উত্তর: এমন একটি কথা হাদীসে আছে। তবে হাদীসটি দূর্বল। কুরআন এবং অন্যান্য সহীহ হাদীস বিরোধী। এখানে আমরা প্রথমে হাদীসটি উল্লেখ করে তার দূর্বলতার কারণ আলোচনা করব। হাদীসটি তাবিয়ী রাশিদ ইবনু সাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة

মধ্য শাবানের রাতে মহান আল্লাহ মৃত্যুর ফিরিশতাকে উক্ত বছরে যাদের মৃত্যু নির্ধারিত তাদের সম্পর্কে অবহিত করেন।[৫৯৩]

হাদিসটি ইমাম সুয়ূতী (৯১১ হি.) ইমাম দীনাওরীর আল-মুজালাসা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর আল-জামি আস-সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি

[৫৯২] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৬৯১৯

[৫৯৩] আল-জামিউস সাগির, হাদীস- ৫৯৬৪

লিখেছেন, হাদীসটি দীনাওরী রাশিদ ইবনু সাদ থেকে মুরসালরূপে সংকলন করেছেন। এমন মুরসাল হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। কুরআনে বলা হয়েছে মানুষ সৃষ্টির আরও অনেক আগেই তাদের জীবন-মৃত্যু এবং রিযিক নির্ধারণ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ () وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ()

তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় আছে। প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।[৫৯৪]

হাদীসে এসেছে-

تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

(হযরত আদম আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন) আপনি এমন একটি বিষয়ে কেন আমাকে অভিযুক্ত করছেন, আমাকে সৃষ্টি করারও আগে যেটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছে।)[৫৯৫]

হাদীসে এসেছে-

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

মহান আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তাঁর সকল সৃষ্টির ভাগ্য (জীবন-মৃত্যু, রিযিক ইত্যাদি) লিখে রেখেছেন।[৫৯৬]

অতএব এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আমাদের সমাজের কিছু সাধারণ আলেম-উলামা এবং জনসাধারণের মুখ থেকে মধ্য শাবানের রাতে মালাকুল মাউতকে মৃতদের নাম জানানো হয় এবং ভাগ্য নির্ধারণ করা

[৫৯৪] সূরা কামার, আয়াত- ৫২-৫৩

[৫৯৫] সহীহ বুখারী, হাদীস- ৩৪০৯/৭৫১৫; সহীহ বুখারী, ই.ফা. হাদীস- ৭০০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৬৯১৫

[৫৯৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৬৯১৯

হয়। এমন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তা কুরআনের আয়াত এবং অসংখ্য সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝার তাওফিক দান করুন।

১১. প্রশ্ন: মধ্য শাবানের রাতে মসজিদে একত্রিত হওয়া এবং ইবাদত করার ব্যপারে ইসলামের বিধান কী?

উত্তর: প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার শুরুম্বুলালী (১০৬৯ হি.) বলেন: দুই ঈদের রাত্রি, যিলহাজ্জ মাসের দশ রাত্রি ও মধ্য-শাবানের রাত্রি ইবাদত বন্দেগিতে কাটানো মুস্তাহাব, তবে এজন্য মসজিদে বা অন্য কোথাও সমবেত হওয়া মাকরূহ। তিনি বলেন:

ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي ...... في المساجد وغيرها لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم ولا الصحابة

এ সকল রাত্রি ইবাদতে কাটাতে মসজিদে বা অন্য কোথাও সমবেত হওয়া মাকরূহ; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করেন নি, এবং তাঁর সাহাবিগণও এরূপ করেন নি।[৫৯৭]

শবেবরাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা একটি মুস্তাহাব আমল। এর জন্য মানুষকে মসজিদে দলবদ্ধ করা এবং দলবদ্ধতার সাথে ইবাদত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্যকেও অংশ গ্রহনের জন্য আহবান করা উলামায়ে কেরাম পছন্দ করেন নি, বরং একে বিদআত বলেছেন। এমনিভাবে দলবদ্ধভাবে কবর যিয়ারত করাও বিদআত। কবর যিয়ারত করতে চাইলে একাকীভাবে কবর যিয়ারত করবে। ফজিলতময় রাত সমূহে মসজিদে একত্রিত হয়ে ইবাদত করার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ব্যরিস্টার আল্লামা ইবনুল নুজাইম রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা পরিস্কারভাবে লিখেছেন-

ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد

ফযিলতময় রাত সমূহে ইবাদত করার নিমিত্তে দলবদ্ধ হওয়া মাকরূহ মসজিদে হোক বা অন্যত্র।[৫৯৮]

---

[৫৯৭] নূরুল ঈযাহ; মারাকিউল ফালাহ এবং কানযুদ দাকায়েকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-বাহরুর রায়েক

[৫৯৮] আল-বাহরুর রায়েক, ২/৫২

প্রতিটি মুমিনের প্রতি আমাদের শেষ কথা:

মধ্য শাবানের রাতে যে ক্ষমা পাওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা প্রতি বছরে শুধু একরাতে। মধ্য শাবানের রাতে ক্ষমা প্রাপ্তির কথা যে সব হাদীসে বলা হয়েছে সে সব হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়েও অনেক মতানৈক্য রয়েছে। অথচ বিশুদ্ধ হাদীসে প্রতিটি মুমিনকে অনেক বড় সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রতিটি রাতে তার বান্দার সমস্যার সমাধান এবং গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের জন্য সুবর্ণ সুযোগ দান করেন।

হাদীসে এসেছে-

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতের যখন শেষ তৃতীয়াংশ থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। আর বলেন, আমার কাছে যে দুআ করবে আমি তার দুআ গ্রহণ করব। আমার কাছে যে চাইবে আমি তাকে দান করব। আমার কাছে যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব।[৫৯৯]

সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেছে যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তার বান্দাদের গুনাহ মাফ করাসহ বান্দার সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি এই পৃথিবীর আসমানে অবতরন করেন। সুতরাং মধ্য শাবানের রাতের অপেক্ষা না করে আমরা প্রতিটি রাতেই মহান আল্লাহর কাছে আমাদের গুনাহ এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বিনীত আবেদন করবো। মধ্য শাবানের রাতের জন্য অপেক্ষা করবো না। কারণ, মধ্য শাবানের রাত পর্যন্ত হায়াত পাবো কিনা তা বলা যায় না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে প্রতিটি রাতেই বেশি করে আমল করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

নোট: শবে-বরাতের সালাত শিরোনামের প্রায় অর্ধেক আলোচনা ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহর লিখিত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে 'শবে-বরাত' ফযীলত ও আমল বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

[৫৯৯] সহীহ বুখারী, হাদীস- ১১৪৫, ৬৩২১ এবং ৭৫৯৫

পবিত্রতা, সালাত এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর

১. প্রশ্নঃ এক ব্যক্তি নৌকায় উঠার পর নামাযের সময় এই পরিমাণ বাকি আছে যে, সে ওপার গিয়ে নামায পড়তে পারবে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি নৌকায় পার হওয়ার সময় নৌকার মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারবে কিনা?

উত্তরঃ চলন্ত নৌকায় দাঁড়িয়ে বা বসে ফরয নামায ও অন্য যে কোনো নামায পড়তে পারবে। তবে কোনো কারণ ছাড়া চলন্ত নৌকায় ফরয নামায পড়া মাকরূহে তানযিহি। চাই নৌকা থেকে নামার পর পর্যন্ত সময় বাকি থাকুক বা না থাকুক। অবশ্য নৌকা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম, যদি নিজের এবং জান-মালের কোনো ক্ষতি না হয়।[৬০০]

২. প্রশ্নঃ চলন্ত বাসে নামায বসে পড়লে চলবে নাকি দাঁড়িয়ে পড়া জরুরী?

উত্তরঃ চলন্ত বাসে দাঁড়িয়ে নামায পড়া কঠিনই বটে, তাই এই সমস্যার কারণে বাসে বসে যথারীতি রুকু, সাজদার মাধ্যমে নামায আদায় করতে পারবে। তবে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে যদি বসেও রুকু, সাজদাহ সহকারে নামায পড়া সম্ভব না হয় তাহলে শেষ ওয়াক্তে ইশারা করে নামায আদায় করবে এবং পুনরায় সেই নামাযটি কাযা হিসেবে পড়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, অনেক সময় দেখা যায়, অনেকেই সিটে বসে যথারীতি সাজদাহ না করে সিটের হেলানীর উপর সাজদাহ করে থাকে। এভাবে সাজদাহ করলে তা আদায় হবে না।[৬০১]

৩. প্রশ্নঃ ইমাম ও মুক্তাদী কখন দাঁড়াবেন? অর্থাৎ জামাতের সময় হওয়ার পর ইমাম সাহেব আসছেন এ সময় মুয়াযযিন কখন ইকামত শুরু করবেন? ইমাম সাহেব এসে কী করবেন? মুক্তাদী কখন দাঁড়াবেন?

উত্তরঃ ইমাম সাহেবকে দেখামাত্র মুয়াযযিন ইকামত শুরু করবেন। ইমাম সাহেব মিহরাবে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বাকি রইল মুক্তাদীগণ কখন

[৬০০] রদ্দল মুহতার- ২/১০১; সূত্রঃ সমকালীন জরুরী মাসায়েল, পৃ.- ৫৯

[৬০১] ফাতওয়া মাহমূদিয়া- ১৪/২২৩; সূত্রঃ সমকালীন জরুরী মাসায়েল, পৃ.- ৬৫

দাঁড়াবেন? ইমাম সাহেব যদি পেছন দিক দিয়ে আসেন, তাহলে তিনি যখন যেই কাতারে পৌছবেন তখন সেই কাতারের লোকজন দাঁড়িয়ে যাবেন। আর যদি ইমাম সাহেব সামনের দিক দিয়ে আসেন তাহলে তাঁকে দেখামাত্র সকলেই দাঁড়িয়ে যাবেন।[৬০২]

৪. প্রশ্নঃ মাসবুক তার অবশিষ্ট নামায আদায়ের জন্য কখন দাঁড়াবে? প্রথম সালামের পর নাকি দ্বিতীয় সালামের শুরুতে? নাকি দ্বিতীয় সালাম শেষ হওয়ার পর?

উত্তরঃ উক্ত তিন সময়ের যে কোনো সময়ে দাঁড়াতে পারে। তবে দ্বিতীয় সালাম শেষ হওয়ার পর দাঁড়ানো ভালো।[৬০৩]

৫. প্রশ্নঃ রেলগাড়ীতে নামায কিভাবে পড়বে? দাঁড়িয়ে নাকি বসে?

উত্তরঃ রেলগাড়িতে দাঁড়িয়ে নামায পড়া কঠিন নয়। তাই দাঁড়িয়েই নামায আদায় করবে। তবে মাথা ঘুরা বা অন্য কোনো ধরণের অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে নামায আদায় করবে। আর যদি মানুষের ভিড়ের কারণে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব না হয়, তাহলেও বসে নামায আদায় করবে। তবে ভিড়ের কারণে আদায়কৃত নামাযটি পুনরায় কাযা হিসেবে পড়ে নিতে হবে। আর যদি ভিড় এতো বেশি হয় যে বসেও নামায আদায় করা সম্ভব নয়, তাহলে শেষ ওয়াক্তে ইশারা করে নামায আদায় করে নিতে হবে এবং পরে কাযা হিসেবে পড়ে নিতে হবে।[৬০৪]

৬. প্রশ্নঃ বিমান পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে সাধারণতঃ নামাযের সময় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পক্ষান্তরে বিমান পূর্ব দিকে যেতে থাকলে নামাযের সময় ক্রমশ কমতে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো এর ফলে নামাযের হুকুমে কোনরূপ পরিবর্তন আসবে কি না?

উত্তরঃ ওয়াক্ত বৃদ্ধি পাওয়া আর কমে যাওয়াতে নামাযের হুকুমে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না। বিমান পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে নামাযের ওয়াক্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে তা ঠিক, তেমনিভাবে বিমান পূর্বদিকে যেতে থাকলে ওয়াক্ত ছোট হয়ে আসে তাও ঠিক। কিন্তু তাতে কোন ওয়াক্ত সৃষ্টি হয় না।

[৬০২] আদ-দুররুল মুখতার, ১/৪৭৯; সূত্রঃ সমকালীন জরুরী মাসায়েল পৃ.- ৪৩

[৬০৩] ফাতওয়া মাহমূদিয়া- ১৬/৩০৯; সূত্রঃ সমকালীন জরুরী মাসায়েল, পৃ.- ৪৬

[৬০৪] ফাতওয়া মাহমূদিয়া- ২/১২০; সূত্রঃ সমকালীন জরুরী মাসায়েল, পৃ.- ৩৩

কোনো ওয়াক্ত হারিয়েও যায় না। সুতরাং যখন যে নামাযের ওয়াক্ত আসবে তখন সেখানকার ওয়াক্ত মতে সে নামায আদায় করে নিলেই চলবে।[৬০৫]

৭. প্রশ্ন: মাগরিবের নামায পড়ার পর সূর্যের গতির চেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন বিমানে চড়ে পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে যদি পুনরায় আছরের ওয়াক্ত চলে আসে তাহলে বিমানের আরোহীগণের জন্য আসর এবং মাগরিবের নামায পুনরায় পড়তে হবে কি না?

উত্তর: ফিকাহবিদের মাঝে এ ব্যপারে প্রমাণভিত্তিক মতানৈক্য বিদ্যমান থাকায় আরোহীগণের উপর আসর ও মাগরিবের নামায পুনরায় পড়া সতর্কতামূলক ওয়াজিব।

বিখ্যাত কিতাব 'আদ-দুররুল মুখতার' গ্রন্থের ৩৬০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

فَلَوْ غَرَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ هَلْ يَعُوْدُ الْوَقْتُ الظَّاهِرُ نَعَمْ

সূর্য অস্ত যাবার পর আবারও ফিরে এলে আসরের নামায পড়বে কিনা? হ্যাঁ, সে পড়বে।[৬০৬]

৮. প্রশ্ন: যে সব মহিলাদের অনিয়মিত মাসিক হয় তাদের পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম কী এবং সালাত আদায়র বিধান কী?

উত্তর: মহিলাদের জরায়ু থেকে যে রক্ত বের হয় তা সাধারণত তিন প্রকার।

১. নিফাস: সন্তান জন্মের পর যে রক্ত বের হয় তাকে নিফাস বলা হয়।

২. হায়েয: কোনো রোগ ব্যাধি ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার জরায়ু থেকে নিয়মিতভাবে যে রক্ত বের হয় তাকে হায়েয বা নিয়মিত মাসিক কিংবা ঋতুস্রাব বলা হয়। সুতরাং কোনো রোগের কারণে যে রক্ত বের হয় তা হায়েয বলে গণ্য হবে না। অপ্রাপ্ত অর্থাৎ নয় বছরের কম বয়সের মেয়ের জরায়ু থেকে নির্গত রক্তও হায়েয বলে গণ্য হবে না। অনিয়মিতভাবে যে রক্ত বের হয় তাও হায়েয বলে গণ্য হবে না।

[৬০৫] সমকালীন জরুরী মাসায়েল, পৃ.- ৩৩

[৬০৬] ফাতওয়া শামী, ১/৩৬১; আহসানুল ফাতওয়া, ৪/১৩৪; সূত্র: সমকালীন জরুরী মাসায়েল পৃ.- ৩৪

৩. ইস্তিহাযা: প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার জরায়ু থেকে অনিয়মিতভাবে যে রক্ত বের হয় তাকে ইস্তিহাযা বলা হয়।

এখানের প্রশ্নে যে বিষয়টির সমাধান চাওয়া হয়েছে তা জানার জন্য উপরে উল্লেখিত ২ নং অর্থাৎ হায়েয সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু জানার পর প্রশ্নের সমাধান জানার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

হায়েয বা নিয়মিত ঋতুস্রাবের বিস্তারীত পরিচয় ও সময়সীমা:

হায়েয বা নিয়মিত ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন সময়কাল হলো তিনদিন তিনরাত। আর সর্বোচ্চ সময়কাল হলো ১০ দিন ১০ রাত। অতএব কোনো মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যদি ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, অথবা ১০ দিন পর্যন্ত (রাতসহ) এসে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এ ঋতুস্রাবকে নিয়মিত ঋতুস্রাব বা হায়েয (নিয়মিত মাসিক) বলা হয়।

ইস্তিহাযার বিস্তারীত পরিচয় ও সময়সীমা:

পক্ষান্তরে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যদি তিন দিন তিন রাতের কম সময় স্থায়ী হয়ে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৫ দিনের ভেতর পুনরায় রক্ত না আসে তাহলে এ ধরণের অনিয়মিত ঋতুস্রাবকে ইস্তিহাযা বা রোগ বলা হয়।

হায়েযের বিধান:

হায়েয বা নিয়মিত ঋতুস্রাবের সময় মহিলারা কোনো সালাত পড়বে না। তবে পরবর্তীতে পবিত্র অবস্থায় কাযাও করতে হবে না। সিয়াম (রোযা) পালন করবে না। তবে পরবর্তীতে পবিত্র অবস্থায় সিয়াম কাযা আদায় করতে হবে। এমনিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। বাইতুল্লাহর তাওয়াফও করা যাবে না।

ইস্তিহাযা (অনিয়মিত ঋতুস্রাব) বা অনিয়মিত মাসিকের বিধান:

ইস্তিহাযা বা অনিয়মিত ঋতুস্রাবের সময় মহিলাদের সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করার বিধান বুঝতে হলে

নিচের বিবরণটি বুঝতে হবে। এর আগে একটি পরিভাষা বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে।

মুস্তাহাযা: এর অর্থ হল ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা। অর্থাৎ যে সব মহিলাদের অনিয়মিত মাসিক হয় তাদেরকে ফিকহের পরিভাষায় মুস্তাহাযা বলা হয়। মুস্তাহাযা মহিলা তিন প্রকার। অর্থাৎ যে সব মহিলাদের মাসিক অনিয়মিত হয় ওরা তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার মহিলা:

ঐ সমস্ত মহিলা যাদের জীবনের প্রথম যে রক্তস্রাব হয়েছিল তা অনিয়মিতভাবে অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ রক্তস্রাব শুরু হয়ে ১০ দিন ১০ রাতের পরেও বন্ধ হয় নি। (হায়েয এবং নিফাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রক্ত আসলেও তাকে অব্যাহত ঋতুস্রাব ধরা হয়।)

প্রথম প্রকার মহিলাদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান:

এমন মহিলা হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ ১০ দিন ১০ রাত পর্যন্ত স্রাবকে হায়েয হিসেবে গণ্য করবে। এই ১০ দিন ১০ রাত কোনো সালাত, সিয়াম এবং কুরআন তিলাওয়াত ও তাওয়াফ কিছুই করবে না। ১০ দিন ১০ রাত অতিক্রম হওয়ার পর গোসল করে সালাত, সিয়াম এবং কুরআন তিলাওয়াত ও তাওয়াফসহ সবই করতে পারবে। এরপর (পবিত্রতা বা স্রাবমুক্ত সময়ের সর্বনিম্ন মেয়াদ) ১৫ দিন পর আবার ১০ দিন ১০ রাত হায়েয হিসেবে গণনা করবে এবং সালাত, সিয়াম এবং কুরআন তিলাওয়াত ও তাওয়াফ কিছুই করবে না।

এভাবে স্রাবের প্রতি ২৫ দিনের প্রথম ১০ দিন হায়েয এবং এরপর ১৫ দিন ইস্তিহাযা গণনা করে হায়েযের দিনগুলোতে সালাত, সিয়াম এবং কুরআন তিলাওয়াত ও তাওয়াফ কিছুই করবে না। তবে ইস্তিহাযার দিনগুলোতে সালাত, সিয়াম এবং কুরআন তিলাওয়াত ও তাওয়াফসহ সবকিছুই করতে পারবে।

দ্বিতীয় প্রকার মহিলা:

ঐ সমস্ত মহিলা যাদের কমপক্ষে দুইবার নিয়মিত হায়েয এসেছিল। এরপর তৃতীয় মেয়াদে অব্যাহতভাবে রক্তস্রাব শুরু হয়ে গিয়েছে।

উদাহরণত: একটি মেয়ে বালেগা হওয়ার পর দুইবার নিয়মিত হায়েয এসেছিল। যেমন প্রথম মাসে ৫ দিন এবং দ্বিতীয় মাসেও ৫ দিন যথারীতি হায়েয আসলো, কিন্তু তৃতীয় মাসে ৫ দিন অতিক্রম হওয়ার পরও রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। বরং রক্ত অব্যাহতভাবে আসছে।

দ্বিতীয় প্রকার মহিলাদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান:

এমন মহিলা ১০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি ১০ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে অথবা ১০ দিন পূর্ণ হয়ে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এসব দিনেও আগত রক্ত হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। তখন বুঝতে হবে যে, তার পূর্ববর্তী অভ্যাস বা সময়সীমা (যা ৫ দিন ছিল তা) পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং এ মাসে যে কয়েকদিন রক্তপাত হলো সে কয়েকদিনকে নতুন অভ্যাস বা সময়সীমা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

পক্ষান্তরে ১০ দিন ১০ রাত পূর্ণ হওয়ার পরও যদি রক্তস্রাব চালু থাকে, তাহলে পূর্ববর্তী সময়সীমা (৫ দিন) পর্যন্ত আগত রক্ত হায়েয এবং পরবর্তী সময়সীমার পরের রক্ত ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। ফলে পূর্ববর্তী সময়সীমার পরে যে সকল সালাত, সিয়াম সে ছেড়ে দিয়েছিল তা কাযা করতে হবে। তবে এ কারণে কোনো গুনাহ হবে না।

তৃতীয় প্রকার মহিলা:

ঐ সমস্ত মহিলা যাদের কমপক্ষে দুইবার নিয়মমাফিক এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী ঋতুস্রাব হয়েছিল। এরপর রক্তস্রাব অব্যাহতভাবে চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ মহিলা তার পূর্ববর্তী যে দুই বা দুইয়ের অধিক হায়েয হয়েছিল সেগুলোর সময়সীমা ভুলে গিয়েছে।

উদাহরণত: কোনো মহিলা বালেগা হওয়ার পর কমপক্ষে দুইবার তার নিয়মিত হায়েয এসেছিল। যেমন প্রথম মাসে নির্দিষ্ট কয়েকদিন হায়েয

আসলো এবং দ্বিতীয় মাসেও হুবহু সেই কয়েকদিনই হায়েয আসলো কিন্তু তৃতীয় মাসে বা আরও কয়েক মাস পরে রক্তস্রাব শুরু হয়ে আর বন্ধ হচ্ছে না। এদিকে তার পূর্ববর্তী নিয়মিত হায়েয সমূহের সময়সীমাও ভুলে গেছে। এ ধরণের মহিলাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় মুতাহায়্যিরাহ বা সংশয়গ্রস্তা বলে। এ ধরণের মহিলা আবার তিন প্রকার।

১. সংখ্যার ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা: ঐ সমস্ত মহিলা যারা পূর্ববর্তী নিয়মিত হায়েযের সময়সীমার মোট সংখ্যা ভুলে গেছে যে, ৫ দিন ছিল, নাকি ৬ দিন ছিল, নাকি ৭ দিন।

২. সূচনাকালের ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা: ঐ সমস্ত মহিলা যারা পূর্ববর্তী হায়েযের সময়সীমার সূচনাকাল ভুলে গেছে যে, তা মাসের শুরুতে ছিল, নাকি মাঝে ছিল, নাকি মাসের শেষে।

৩. সূচনাকাল ও সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা: ঐ সমস্ত মহিলা যারা পূর্ববর্তী নিয়মিত হায়েযের দিনগুলোর সংখ্যা ও সূচনাকাল উভয়টিই ভুলে গেছে। কিছুই মনে নেই।

সংশয়গ্রস্তা মহিলাদের ব্যপারে ইসলামের বিধান:

সংশয়গ্রস্তা মহিলারা পূর্ববর্তী নিয়মিত হায়েযের দিনগুলো গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে। এভাবে যদি পূর্ববর্তী সময়সীমা মনে পড়ে যায় বা কোন একটা সময়সীমা সম্পর্কে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় তাহলে তারা সে অনুযায়ী আমল করবে।

পক্ষান্তরে যদি কোনো সময়সীমা সম্পর্কে প্রবল ধারণা সৃষ্টি না হয় বরং সংশয় থেকেই যায় তাহলে তাদের বিধান কী হবে তা নিম্নে দেয়া হলো।

যেহেতু সংশয়গ্রস্তা মহিলা তিন প্রকার। তাই তাদের প্রত্যেক প্রকার মহিলাদের বিধানও আলাদা আলাদা।

১. সংখ্যার ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা মহিলার বিধান:

ঐ সমস্ত মহিলা যারা পূর্ববর্তী হায়েযের দিনগুলোর মোট সংখ্যা ভুলে গেছে। (কিন্তু হায়েযের সূচনাকাল বা শুরু কাল মনে আছে) এ সকল

মহিলা হায়েযের শুরু তারিখ হতে তিনদিন পর্যন্ত সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি পরিহার করে চলবে। (কেননা এ দিনগুলো হায়েয হওয়া নিশ্চিত)। এরপর সাতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করে সালাত পড়বে। এরপর হতে পরবর্তী মাসের হায়েযের শুরু তারিখের আগ পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে ওযূ করে সালাত পড়বে। (কেননা, এ দিনগুলো নিশ্চিতরূপে হায়েযমুক্ত।)

২. সূচনাকালের ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা মহিলার বিধান:

এই মহিলাগণ প্রত্যেক মাসের শুরুতে (মাসের শুরু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ দিন যে দিন থেকে রক্তস্রাব শুরু হয়েছে)। তার পূর্বকালীন অভ্যাসগত হায়েযের দিনগুলো শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করবে। উদাহরণত: কোনো মহিলার পূর্বে হায়েযের সময়সীমা পাঁচদিন নির্ধারিত ছিল। সে মহিলা মাসের প্রথম তারিখ হতে পাঁচদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে ওযূ করে সালাত পড়বে। (কেননা, সে প্রকৃতপক্ষে হায়েযগ্রস্ত, নাকি হায়েয মুক্ত তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।) এরপর পঁচিশ দিন প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করে সালাত পড়বে। কেনান, এ দিনগুলোর প্রত্যেক দিনই হায়েয মুক্ত হয়ে ইস্তিহাযাগ্রস্ত (মুস্তাহাযা) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. সূচনাকাল ও সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে সংশয়গ্রস্তা:

তারা প্রত্যেক চন্দ্র মাসের প্রথম তিনদিন প্রতি ওয়াক্তে ওযূ করে সালাত পড়বে। অবশিষ্ট ২৬/২৭ দিন প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করে সালাত পড়বে।

নোট: যাদের বেলায় প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করে সালাত পড়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, তাদের বেলায় এ অবকাশও রয়েছে যে, যোহরের ওয়াক্তের শেষ সময়ে গোসল করে যোহর আদায় করবে আর উক্ত গোসলের মাধ্যমেই আসরের প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করবে। এমনিভাবে মাগরিবের ওয়াক্তের শেষ সময়ে গোসল করে মাগরিবের সালাত আদায় করবে। আর উক্ত গোসলের মাধ্যমেই ইশার প্রথম ওয়াক্তে ইশা আদায় করবে। আর ফজরের জন্য আলাদা গোসল করবে। এভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য তিনবার গোসল করলেও চলবে।

তবে এক্ষেত্রে কারো জন্য যদি কোনো সময় গোসল করলে ক্ষতির প্রবল আশংকা হয় অথবা বিজ্ঞ কোন মুসলিম ডাক্তার সিদ্ধান্ত দেয় যে, গোসল করলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে তাহলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করেও সালাত আদায় করতে পারবে। তবে এক তায়াম্মুম দ্বারা দুই ওয়াক্তের সালাত পড়া যাবে না। প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য আলাদা আলাদা তায়াম্মুম করতে হবে।[৬০৭]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কুরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক কথা জানার ও বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

نرجو الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[৬০৭] দরসে তিরমিযি, ১/৩৬৩-৩৬৭; সূত্র: সমকালীন জরুরী মাসায়েল, পৃ. ২২-২৬

পাঠকের পাতা